এভারেস্ট মানুষ

তেনজিং

Everest Manus Tenzing
translated by Sukumar Chakraborty
from Man of Everest as told by Tenzing Norge to James Ramsey Ullman

□ প্রকাশক □
শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়
গণমন প্রকাশন
৩৩এ/১এ হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন
কলকাতা ৭০০ ০৫০

□ প্রচ্ছদ চিত্র □
ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত

□ প্রচ্ছদ □
কান্তিময় রায়চৌধুরী

□ কম্পোজ □
ডি এন্ড বি ডেটা সার্ভিসেস
১৬/সি ধনদেবী খান্না রোড
কলকাতা ৭০০ ০৫৪

□ মুদ্রণ □
শান্তি মুদ্রণ
৩২/৩ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

□ বাঁধাই □
মণিরুদ্দিন
১৯/১ পাটোয়ার বাগান
কলকাতা ৭০০ ০০৯

উৎসর্গ --

স্বর্গীয়া শৈল মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গে আধুনিক অর্থে পর্বতারোহণ শুরু হয় তেনজিং-এর এভারেস্ট আরোহণের পর থেকে। কাজেই আমাদের যুব সম্প্রদায়ের কাছে তেনজিং চিরকালই একটা আলাদা মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকবেন। তাঁর আত্মজীবনীর বাংলা অনুবাদ গ্রন্থটির প্রকাশনা তাই অনেকদিনের একটা অভাব পূরণ করল বলে আশা করা অসঙ্গত হবে না।

তেনজিং-এর জবানীতে এই আত্মজীবনী লিখেছেন উলম্যান। এটি যখন লেখা হয়েছিল (১৯৫৪) তখনও তেনজিং ইংরেজীতে তেমন পারদর্শী হয়ে ওঠেন নি। তাই বলা আর বোঝার মধ্যে কোনও তফাৎ হয়েছিল কিনা, আজ আর তা যাচাই করার কোনও উপায় নেই। তবে বইটি লেখা হয়েছিল গভীর সমমর্মিতা ও সহানুভূতির সঙ্গে। যার ফলে এটি চিরকালের জন্যে একটি মহামূল্য দলিল হয়ে রইল।

তেনজিং-এর জীবনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আজও স্পষ্ট নয়। নিজে জিজ্ঞেস করেও তার কোনও সঠিক উত্তর পাইনি। তার মধ্যে শুধু তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করছি।

১৯৩৪ সালে তিনি দ্বিতীয়বার দার্জিলিংয়ে আসেন। উলম্যান লিখেছেন যে তিনি কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে এসেছিলেন। তেনজিং-এর পাহাড়ের সঙ্গী রেমণ্ড ল্যাম্বার্ট লিখেছেন যে তিনি চলে এসেছিলেন ঠিকই, তবে পালিয়ে আসেন নি। তিনি এসে কুলির কাজ করা শুরু করেন এবং শেষ পর্যন্ত হিমালয়ান ক্লাবের নজরে পড়ে যান। (অমৃতবাজার পত্রিকা ১৩.৬.৫৩)।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল, ১৯৫৩ সালের অভিযানে তাঁর সঠিক ভূমিকা কি ছিল? তিনি ছিলেন শেরপা সর্দার, না গাইড, না পূর্ণ সদস্য? উলম্যান পরিষ্কার করে কিছু লেখেন নি।

আমি যেটুকু জানি তা বলছি। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী আং লামু এই অভিযানের প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন। তাছাড়া এরিক শিপটন ছিলেন তেনজিং-এর কাছের লোক। তাঁর হাত থেকে নেতৃত্ব জন হান্টের হাতে চলে যাওয়ায় তেনজিং দোটানায় পড়ে যান। পরের বছর (১৯৫৪) একটি ফরাসী দলের এভারেস্ট অভিযানে যাবার কথা। তার পরের বছরের জন্যে তৈরি হচ্ছিল একটি সুইস দল। দু'দলের সঙ্গেই তেনজিং-এর কথা হয়েছিল। এদের তুলনায় তেনজিং ইংরেজদের একটু 'কম খোলামেলা' বলে মনে করতেন। তাই এ বছরটা বাদ দেবার কথাই তিনি ভাবছিলেন।

কিন্তু দুটি বিষয় তাঁকে মত পরিবর্তন করতে সাহায্য করে। তাঁকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে হিমালয়ান ক্লাবের অবদান তিনি কোনও দিনই ভুলতে পারেন নি। তাই এই ক্লাবের অনুরোধ এড়ানো তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না। ক্লাবের নথিপত্র থেকে দেখা যায় যে তাঁকে সর্দারই করা হয়েছিল, সদস্য নয়। মাইনে ঠিক হয়েছিল মাসিক তিনশ টাকা। আর অন্য শেরপাদের বেলায় তা ছিল ১২৫ টাকা।

আরও ঠিক হয়েছিল যে তিনি মারা গেলে তাঁর আত্মীয়রা পাবেন দু'হাজার টাকা। সুইসরা যা দিতে চেয়েছিল, তার দ্বিগুণ।

তাঁর অভিন্ন হৃদয় বন্ধু রবিবাবুর পরামর্শ হল দ্বিতীয়, বা বলতে গেলে প্রধান কারণ।

রবীন্দ্রনাথ মিত্র ছিলেন দার্জিলিংয়ে একটি ছাপাখানার মালিক। তেনজিং-এর সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপ হয় ১৯৫১ সালে। সেই আলাপ ধীরে ধীরে গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়। তিনি তেনজিংকে উৎসাহিত করেছিলেন এই অভিযানে অংশ নেবার জন্যে। তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তেনজিং-এর যদি 'তেমন কিছু' হয়, তাহলে তিনি চাঁদা তুলে তার পরিবারকে সাহায্য করবেন। এরপরই তেনজিং তাঁর মনস্থির করে ফেলেন।

রবিবাবুর আনন্দ তখন দেখে কে ? তিনি তখন একটি ছোট্ট ভারতীয় পতাকা তেনজিং-এর হাতে দিয়ে বলেন 'এটাকে ঠিক জায়গায় লাগিও' এবং সত্যিই এটা ঠিক জায়গায় লাগানো হয়েছিল। এই যুগান্তকারী ঘটনা ভারতীয় পর্বতারোহণের ইতিহাসে যথাযথ মর্যাদা পায়নি। তাঁকে কেউ চেনেনও না। এটা খুবই লজ্জার কথা।

যাই হোক যা বলছিলাম, তেনজিং-এর ভূমিকার কথা। অভিযানের পর হান্ট বলেছিলেন—"Tenzing was a full member of the party, but he was at no stage a 'guide'. Different members were assigned different jobs: Tenzing's was to organise the Sherpas and handle the transportation" (স্টেট্সম্যান; ১৬.৬.৫৩)। এমন হতে পারে তেনজিং-এর কাজে মুগ্ধ হয়ে, পরে তাঁকে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়।

এবারে আমার শেষ প্রশ্নে আসি। প্রথমে কে ? তেনজিং না হিলারী। এই প্রশ্ন প্রথমে তুলেছিলেন কয়েকজন অত্যুৎসাহী নেপালী। তেনজিং তখন বেস ক্যাম্প থেকে কাঠমাণ্ডুর পথে। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—"কি এসে যায় তাতে?" তারা কিন্তু নাছোড়বান্দা। সই করিয়ে নিল যে তিনিই সবার আগে শিখরে পা রেখেছিলেন। তেনজিং তখনও ইংরেজী লিখতে পড়তে জানতেন না। তাই এই বিভ্রাট। কিছু গোলমেলে খবর ছাপা হয়ে যায়। ফলে সাফল্যের কয়েক দিনের মধ্যেই (জুন ১৯৫৩) লণ্ডন টাইমস্-এ লেখা হল "A number of newspapers both in India and Pakistan are now implying that the final victory was Tenzing's alone–that he cut the road, broke the trail and finally handed Hillary to the summit as a rope."

তারপর এই ব্যাপারে ইন্ধন যোগান হিলারী নিজে। প্রথমে তিনি বলেছিলেন যে শিখরে উঠে তাঁর অবস্থা হয়েছিল ডাঙ্গায় মাছের মত (gasping like a fish)। পরে 'এ্যাসেন্ট অফ এভারেস্ট'-এর প্রাথমিক খসড়ায় তিনি লেখেন যে আসলে তেনজিং-এর ঐ অবস্থা হয়েছিল। তেনজিং আপত্তি করলে তিনি মাছের প্রসঙ্গ বাদ দেন। তবে যোগ করেন যে তেনজিংকে তিনি টেনে শিখরে তুলেছেন। ফলে আবার আপত্তি এবং আবার সংশোধন।

শেষ পর্যন্ত হিলারীর যে বয়ান প্রকাশিত হয়, সেটাই সত্যিকারের ইতিহাস বলে ধরে নিতে হবে—"I had been cutting steps continuously for two hours and Tenzing too, was moving very slowly. As I chipped steps around still another corner, I wondered rather dully just how long we could keep it up. Our original zest had now quite gone and it was turning more into a grim struggle I then realised that the ridge ahead, instead of still monotonously rising, now dropped sharply away and far below I could see the North Col and the Rongbuk glacier. I looked upwards to see a narrow snow ridge running upto a snowy summit A few more whacks of the ice-axe in the

firm snow and we stood on top.

"My initial feelings were of relief–relief that there were no more steps to cut, no more ridges to traverse and no more humps to tantalise with hopes of success. I looked at Tenzing and inspite of the balaclava, goggles and oxygen mask, all encrusted with long icicles that concealed his face, there was no disguising his infectious grin of pure delight as he looked all around him. I turned round and put out my hand. We shook hands and then Tenzing threw his arm around my shoulders and we thumped each other on the back until we were almost breathless.' (পৃ ২০৫) অর্থাৎ আসল কথাটি অজানাই রয়ে গেল।

সাফল্যের খবর রেডিওতে ছড়িয়ে পড়ে ২রা জুন সকালে। রবিবাবু স্বরচিত গান গেয়ে, তেনজিং-এর ছবি ছাপিয়ে দার্জিলিংয়ের রাস্তায় রাস্তায় বিক্রি করতে লাগলেন। এইভাবে এবং চেয়ে চিন্তে তিনি চারশ টাকা যোগাড় করলেন। তারপর নিজে থেকে একশ টাকা যোগ করে তুলে দিলেন আং লামুর হাতে। লামু তার দুই মেয়ে পেমপেম ও নিমাকে নিয়ে চলে গেলেন কাঠমাণ্ডু। কাঠমাণ্ডু থেকে সপরিবারে তেনজিং গেলেন কলকাতার রাজভবনে, রাজ্যপাল হরেন্দ্র কুমার মুখার্জির অতিথি হলেন। স্টেটস্‌মান তাঁর জন্যে দশ হাজার টাকা তুলে দিল দার্জিলিংয়ে একটি বাড়ি করার জন্যে।

ডঃ বিধান রায়ের অনুরোধে তিনি পশ্চিমবঙ্গে সংগঠিত প্রথম পর্বতারোহণকে সাহায্য করেন। এটি ছিল তিন সদস্যের দল—দেবশংকর শীল (নেতা), কে রায় (অ্যাডভোকেট) ও কে আর কৃষ্ণমূর্তি, জলপাইগুড়ির আয়কর অফিসার। তেনজিং তাঁদের জন্যে ছজন শেরপা ঠিক করে দিলেন। তাছাড়া ১৯৫৩ সালের ৪ঠা অক্টোবর তিনি তাঁদের জীপে করে সিংলা চা বাগান পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। এই পাণ্ডিম (২১,৯৫৩ ফুট, ৬,৬৯১ মি) অভিযান শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। তাই অনেকের ধারণা নন্দাঘুন্টি হল পশ্চিমবঙ্গের প্রথম পর্বত অভিযান।

১৯৫৪ সালের গোড়ায় তেনজিংকে আমন্ত্রণ জানান 'এক্সপ্লোরার্স ক্লাব অফ নিউ ইয়র্ক'। কিন্তু তিনি যাননি। কারণটা ছিল যে তারা রবিবাবুর খরচ দিতে রাজী হয়নি। এমনই ছিল তেনজিং-এর বন্ধুপ্রীতি।

তারপরেই নেহেরু তাঁকে সপরিবারে ইওরোপ যাবার সব বন্দোবস্ত করে দেন। তখন জুরিখে এক সাংবাদিক প্রায় এক ঘন্টা ধরে তাঁর এক সাক্ষাৎকার নেন। তৎক্ষণাৎ তা বই হয়ে বেরিয়ে যায় ফ্রান্সে। এটি পুরোপুরি ইংরেজদের বিরুদ্ধে লেখা। দুর্ভাগ্যক্রমে বইটির ইংরেজী অনুবাদ আজও প্রকাশিত হল না। যাই হোক, তেনজিং বিব্রত হন এবং আরেকটি সাক্ষাৎকার দিতে রাজী হন। সেই সুবাদেই ১৯৫৪ সলের বসন্তকালে উলম্যান হাজির হন দার্জিলিং-এ এবং 'ম্যান অফ এভারেস্ট' বার হয় ১৯৫৫ সালে। এই হল এই বইটির গোড়ার কথা।

ইতোমধ্যে তুংসুং বস্তীর বাড়িটা তেনজিং তাঁর বোন লামু কিপাকে দিয়ে দেন। নতুন বাড়ি তৈরি হল একটি পহাড়ের ঢালে, বলতে গেলে শহরের মধ্যেই।

এদিকে রবিবাবুর অনুরোধে ডঃ বিধান রায় হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউটের সব বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন। নন্দু জয়াল হলেন প্রথম অধ্যক্ষ, তেনজিং প্রথম ডিরেক্টর অফ ফিল্ড ট্রেনিং আর মণি সেন হলেন প্রথম কিউরেটার। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল ১৯৫৪

সালের ৪ঠা নভেম্বর।

১৯৫৪ সালের ২০শে ডিসেম্বর তিনি মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে দার্জিলিং ছাড়েন এবং ধারান থেকে হেঁটে প্রায় এভারেস্ট বেস ক্যাম্প পর্যন্ত যান। ফেরার পথে থামে যান, ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা করেন এবং মাকে সঙ্গে করে দার্জিলিং ফিরে আসেন।

১৯৫৩ সালেই তিনি 'পদ্মভূষণ' হন এবং ১৯৬০ সলে তাঁকে হিমালয়ান ক্লাবের সাম্মানিক সদস্য করা হয়। শেরপা বুদ্ধিস্ট এ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয়েছিল বিশের দশকে। তার সভাপতি হয়েই তিনি এর নাম পালটে রাখলেন শেরপা ক্লাইম্বার্স এ্যাসোসিয়েশান। ধীরে ধীরে এই সংস্থা হিমালয়ান ক্লাবের কিছু কিছু কর্তব্য গ্রহণ করে। তেনজিংয়ের নেতৃত্বে শেরপারা এক নতুন পরিচয় গ্রহণ করে। তারা আর তখন শুধু কুলি নয়। পরে অবশ্য ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশান এই সব কর্তৃত্ব নিজের হাতে নিয়ে নেয়।

তিনি এইচ. এম. আই. থেকে অবসর গ্রহণ করেন সালের ২৯শে মে। তারপর থেকে তিনি হলেন ঐ সংস্থারই অ্যাড্‌ভাইসার। জানুয়ারীতে তিনি আলাস্কার ম্যাকিন্‌লী ও দক্ষিণ মেরুতে যান। তাঁর শেষ অভিযান হল কেনিয়ায়, -এর সেপ্টেম্বরে।

তাঁর কাছে ডঃ বিধান রায় ছিলেন গুরু আর নেহেরু ছিলেন পিতৃসম। এঁদের ছবি সব সময় তিনি সামনে রাখতেন।

জীবনের শেষ দুটি বছর তিনি ভোগেন ফুসফুসের যক্ষা ও কিডনীর গণ্ডগোলে। সরকারী খরচে তাঁকে দিল্লির এ. আই. আই. এম. এস.-এ চিকিৎসা করানো হয়। পরে তাঁকে সুইজারল্যাণ্ডে নিয়ে গিয়ে সারিয়ে তোলার শেষ চেষ্টা করা হয়। সবই ব্যর্থ হয়। ফিরে এসে তিনি দার্জিলিং-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সালের ৯ই মে. ভোর ছটায়। তার তৃতীয়া স্ত্রী ডাকু তাঁর শয্যাপার্শে ছিলেন। ডাকু এক সময় ছিলেন একজন মালবাহক।

তাঁর নামে প্রতি বছর পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ পর্বতারোহীকে তেনজিং পুরস্কার দেওয়া হয়। দার্জিলিংয়ে তাঁর নামে রাস্তা হয়েছে আর শিলিগুড়িতে এক বিশাল বাস টার্মিনাস তৈরি হয়েছে তাঁর নামে।

আমার সঙ্গে তেনজিংয়ের প্রথম পরিচয় হয় সালে, আমি হিমালয়ান ক্লাবের সদস্য তথা ইকুইপমেন্ট অফিসার হবার পর। পরিচয় আরও নিবিড় হয় সালে আমি এইচ. এম. আই.-এর সভ্য হবার পর। বছরের পর বছর তাঁর মধ্যে কোনও পরিবর্তন আমি লক্ষ্য করিনি। কাউকে কোনও রকম সাহায্য করার ইচ্ছা ছিল তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত। আমার স্ত্রীকে তিনি বেসিক ও অ্যাডভান্সে বলা মাত্রই ভর্তি করার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। বহু ব্যাপারে আমাদের মধ্যে চিঠি পত্রের আদান প্রদান হত। আমার স্ত্রীর সঙ্গেও তাঁর গুরুশিষ্যের সম্পর্ক ছিল। চিঠি লিখতেন তাকেও। অনেক সময় হাতে লিখেই চিঠি দিতেন, টাইপ করে নয়। ব্যক্তিগত ব্যাপারও এসে পড়ত। সাফল্যের চূড়ায় উঠেও তাঁকে অনেক কিছু সহ্য করতে হয়েছে। যদিও তিনি ছিলেন একজন অমায়িক ভদ্রলোক, নীচতার অনেক উর্ধে। শেরপাদের ভাষায় তিনি সত্যিই চলে গেলেন ওপারে, ক্যাম্প লাগাতে।

কমল গুহ

কৈফিয়ৎ

তেনজিং নোরগে এবং এডমণ্ড হিলারী প্রথম পর্বতারোহী যাঁরা উনিশশো তিপ্পান্ন সালের উনত্রিশে মে এভারেস্ট শীর্ষে আরোহণ করেন। এ কথা জানার জন্যে কোনও বই পড়ার দরকার হয় না। কিন্তু সম্প্রতি উনিশশো চুয়ান্ন সালে ছাপা তেনজিং কথিত এবং র‍্যামজে উলম্যান লিখিত 'ম্যান অব এভারেস্ট' পড়ার পর মনে হয়েছে এ বই অনেক আগে পড়া উচিত ছিল। এ শুধু প্রথম এভারেস্ট আরোহণের ইতিহাস নয় তার চেয়ে আরও অনেক বেশি। নেপালের শোলো খুম্বু জেলার অখ্যাত থামে গ্রামের ততোধিক অখ্যাত এক দরিদ্র পরিবারের অশিক্ষিত গ্রাম্য বালকের স্বপ্ন মাখা আকাঙ্ক্ষা কি ভাবে বাস্তবায়িত হল, এর প্রতি ছত্রে বর্ণিত হয়েছে তার কাহিনী। তেনজিং-এর কঠিন সংগ্রাম, শত দারিদ্র্যের মাঝেও এভারেস্ট আরোহণের জন্যে আকুতি, তাঁর জীবন দর্শন, এ সব পড়ে মনে হয় তিনিই ছিলেন যোগ্যতম ব্যক্তি যিনি এভারেস্ট শীর্ষে প্রথম আরোহণ করার অধিকারী। সাতবার এভারেস্ট অভিযানে যাবার কৃতিত্ব তাঁর আগে কোনও অভিযাত্রী অর্জন করতে পারেন নি। তুষার শার্দূল তেনজিং যদি প্রথম আরোহীর সাফল্য না অর্জন করতেন তবে তা হত তাঁর প্রতি এভারেস্টের এক নিষ্ঠুর অবিচার, এ বইয়ে তাঁর আত্মজীবনী পড়ে সে কথাই মনে হয়েছে। অথচ কেন তুমি এভারেস্ট অভিযানে যাও এই প্রশ্নের উত্তরে হিমালয় পুত্র তেনজিং যখন বলেন, 'শিশু যে কারণে তার মায়ের কোলে যেতে চায়' —তখন সত্যিকারের মানুষটিকে চিনতে পারা যায়।

তেনজিংকে সঙ্গে নিয়ে তিব্বত বিশারদ ইতালিয় পণ্ডিত জুসিপি তুচ্চি উনিশশো আটচল্লিশ সালে তিব্বত পরিক্রমায় বেরিয়েছেন কিছু দুষ্প্রাপ্য পুঁথির সন্ধানে। বিদগ্ধ পণ্ডিত, আপাদমস্তক অভিযাত্রী আপন ভোলা তুচ্চির সঙ্গে কিছুতেই মেলাতে পারিনি উনিশশো পঁচিশ ছাব্বিশের ফ্যাসিস্ট মতবাদের সমর্থক তুচ্চিকে যিনি সেই সময় তাঁর পাণ্ডিত্যের মোহজালে আচ্ছন্ন করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে প্রতারণা করেছেন। কবির সারল্যের সুযোগে তাঁকে ফ্যাসিস্ট মতবাদের সমর্থক বলে বিশ্বের দরবারে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। তেনজিং যেমন দেখেছেন, নিজের বোধবুদ্ধি নিয়ে তেমনি ভাবেই বর্ণনা করেছেন অভিযাত্রী তুচ্চিকে। আমরা তুচ্চির দ্বৈত সত্তার প্রথম পরিচয় পেলাম।

হাইনরিক হারারের 'সেভেন ইয়ারস্ ইন টিবেট'-এ তাঁর অভিজ্ঞতা আর অভিযানের বর্ণনা পড়ে অভিভূত হয়েছি, সেই হাইনরিকের মুখোমুখি হলাম আকস্মিক ভাবে, তেনজিং-এর হাত ধরে লাসায়। কিন্তু সেখানে হাইনরিকের করুণ অসহায় অবস্থা আমাদের কষ্ট দেয়। তখন তিনি সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। কিংবা এভারেস্ট আরোহণের পরেও তেনজিং বলছেন যে নন্দাদেবী(পূর্ব) আরোহণ তাঁর কাছে সব চেয়ে কঠিন মনে হয়েছে। এমনই অনেক কথা আগে জানা হয়নি। ভারত গৌরব এভারেস্ট জয়ী বীর তেনজিংকে দেখে সম্ভ্রম জেগেছে, কিন্তু এভারেস্ট শীর্ষে আরোহণ করে তাঁর আন্তরিক প্রার্থনা, 'আমি যেন এই সম্মানের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারি'—তখন আসল তেনজিং-এর সন্ধান পাই।

বইটি পড়তে গিয়ে বহু অজানা কাহিনী মনে এক অনুভূতি সৃষ্টি করল, অনুপ্রাণিত হলাম

বাংলা ভাষায় বাঙ্গালী পাঠকের কাছে এই বইকে হাজির করার জন্যে। আক্ষরিক অনুবাদ বলতে যা বোঝায় এ বই ঠিক তা নয়। মূল ইতিহাস অবিকৃত রেখে কিছু কিছু রদবদল করতে হয়েছে সাবলীলতা বজায় রাখতে, অবশ্য সেটা কতটা সাবলীল এবং গ্রহণযোগ্য, সে বিচারের ভার পাঠকের। কাজেই এই বইকে সেই অর্থে, 'ম্যান অব এভারেস্ট'-এর আক্ষরিক অনুবাদ বলা যাবে না।

কাজ শুরু করেছিলাম পরম উৎসাহে, কিন্তু মাঝে মাঝে ক্লান্তি আর হতাশা এসে আচ্ছন্ন করেছে, ভাঁটা পড়েছে কাজে। সেই সময় যিনি আমাকে উৎসাহিত করেছেন আমার শ্বাশুড়ী-মাতা স্বর্গীয়া শৈল মুখোপাধ্যায়, তাঁর কথা এখন বেশি করে মনে পড়ে। অগ্রজ ডঃ বীরেন্দ্রনাথ দত্ত এই বইয়ের প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক তত্ত্ব সরবরাহ করেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন। শ্রী কমলকুমার গুহ তাঁর কর্মব্যস্ততার মধ্যেও সময় করে এ বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করার বিষয়ে আমার কুণ্ঠা ছিল, সুহৃদ শ্রী গৌতম দে আমাকে সাহস না দিলে আমি অগ্রসর হতে পারতাম না। সর্ব্বোপরি বন্ধু বান্ধবের হাজার উৎসাহদানেও এ বই হয়ত কোনও দিনও প্রকাশিত হত না যদি বন্ধুবর শ্রী শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় এক প্রকার জোর করে আমার কাছ থেকে পাণ্ডুলিপি কেড়ে না নিতেন। শুধু তাই নয় প্রুফ দেখা, সম্পাদনা, পরিকল্পনা ইত্যাদি যাবতীয় কাজ তাঁকেই করতে হয়েছে। এছাড়া বন্ধুরা আমাকে প্রতিনিয়ত উৎসাহ দিয়েছেন কাজ শেষ করার জন্যে। এঁদের সবার কাছে আমি গভীর ভাবে ঋণী।

অবশেষে কুণ্ঠার সঙ্গে হাজির হলাম পাঠকদের কাছে, তাঁরা এ বই কি ভাবে গ্রহণ করবেন শুধু তার ওপরেই নির্ভর করছে আমার সাফল্য অথবা ব্যর্থতা।

সুকুমার চক্রবর্তী

অধ্যায়ক্রম

হিলারী এবং তেনজিং এর এভারেস্ট বিজয়েব সঙ্গে সঙ্গে অবসান হল পৃথিবী জোড়া মানুষের উত্তেজনাময় অধীর প্রতীক্ষা। বাত পোহাতেই শেরপা তেনজিং তাঁর নম্র বিনয়ী চেহারাটি নিয়ে বিশ্বে বিজয়ী বীরের মর্যাদায় অভিষিক্ত হলেন। যে অখ্যাত শেরপা বালক শোলো খুম্বুর ইয়াক চারণের তৃণভূমিতে এভারেস্ট জয়ের স্বপ্ন নিয়ে বড় হয়েছিল তাকে আমরা খুঁজে পেলাম পণ্ডিত নেহেরুর অকুণ্ঠ অভিনন্দন আর বাকিংহাম প্রাসাদের বর্ণাঢ্য অভ্যর্থনার মধ্যে।

তেনজিংকে ঘিবে এভারেস্ট জয়ের এই যে টানটান উত্তেজনা, আনন্দ উচ্ছ্বাস সব ছাড়িয়ে সেদিন মানুষ হিসাবে কজনই বা জানত তাঁকে। কে তিনি, কি তাঁর পরিচয় অথবা পর্বতারোহণে তাঁর পূর্বজ্ঞানই বা কতটা কিছুই জানা ছিল না সেদিন। আর বহু বিতর্কিত সেই প্রশ্ন, কে প্রথম উঠেছিল এভাবেস্টের মাথায় তেনজিং অথবা হিলারী? এমনই হাজাব জিজ্ঞাসা আর কৌতুহল ভিড় করে এল মানুষের মনে। অবশেষে বিমোচিত হল সেই প্রামাণিক গ্রন্থ, এক উত্তেজনাময় আত্মজীবনী 'MAN OF EVEREST' যা সব সন্দেহ সব প্রশ্নের অবসান ঘটাল।

জেমস্ র‍্যামজে উলম্যান

চোমোলোংমা থেকে ফিরে

১৯৫৩ সালের ২৯শে মে সকাল ১১টায় দুজন পর্বতারোহী তেনজিং নোরগে এবং এডমন্ড হিলারী মাউন্ট এভারেস্ট শীর্ষে আরোহণ করলেন। জয়ের আনন্দে অন্য যে কোনও পর্বতারোহী যা করতেন বলে মনে হয় তাঁরাও তাই করলেন। আবেগে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলেন। শীর্ষ থেকে চারিদিকের ছবি তুললেন, প্রাণভরে দেখলেন নিচে বহু নিচে তাঁদের ভালবাসার পৃথিবীকে। পনেরো মিনিট পার হয়ে গেছে, এবার নেমে যেতে হবে মূল শিবিরে, যেখান থেকে শুরু হয়েছিল তাঁদের আরোহণের কঠিন সংগ্রাম। যে পৃথিবীকে পেছনে ফেলে তাঁরা এভারেস্টে পৌঁছেছিলেন ফেরার পর সেই পৃথিবীটাই এখন আমূল পাল্টে গেল তাঁদের কাছে। বিশেষ করে তেনজিং, যে ছিল এক জেদী, লড়াকু সাধারণ শেরপা, কঠিন লড়াইয়ের সাফল্যে সেই ফিরে এল প্রথম আরোহীর মর্যাদায় ভূষিত হয়ে, বীরের খ্যাতি নিয়ে। আজ আর তেনজিং নোরগে একজন অখ্যাত নগণ্য শেরপা সর্দার নয়, পরন্তু মাউন্ট এভারেস্ট বিজয়ী একজন বিশ্বখ্যাত বীর। পৃথিবীর পূর্বপ্রান্ত এই এশিয়া মহাদেশে এভারেস্ট বিজয়ী তেনজিং যে সম্মানে ভূষিত হলেন, যে মর্যাদা তিনি লাভ করলেন, পশ্চিম দুনিয়ার মানুষের পক্ষে তা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। পশ্চিমের মানুষ তবু যদি তুলনা করতে চান তবে তাঁরা তা করতে পারেন চার্লস লিণ্ডবার্গের কীর্তি এবং খ্যাতির সঙ্গে। তবু লিণ্ডবার্গ নিজেও তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয়তার দিনেও এতটা শ্রদ্ধা লাভ করেননি যা আজ তেনজিং লাভ করলেন। কোটি কোটি মানুযের চোখে তিনি দেবদূত, না হয় অবতার। অনেকেই মনে করতে শুরু করল যে তিনিই পুনরায় দেহধারণকারী গৌতম বুদ্ধ। বহু মানুয আজ তাঁকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করছে। শোলো খুম্বুর সেই বালক আজকের এক বিনয়ী এবং নম্র শেরপা সর্দার, এশিয়া মহাদেশের সর্বপ্রথম মানুষ যিনি পৃথিবীর সমস্ত মানুযের বিস্ময় সৃষ্টি করলেন, শ্রদ্ধা আদায় করে নিলেন। এটা আজ বাস্তব সত্য, যে আকাশ ফুঁড়ে এভারেস্টের মাথায় পৌঁছে গেছেন তেনজিং নোরগে, এশিয়ার বহু মানুযের কাছে আজ তিনি প্রেরণার উৎস, তাঁদের এগিয়ে যাবার প্রতীক, জয় করার মন্ত্র। গ্রাম, গঞ্জ, শহর, নগর মুখরিত তাঁর কীর্তি গাথায়। তিনি হয়ে গেলেন রূপকথার মানুষ।

তাঁকে ছুঁয়ে দেখার জন্যে সে কি উন্মাদনা, তাঁকে ঘিরে আনন্দ উদ্বেল জনতার উল্লাস দেখে মনে হয় মানুষটা আর মানুষ নেই—তিনি অতিমানব, তাঁর মুখ কোনও মানুষের মুখ নয়, এক গ্রীকবীরের মুখোশ; তাঁর দেহ দেহ নয় দেবতার ছায়া, তিনি আলোছায়ায় ধরা না দেওয়া এক রূপকথার মূর্তি। শুধু অভিনন্দন আর আলিঙ্গন, এ অত্যাচার তাঁকে সইতে হয়েছে, সহ্য করতে হয়েছে পূজার ছলে সকল উন্মাদনা এবং সত্যসত্যই সে ছিল এক বাঁধন ছেড়া ভালবাসার যন্ত্রণাকাতর দিন। তবু এত সবের মধ্যে তিনি যখন বলে ওঠেন, "আমি আজও সেই পুরনো তেনজিং"—তখন তার চেয়ে সত্য বোধহয় আর কিছুই নেই। আমরা চাই তিনি তাই থাকুন, সেই পুরনো সরল সাধাসিধে তেনজিং যাঁকে আমরা পেয়েছি তাঁর অকপটে বলা এই আত্মজীবনীর মাধ্যমে।

এভারেস্ট বিজয়ের এই সঙ্গীকে প্রায়ই মাপে ছোট করে দেখানো হয়েছে—কিন্তু এটা

আদৌ ঠিক নয়। খুব লম্বা হিলারীর পাশে পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি মাপের তেনজিংকে ছোট দেখাতে পারে কিন্তু আসলে তাঁর দেহ সৌষ্ঠব বেশ সুঠাম। তাঁর ভেতরটাতেও কোন ক্ষুদ্রতা নেই, নেই কোনও প্রাদেশিকতা—যেটা গ্রাম্য পাহাড়ীদের সম্পর্কে কারও ভেবে ফেলা অসম্ভব নয়। সমস্ত শেরপাদের সম্পর্কেই কমবেশি একথা বলা চলে।

এই অশিক্ষিত শেরপা জাতি (আজও তাদের নিজস্ব কোনও বর্ণমালা নেই), কঠিন পর্বতে ভারী মাল বইবার জন্যে এবং পর্বতারোহণের সহজাত দক্ষতার জন্যে বহির্বিশ্বে যথেষ্ট সম্মান লাভ করেছে। আর তেনজিং হল শেরপাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গুণের অধিকারী। তেনজিং-এর সঙ্গে কারও কোনও বিরূপ সম্পর্কের কথা ভাবাই যায় না। সুঠাম দেহের অধিকারী এই মিষ্টি স্বভাবের মানুষটির সদা হাস্যময় মুখের চঞ্চল চোখ দুটি যেন ছেলেমানুষীতে ভরা। তিনি কথা বলেন চটপট আর পান করতে ভালবাসেন। তা সে পানীয় চা-ই হোক অথবা ছাং! স্বভাবটি ঠিক শাম্পেনের মত সদাই চঞ্চল। মানুষকে আকর্ষণ করার এক বিশেষ গুণ আছে তাঁর মধ্যে।

এ ছাড়া বহু বছর সাহেবদের সঙ্গে এবং দেশীয় মানুষজনের সঙ্গে পর্বতারোহণের জন্যে বেশ কয়েকটা ভাষা তিনি আয়ত্ত করেছেন, সভ্য জগতের আদব কায়দাও রপ্ত করেছেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল মনের মত মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশা করা আর একটু ভাল খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকা। পর্বতারোহণ সংক্রান্ত যে কোনও নতুন কৌশল শেখার ব্যাপারে তাঁর বালকের মত কৌতূহল ছিল স্বভাবজাত। কেউ যদি চেষ্টা করে তবে হয়ত তেনজিং-এর অনেক গুণাবলী রপ্ত করতে পারবে কিন্তু পর্বতারোহণে তাঁর যে সহজাত দক্ষতা তা স্বতস্ফূর্ত, সকল রকম কৃত্রিমতা বর্জিত এবং তা তাঁর একান্ত নিজস্ব। এই কুশলতা শত চেষ্টাতেও আয়ত্ত করা যাবে না। এভারেস্ট জয় করে তিনি এমন এক কীর্তি স্থাপন করলেন, এমন এক আকাশ ছোঁয়া সম্মানের অধিকারী হলেন যা যে কোনও মানুষের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে। সেই মানুষ যদি নিজেকে অলৌকিক শক্তিধর ভাবতে শুরু করে তাহলেও কিছু মনে করার নেই। এমন সাফল্য মানুষের নিজস্ব সত্তা গ্রাস করে নেবার পক্ষে যথেষ্ট। অথচ তেনজিং ঠিক আগের মতই আছেন, তাঁর ভদ্রতা, বিনয় তাঁর মর্যাদাবোধ এতটুকু বদলায় নি। তিনি শুধু একজন পর্বতারোহী হয়েই জন্মগ্রহণ করেননি তিনি একজন সত্যিকারের মানুষ।

দার্জিলিং-এ তাঁর বাড়িটি প্রাণসম্পদে ভরপুর। সেখানে একছত্র কর্ত্রী তাঁর প্রাণচঞ্চল স্ত্রী আং লামু। সকল বিষয়ে তাঁর স্বচ্ছ তীক্ষ্ণ চোখ, বালিকা সুলভ হাসিটি সমস্ত বাড়িটা ভরিযে রেখেছে। দুই মেয়ে, দুটি ভাগ্নী, একগাদা পিসতুতো, মামাতো ভাইবোন, নিজের বোনেরা, শালা, ভায়ের শালারা কে নেই সে বাড়িতে। তদুপরি রয়েছে নানা দেশের নানরকমের দর্শনার্থীর ভিড়—যেন মেলা বসে আছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল এরই ফাঁকে একগাদা কুকুর ছানা ঘুর ঘুর করছে বাড়ির যত্র তত্র, কেউ বাধা দেয় না তাদের। যেদিকে তাকাও শুধু বই আর বই স্তূপীকৃত হয়ে আছে। এছাড়া রয়েছে ফটো, সুভেনীর আর নানাদেশের হরেক রকম উপহার সামগ্রী। বাড়ির দোতলায় একটা প্রার্থনা ঘর আছে। সেখান থেকে সদাই প্রার্থনা চক্র ঘোরাবার আওয়াজ ভেসে আসছে, তাঁরই এক শ্যালক সম্প্রতি লামা হয়েছেন এবং তিনিই এই প্রার্থনা ঘরের দায়িত্ব নিয়েছেন। বসার ঘরে চায়ের এক এলাহী বন্দোবস্ত, যখনই বল চা প্রস্তুত। অবশ্য এসব কিছুরই মধ্যমণি হলেন তেনজিং নিজে। প্রত্যেকের সঙ্গেই তাঁর

সেই স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ী এবং নম্র ভাষায় কথা বলছেন। অতিথিদের মধ্যে অনেক ভাষার মানুষ রয়েছেন, তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করছেন তাঁদের সঙ্গে তাঁদের ভাষায় কথা বলতে। সদাই হাস্যময় উদ্ভাসিত মুখে ঝকঝকে দাঁতের সারি। তেনজিং আছেন অথচ তাঁর হাসিটি নেই একথা ভাবা যায় না। অথচ পরিস্থিতির চাপে কখনও কখনও সে হাসিও যেত মিলিয়ে। বহু দিন এমন হয়েছে যেন সারা বিশ্ব ভেঙ্গে পড়েছে তাঁর বাড়িতে, জনতার জোয়ার এক জনস্রোত, কেউ উৎসুক তাঁকে একটু দেখার জন্যে, কেউ এসেছে শ্রদ্ধা আর ভালবাসার ডালি নিয়ে, এরই ফাঁকে হিংসুটে মানুষজন এসেছে মজা দেখতে, কেউ এসেছে নিজের ধান্দায় কিছু গুছিয়ে নিতে ; আর এরা সবাই চায় তাঁর কাছে আসতে, আরও আরও কাছে। মানুষের চাপে, আশঙ্কা হয়, বাড়িটাই না ভেঙ্গে পড়ে হুড়মুড় করে। আর ঠিক এইরকম মুহূর্তগুলিতে এভারেস্ট বিজয়ী মানুষটি বদলে যেতেন আমুল। সরল মানুষটির মুখ থমথম করত, ঠোঁট চেপে বসে থাকতেন, চোখে ফুটে উঠত এক শিকারী চাহনি। কল্পনা কর তো এবার কি ঘটতে চলেছে? যা ঘটতে চলেছে তা কল্পনার বাইরে। চকিতে দাঁড়িয়ে উঠে ঝড়ের বেগে তিনি অদৃশ্য হয়ে যাবেন ঘরের বাইরে। যেমন করে অদৃশ্য হয়ে যায় হিমালয়ের তুষার মানব। খ্যাতির বিড়ম্বনায় আজ তিনি বন্দি। অন্য শেরপারা, তাঁর সাথী সহ অভিযাত্রীরা যখন পরম সুখে নতুন নতুন পর্বত অভিযানে অংশ নিচ্ছেন তখন তিনি শুধুই দর্শক। বড় একা, তাঁকে ঘিরে এই যে এত কোলাহল তার মাঝে তিনি বড়ই অসহায়। যেন চিড়িয়াখানার জালে বন্দি এক জন্তু অথবা বোতলে রাখা মাছ, দর্শকদের আনন্দ বর্ধন করে চলেছেন। তাঁকে এই যন্ত্রণা পেতে হত না, এমন মানসিক কষ্ট তাঁকে সইতে হত না, যদি তিনি আর একটু কম বুদ্ধিমান হতেন এবং এতটা স্পর্শকাতর না হতেন। আর পাঁচজন শেরপার মতই তাঁর পুঁথিগত কোনও বিদ্যা ছিল না। কিন্তু জগৎ সংসার সম্বন্ধে তাঁর একটা স্বচ্ছ ধারণা ছিল, যে কোনও মানুষকে দেখে তার স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা করতে পারতেন। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি যে কোনও শিক্ষিত মানুষকে লজ্জা দিতে পাবে। এভারেস্ট বিজয়ের পর তাঁকে ঘিরে অনেক জলঘোলা হয়েছে। এই ঘোলাজলে অনেকে অনেক কিছু করে নিয়েছে। তাঁর নাগরিকত্ব নিয়ে যে বিরক্তিকর পরিস্থিতির ষ্টি হয়েছিল তাতে তিনি যথেষ্ট বিব্রত বোধ করতেন, আসলে সকল কিছুর উর্ধে তিনি নিজেকে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে পরিচয় দিতে বেশি পছন্দ করতেন।

সংঘাতের মধ্য দিয়ে কখনও সখনও বা বিশেষ কোনও চমকের সৃষ্টি করে জীবন বয়ে যায়। এরই ফাঁকে কেউবা হঠাৎ করেই নায়কের মর্যাদায় ভূষিত হয়। এটা প্রায়ই দেখা যায় যে অতি সাধারণ মানুষও ঠিক সময়ে ঠিক সুযোগটি কাজে লাগিয়ে মানুষকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। আর তখনই বিশ্বমঞ্চে তাকে নিয়ে শুরু হয়ে .গছে মাতামাতি। প্রথম এভারেস্ট বিজীয় তেনজিং নোরগেকে তাদের সমগোত্রীয় বলা যায় না। তাঁর কৃতিত্ব নিছকই এক দুর্ঘটনা নয় পরন্তু এখানে পৌঁছবার জন্যে তিনি সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। এর জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করেছেন। এই প্রসঙ্গে উইলিয়াম ব্লেকের লেখা 'টাইগাব! টাইগার! বার্ণিং ব্রাইট' নামক বইটির কথা মনে পড়ে, যেখানে ব্লেক জঙ্গলের রাজাকে চিত্রিত করেছেন এক উজ্জ্বল দৃপ্ত আভায়। সে আভাও ম্লান হয়ে যায় যখন তাকে রক্ত মাংসের তুষার শার্দূল তেনজিং এর সঙ্গে তুলনা করা হয়। এক অনির্বাণ অগ্নিশিখা সদা প্রজ্জ্বলিত রয়েছে তাঁর হৃদয়ে। কোনও আঘাত

তাকে নির্বাপিত করতে পারবে না। তাঁর চরিত্র—আশা এবং স্বপ্ন, ইচ্ছাশক্তি ও সংগ্রাম, আত্মাভিমান আর নম্রতার এক অত্যাশ্চর্য সংমিশ্রণ। এভারেস্ট বিজয়ের দারুণ সাফল্যের পরেও তাঁকে দেখলে যে জিনিস চোখে পড়ে তা তাঁর হৃদয় জুড়ানো বিনয়ী হাসি।

শীর্ষারোহণের মাহেন্দ্রক্ষণে যে অনুভূতি তাঁর চেতনাকে আচ্ছন্ন করেছিল তা হল তাঁর প্রিয় চোমোলোংমার জন্যে গভীর শ্রদ্ধা। হৃদয় উজাড় ক'রে তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যেন তিনি এ সম্মানের যোগ্য হয়ে উঠতে পারেন।

এ পর্যন্ত আমার কথা পড়ে অনেকেরই হয়ত এমন মনে হতে পারে যে আমি রামজে উল্‌ম্যান ব্যক্তিটি তেনজিং-এর গুণমুগ্ধ এক ভক্ত। কথাটা হয়ত মিথ্যা নয়। প্রথম থেকেই পর্বতারোহণ এবং পর্বতারোহীদের সম্বন্ধে আমার প্রচ্ছন্ন দুর্বলতা রয়েছে। আর তেনজিংকে দেখার পর তাঁর সংস্পর্শে এসে আমি মানুষটার গুণাবলি দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তাঁর জীবন নিয়ে এই বইটি লিখতে পেরে আমি সত্যিই তৃপ্ত। জীবনে কোনও কাজ করে আমি এত তৃপ্তি লাভ করিনি। অথচ এই বইটি আদপে লেখা হবে কিনা এই নিয়েই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। বিশ্বজোড়া এক ভয়ংকর লালফিতের ফাঁশ এর টুঁটি চেপে ধরতে চেয়েছে। আজ দার্জিলিং-এ তাঁর বাড়িতে বসে এই যে আমরা কথা বলছি এটাতেও বাধা দেওয়া হয়েছে। কতশত ঘন্টা যে মুখোমুখী বসে কথা বলেছি কে তার হিসেব রাখে, মাঝে মাঝে কাজ করা খুব কঠিন হয়েছে ভাষার সমস্যার জন্যে। আর ঠিক সেই সময় অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি তেনজিংএব অভিন্ন হৃদয় বন্ধু শ্রী রবীন্দ্রনাথ মিত্রের কাছ থেকে। তিনি তখন দোভাষীর কাজ করেছেন। ক্রমে অবশ্য তেনজিংও কাজ চলার মত ইংরেজী বলা শিখে নিয়েছেন। তখন তাঁর কথা বুঝতে অসুবিধে হয়নি। বইটি পড়ে পাঠক যে রায়ই দিন না কেন যৌথ উদ্যোগে বইটি লিখতে পেরেছি এতেই আমি খুশি। বইটি কিছুই নয়—তেনজিং তাঁর কথা বলে গেছেন আর আমি তা লিখে গেছি। আমি একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে এই বলার মধ্যে কোনও অসত্য কিছু নেই। নেই কোনও গোপনীয়তা। তিনি নিজে যা বিশ্বাস করেন অন্তরে যা অনুভব করেন তাই বলেছেন অকপটে, সে তাঁর স্বজাতীয়দের সম্বন্ধেই হোক, পর্বতারোহণ সংক্রান্ত বিষয়েই হোক অথবা তাঁর নিজের ঈশ্বর বিশ্বাস সম্বন্ধেই হোক। তাঁব জীবনে এমন একটা সময় এসেছে যখন হিমালয় এবং ঈশ্বর মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। তাঁর কাছে পর্বতচূড়া মানে তীর্থস্থান।

যাঁরা পাহাড়ে যান তাঁদের প্রায়ই একটা অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখোমুখী হতে হয়, আর সেটা হল, "মানুষ কেন পাহাড়ে যায়?" যাঁর কাছেই প্রশ্নটা অস্বস্তিকর হোক না কেন তেনজিং এর সমগ্র জীবনটাই হল এই প্রশ্নের উত্তর।

এতক্ষণ তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হল যা শুনে মনে হতে পারে তিনি অতিমানব অথবা বিদেহী কোনও আত্মা। আসুন এবার আমরা সব ধোঁয়াশা কাটিয়ে রক্তমাংসের তেনজিং-এর মুখোমুখী হই। এই সেই বীর যার কোনওদিন কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি, যিনি জন্ম থেকেই পর্বতারোহী।

শুধু এইটুকু? এর বাইরে কি অনেক কথা না বলা থেকে যায় না? এই কি সেই মানুষ নন যাকে পেয়ে শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র পৃথিবীই গর্বিত?

দুস্তর পথ

বহুবার আমি ন'নম্বর শিবিরের সেই সকালের কথা ভাবি। আমি আর হিলারী আঠাশ হাজার ফুট উঁচুতে আমাদের ছোট্ট তাঁবুতে আগের রাত কাটিয়েছি। পৃথিবীর উচ্চতম স্থান, যেখানে কোনও মানুষ এই প্রথম রাত কাটাল। প্রচন্ড ঠান্ডায় হিলারীর জুতোজোড়া জমে পাথর হয়ে গেছে। ঠান্ডায় আমরা উভয়েই কাহিল, ভোরের ধূসর আলোয় আমরা যখন হামাগুঁড়ি দিয়ে তাঁবুর বাইরে এলাম তখন বাইরে কোনও হাওয়া নেই, পরিষ্কার নীল আকাশ।

দিনের পর দিন যা করেছি তাই করলাম, ওপর দিকে তাকালাম, শুধুই ওপর দিকে তাকিয়েছি আকুল আগ্রহে। এত কাছে মাত্র হাজার ফুটের মধ্যেই আমাদের সেই সোনালী স্বপ্ন--প্রিয় এভারেস্ট। মহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত, আজ আর সে স্বপ্ন নয়, হাতের নাগালের মধ্যে ভীষণ বাস্তব। আমরা প্রস্তুত হয়ে নিলাম। ঈশ্বরের করুণায় আমরা নিশ্চিত এবার সফল হব।

এতদিন, শুধুই ওপর দিকে তাকিয়েছি এবার একবার নিচের দিকে তাকাবার পালা। আমাদের পশ্চিমে নুপৎসে (Nuptse) দক্ষিণে লোৎসে (Lhotse), পূর্বে মাকালু (Makalu)। এদের সকলকেই ঘাড় নিচু করে দেখছি। তার নিচে আরও কয়েকশো। এখান থেকে শৈলশিরা ধরে দু'হাজার ফুট নিচে সাউথ কল, ঐখানে এখন আমাদের জন্যে উৎকণ্ঠা আর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে গ্রেগরী, লোয়ে এবং তরুণ শেরপা আং নিমা। গতকাল এখান পর্যন্ত আমাদের জন্যে মাল পৌঁছে দিয়ে ওরা সাউথ কলে নেমে গেছে। সাউথ কলের নিচে লোৎসের সাদা দেওয়াল দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে চার হাজার ফিট নিচে লোৎসের পায়ের কাছে ওয়েস্টার্ন কুম (Western Cwm), এখানের শিবিরেই অপেক্ষা করছে বাকি সদস্যরা। কুম এর নিচে বরফের ধস অঞ্চল। ধস পার হয়ে খুম্বু হিমবাহ। হিলারীও আমার মতই নিচের দিকে তাকিয়ে আছে। ষোল হাজার ফুট নিচে থায়াংবোচের বৌদ্ধমঠ দেখা যাচ্ছে। আমি সেদিকে হিলারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। হিলারীর কাছে ব্যাপারটার তেমন কোনও গুরুত্ব আছে বলে মনে হল না কারণ পশ্চিম দুনিয়ার যে কোনও মানুষের কাছে এটা নিছক একটা স্থান, একটা অজানা দেশ। কিন্তু আমার কাছে! ওটা আমার দেশ। ওখান থেকে আর একটু নিচে শোলো খুম্বুর এক গ্রামে আমি জন্মেছি। সেখানকার উঁচু পাহাড়ী টিলায় খেলা করেছি, ঘাসে ছাওয়া জমিতে ইয়াক চরিয়েছি। আমার বাড়ি—মনে হয় হাত বাড়ালেই তাকে ছোঁয়া যাবে।

এবার হাতে তুলে নিলাম অক্সিজেন সিলিন্ডার। সেটা কাঁধে বাঁধতে বাঁধতে ভাবছি আমাদের গ্রামের সেই সব শেরপা বালকদের কথা যারা অক্সিজেনের নামও শোনেনি কখনও, কিন্তু মাথা তুলে তাকায় সাগরমাথার দিকে, তার মাথায় ওঠার স্বপ্ন দেখে।

হিলারী আর আমি ঘুরে দাঁড়ালাম, শুরু হল পথ চলা। বহু দূরের বহু পথ অতিক্রম করে আজ আমি এখানে। আমার সারা জীবনের একটাই স্বপ্ন, আমি চোমোলোংমার শীর্ষে আরোহণ করব। এর আগে ছ'ছবার চেষ্টা করেছি, পারিনি, আবার ফিরে এসেছি। কোনও অহংকার বা জেদ নিয়ে নয়, সৈনিকের মত প্রতিহিংসা বা শত্রুতা করার জন্যেও নয়। আমি এসেছি ভালবেসে, যেমন করে এক শিশু তার মায়ের কোলে ওঠার জন্যে ব্যাকুল হয়। অবশেষে আমি সফল হলাম। 'থুজি চে'- আমি ধন্য।

তাই আমার এই জীবন কাহিনী আমি চোমোলোংমার চরণে নিবেদন করলাম। সে আমাকে জীবনে সব দিয়েছে, তাই তার জন্যে এ আমার সামান্য অঞ্জলি। আমি জানি আমার সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়। এমনকি আমি যা নই আমার সম্বন্ধে তাও বলা হয়। আমি একজন অশিক্ষিত মানুষ। কিন্তু আমার অনেক কিছু জানতে এবং শিখতে ইচ্ছে করে। অথচ আমি এটা ভালভাবেই জানি এই চল্লিশ বছর বয়সে হয়ত সেটা সম্ভব নয়। তাই আমি চাই না যে আমার মেয়ে দুটো আমার মত অশিক্ষিত হোক। তারা এখন স্কুল যাচ্ছে, আধুনিক পৃথিবীকে জানছে। অবশ্য আমি আমার নামটা এখন সই করতে পারি। আর সেটাই বা কম কিসে। এভারেস্ট আরোহণের পর আমি এতবার নিজের নাম সই করেছি যে অনেক শিক্ষিত মানুষও তার সারাজীবনে এত সই করে না।

আমার অনেক বই আছে। আশ্চর্য মনে হলেও একথা সত্য। অথচ ছোটবেলায় আমি একটাও বই দেখিনি, যা দেখেছি তা হল বৌদ্ধ মঠের দু-চারটে পুঁথি। বড় হয়ে আমি যখন পর্বত অভিযানে যাওয়া শুরু করলাম তখন বইয়ের কথা শুনলাম। বুঝলাম বই থেকে অনেক কিছু শেখা যাবে। আমি যাদের সঙ্গে অভিযানে গিয়েছি তারা অনেকেই পরে বই লিখেছেন। সে সব বই আমাকে পাঠিয়েও দিয়েছেন। যদিও আমি পড়তে পারিনা তবু বুঝতে পারি সে সব বইয়ে কি লেখা আছে। বিশেষ করে আমার সম্বন্ধে কি লিখেছে। মনে হয় একজন মানুষ সারা জীবনে কি করেছে, কি ভেবেছে তার সবই লেখা থাকে তার বইয়ে। আর আজ আমারও একটা বই লেখা হচ্ছে তা হল আমার জীবনী।

আমার লেখা শুরু করার আগে আমি কিছু কথা স্বীকার করে নিতে চাই। প্রথমেই জানাই শেরপা ভাষা যা আমার নিজের ভাষা তার কোনও লেখার অক্ষর নেই। আমাদের বাড়িতে আমরা তিব্বতী ক্যালেন্ডার অনুসরণ করি। এছাড়া আমি নিজেও লেখাপড়া জানিনা। পর্বতারোহণকালে তাই আমার পক্ষে কোনও ডায়েরী লেখা সম্ভব হয়নি। কাজেই যে সমস্ত অভিযানের জন্যে কোনও বই লেখা হয়নি সেই অভিযানে আমি যাদের সঙ্গে আরোহণ করেছি তাদের নাম ঠিকমত উচ্চারণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় এবং সে কারণে আমি সত্যি দুঃখিত। অবশেষে জীবনীগ্রন্থের শুভারম্ভে সকল সাথী আরোহীদের জন্যে আমার আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখি।

ছোটবেলায় আমাকে তেনজিং নামে ডাকা হত না, তখন আমার অন্য নাম ছিল। আবার পশ্চিমের লোকেরা আমার তেনজিং নামের বানান লিখতে গিয়ে কখনও 'এস' আবার কখনও বা 'জেড' বসিয়েছে। নামের শেষে কেউ কেউ 'জি' বাদ দিয়েও লিখেছে। নিজের নামের বানান লিখতে আমি নিজেও অনেকবার ভুল করেছি। কারণ একটাই আর তা হল শেরপাদের নিজস্ব কোনও বর্ণমালা নেই। আমাদের দেশে খুমজুং বলে একটা গ্রাম আছে, আমার নামের দ্বিতীয় ভাগ সেই গ্রামের লোকেরা ঠিক করেছে। 'নোরকে', 'নোরকি', 'নোরগা', 'নোরগে' যাই বলা হোক ভোটিয়া বা তিব্বতী ভাষায় এর মানে হল 'ভাগ্যবান'।

আমাদের গোষ্ঠীগত পরিচয় হল খাংলা অর্থাৎ 'তুষার ঢাকা গিরিবর্ত্ম'। শেরপারা নামের শেষে পদবী ব্যবহার করে না। অবশ্য আমি ইদানিং আমার নামের সঙ্গে পদবী ব্যবহার করি। সম্প্রতি পন্ডিত লামারা আমার নামের বানান ঠিক করে দিয়েছেন, তাঁদের ইচ্ছা অনুযায়ী আমি

'তেনজিং নোরগে'। প্রশাসনিক প্রয়োজনে আমি নামের শেষে শেরপা বসাই। এতে জাতিগত ভাবে নিজেকে স্পষ্ট করে চিহ্নিত করা যায়। নিজের সম্প্রদায়কে সম্মান জানাবার এটাই শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে আমি মনে করি। আমি আজীবন শেরপা পরিচয়েই বাঁচতে চাই।

আমার দেশ ভারতবর্ষ। এই বিশাল দেশের বহু জাতি বহু ভাষা, এখানে সকলের জন্য একটাই ভাষা ঠিক করা সম্ভব নয়। এখানে এমন কি এক জেলা থেকে পাশের জেলার ভাষায় তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। আমি লেখাপড়া না জানলেও অনেকগুলি ভাষায় কথা বলতে পারি। কারণ এরই মধ্যে আমি এদেশের বহু জায়গায় ভ্রমণ করেছি। শোলো খুম্বুর উত্তর এবং দক্ষিণের শেরপা ভাষার উচ্চারণে তারতম্য আছে। খুব ছোটবেলা থেকেই আমি দু'ভাবে কথা বলতে পারি। যেহেতু শোলো খুম্বু নেপালেরই অংশ তাই আমি নেপালী ভাষায় কথা বলতে পারব এটাই স্বাভাবিক। বিশুদ্ধ হিন্দি বলতে না পারলেও উর্দু মেশানো চলিত হিন্দি বলতে পারি। আর যে কটা ভাষায় আমি অল্পস্বল্প কথা বলতে পারি তা হল গাড়োয়ালী, পাঞ্জাবী, সিকিমি, ইয়ালমো (নেপালের একটি অংশের ভাষা), পস্তু (আফগানিস্থানের একটি ভাষা), চিত্রালি (উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ভাষা), এবং দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি ভাষার গুটিকয় শব্দ। এবার নিশ্চয়ই আমাকে ভাষাবিদ বলতে আপনাদের আপত্তি হওয়া উচিত নয়! বাড়িতে আমি একটা ভাষাতেই কথা বলি। তা আমার মাতৃভাষা শেরপা। দার্জিলিং-এ থাকলে নেপালী ভাষায় কথা বলি। এছাড়া পাশ্চাত্যের কয়েকটা ভাষাতেও কথা বলতে পারি। বহু বছর ধরে ইংরেজদের সঙ্গে অভিযানে যাবার সুবাদে ইংরেজী ভাষাটা শিখেছি। ভারতে আমার অনেক ইংরেজ বন্ধু আছেন। এই বই লেখার সময় তাই ইংরেজী বলতে আমার অসুবিধে নেই, দোভাষী ছাড়াই অনেকটা চালিয়ে নিচ্ছি। অনেক দেশের অনেক অভিযাত্রীর সঙ্গে আমি পর্বত অভিযানে গিয়েছি। তাদের সঙ্গে মিশে তাদের ভাষাও অল্পস্বল্প শিখেছি। তুমি যদি তার দু একটা শুনতে চাও তবে আমি তা তোমাদের শোনাতে পারি। ফরাসী ভাষা শুনবে? সা ভা বিয়েন, মেস ব্রাভেস্! আর জার্মান ভাষা? তাও জানি—এস গ্যাথ গুট। ইটালিয়ান—মলতো বেনি। তবে আমি কখনও পোলান্ড অথবা জাপানের অভিযাত্রীদের সঙ্গে অভিযানে যাইনি, ভাগ্যিস যাইনি!

বহু দেশ ঘুরেছি, দেখেছি, শেখার চেষ্টা করেছি। ঘুরে বেড়ানো আমার রক্তে মিশে আছে। বালক বয়সে একবার শোলো খুম্বু থেকে কাঠমাণ্ডু পালিয়েছিলাম। ফিরে এসে কিছু দিনের মধ্যেই আবার পালিয়ে দার্জিলিং চলে এলাম। দার্জিলিং এ এসে কুড়ি বছর ধরে হিমালয়ের বিভিন্ন প্রান্তে বহু অভিযানে গিয়েছি। অনেকবার সিকিম গিয়েছি, নেপাল গিয়েছি। এছাড়া গাড়োয়াল, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, আরও দূরে আফগানিস্থান এবং রাশিয়ার সীমান্তে গিয়েছি। এছাড়া হিমালয় টপকে তিব্বত গিয়েছি, সেখান থেকে লাসা। ভারতবর্ষের উত্তর থেকে দক্ষিণে ভ্রমণ করেছি, ইংল্যাণ্ড গিয়েছি, দু'বার সুইটজারল্যাণ্ড গিয়েছি। অল্প সময়ের জন্যে রোমেও গিয়েছি। অবশ্য এখনও ইউরোপের অনেক দেশে যাওয়া হয়নি, আমেরিকাতেও না। আশা করছি এসব দেশেও একদিন যেতে পারব। আসলে ভ্রমণ মানেই অভিজ্ঞতা আর শেখা—জীবন তো এমনই হওয়া চাই। যত পার দেশ দেখ, ঘুরে বেড়াও। পৃথিবী বিশাল, তুমি এর সব জায়গা দেখতে পারবে না কিছুতেই, এমনকি এভারেস্টের চূড়োতে উঠলেও না।

পাহাড় থেকে পড়ে যাওয়া অথবা তুষারক্ষতের মত কোনও দুর্ঘটনা আমার জীবনে ঘটেনি। অথচ দেখ সবার ক্ষেত্রে এমন হয় না। আমার স্বজাতীয় শেরপাদের অনেকেই পাহাড়ে দুর্ঘটনায় প্রাণ দিয়েছে। আরোহণকালে যাদের খুব ঘাম হয় তাদের হাত পায়ের আঙ্গুলে তুষারক্ষত হবার ভয় থাকে, আমার কখনও ঘাম হয় না। পর্বতারোহণকালে সাধারণত সবাই যখন শিবিরে বিশ্রাম করে তখনও আমি কিন্তু কিছু না কিছু কাজ করি। অভিযানকালে সর্বদা নিজেকে কাজের মধ্যে ব্যস্ত রাখলে অসুস্থ হবার ভয় থাকে না। অভিযান চলাকালীন তুমি যদি সুযোগ পেলেই চুপচাপ বসে থাক পরিশ্রম করায় মন নেই, তাহলে কিন্তু তুষারক্ষতে আক্রান্ত হবার ভয় থাকে, ভয় থাকে অসুস্থ হবার।

আমি তিনবার তুষার ধসের কবলে পড়েছিলাম তবে তেমন মারাত্মক কিছু নয়। তুষারাবৃত ময়দানে একবার আমার রঙিন চশমা হারিয়ে গেল। সেবার তুষার অন্ধত্বের যন্ত্রণা আমাকে সইতে হয়েছে। তারপর থেকে আমি সব সময় দুটো করে রঙিন চশমা সঙ্গে রাখি। স্কী করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ে আমার পাঁজরের চারটে হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল। পর্বতারোহণেও একবার হাতের একটা আঙ্গুল ভেঙ্গে গিয়েছিল। আর সেটা ঘটেছিল আমার এক বন্ধুর পতন রোধ করতে গিয়ে। পাহাড়ের অনেক উঁচুতে উঠলেও আমার তেমন কোনও শ্বাসকষ্ট হয় না, অভিযাত্রীরা যখন অক্সিজেনের অভাবে কষ্ট পায় আমি তখন দিব্যি কাজ করে যাই। আর এইসব দেখেই বোধহয় বন্ধুরা বলাবলি করে যে আমার নাকি তিনটে ফুসফুস। আচ্ছা এমন কথা শুনলে কার না হাসি পায়? অবশ্য কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। অন্য যে কোনও লোকের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি পাহাড়ের উচ্চতায় আমি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারি। কারণ আমি যে শুধু হিমালয়ে জন্মেছি তাই নয় আমার সমস্ত হৃদয় জুড়ে হিমালয়। গরমের দিনেও আমার হাতপা ঠান্ডা থাকে, ডাক্তাররা বলেন আমার হৃদস্পন্দন খুব কম। পাহাড়ে জন্মেছি, থাকিও সেখানেই তাই পাহাড়ে চড়ায় আমার একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। গরম সহ্য করতে পারিনা মোটেও। একবার ভারতভ্রমণে বেরিয়ে দারুণ গরমে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। দমবন্ধ করা ভিড় আর গরম আমার পক্ষে অসহ্য। পাহাড় আমার প্রিয়, সে আমার ভাগ্য বিধাতা। আমি যাদের সঙ্গে অভিযানে গিয়েছি তারা সুন্দর মানুষ। তাই বলে অন্য মানুষজনকে আমি ছোট করছি না। আর আমার স্বজাতীয় শেরপা ভাইদের জন্যে তাদের বীরত্বের জন্যে আমি গর্বিত। আমি ইংরেজ, ফরাসী, আমেরিকা, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, ইটালি, কানাডা, নিউজিল্যান্ডের অভিযাত্রীদের সঙ্গে অভিযানে গিয়েছি। শুধু স্বদেশী নয়, পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আমার ভাল লাগে। ১৯৫২ সালে যার সহযাত্রী হিসেবে অমি প্রায় এভারেস্টের মাথায় পৌঁছে গিয়েছিলাম সেই রেমন্ড ল্যামবার্ট জাতিতে সুইস, কথা বলেন ফরাসী ভাষায়। আমরা কেউ কারও ভাষা জানি না। ইশারায় কথা হয়। অথচ আমাদের এতই বন্ধুত্ব যে দেখলে মনে হবে আমরা বোধহয় একই গ্রামের লোক।

১৯৫৩ সালের ব্রিটিশ এভারেস্ট অভিযানে অনেকগুলো সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। আমরা সব সময় ঠিকঠাক বলি না। আমরা কেউই ভগবান নই—আমাদের অনেক ভুল হয়। যেহেতু ঐ অভিযান সফল হয়েছে তাই বাইরেব লোকজন ওর সমস্যাগুলোকে নিয়ে অযথা হৈচৈ করেছে, অতিরঞ্জিত করেছে। এখন আমি নিজে লিখতে বসেছি তাই যেমন ঘটেছে ঠিক তাই

বলব। কারও সম্বন্ধে আমার কোনও অভিযোগ নেই। এভারেস্ট বিশাল, তার শীর্ষে আরোহণ করা অনেক মূল্যবান, তাকে কেন্দ্র করে কোনও তিক্ততাই কাম্য নয়, তবু এই অভিযান নিয়ে এশিয়দের সঙ্গে ব্রিটিশদের একটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। অথচ একটা ব্যাপারে আমাদের মিল রয়েছে, আর তা হল আমাদের একটাই লক্ষ্য, একই ভালবাসা এবং আত্মত্যাগ —এভারেস্ট। পৃথিবীর সকল পর্বত অভিযাত্রী পরস্পরের ভাই, এটাই হোক আমাদের আত্মার বন্ধন।

রাজনীতি আর জাতবিচার পৃথিবীতে কত কাণ্ডই না ঘটাচ্ছে, অথচ পাহাড়ে এগুলো মূল্যহীন, যেখানে জীবন ও মৃত্যু হাত ধরাধরি করে চলেছে, সেখানে আমাদের একটাই পরিচয় আমরা মানুষ, ব্যস! অথচ যেই তুমি পাহাড় থেকে ফিরে এলে শুরু হল তর্ক, ঝগড়া, রাজনীতি। আমিও যেদিন এভারেস্ট অভিযানে সফল হয়ে ফিবলাম আমাকে ঘিরেও শুরু হল সেই একই আবর্ত। আমার জীবনের প্রথম আটত্রিশটা বছর আমি নেপালী, ভারতবাসী অথবা তিব্বতী এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নি। তবে আজ কেন এসব প্রশ্ন? আমি একজন শেরপা, সাধাবণ পর্বতবাসী, হিমালয়েব সন্তান—এই আমার আসল পরিচয়।

আজ আমি যেন সুতোয় ঝোলানো একটা পুতুল। যার যেমন খুশি সেভাবে নাচাতে চায় আমায়। এরা আমাকে দিয়ে বলাতে চায় যে আমিই হিলারীর আগে উঠেছি— হোক না কেন তা একফুট অথবা এক ইঞ্চি আগে। আবাব কেউ বলে তেনজিং নেপালী। অন্যরা সঙ্গে সঙ্গে বলে কক্ষনও না—ও আসলে ভারতীয়। আসল সত্যটা যেন কিছুই নয়—এভারেস্ট হয়ে গেল গৌণ। দুঃখে লজ্জায় আমার কণ্ঠ বুজে আসে।

আমার নাগবিকত্ব সম্বন্ধে আমি আগে যা বলেছি এখনও তাই বলব। আমার জন্ম নেপালে, এখন আমাব স্ত্রী, দুই কন্যা এবং মাকে নিয়ে দার্জিলিং-এ থাকি। আমার কাছে ভারত এবং নৈপাল দুইই সমান। আমি একজন নেপালী শেরপা এবং ভারতবাসী। কি এসে যায় এসব জেনে এই বিশ্বজোড়া মানুষ কে কোথায় থাকে? আমি কিম্বা হিলারী অথবা তুমি এই পৃথিবীটা কি আমাদের আসল বাসভূমি নয়?

শোলো খুম্বুব ইয়াক চরানোর দিনগুলো পার করে এভারেস্ট আরোহণ এবং সেখান থেকে পণ্ডিত নেহেরুর বাড়ি থেকে বাকিংহাম প্রাসাদের অভ্যর্থনা সে এক দুস্তর অভিযান। ছিলাম কুলি, মাল বইতাম পাহাড়ে, আর এখন এই দেখ আমার কোট—কত তকমা আঁটা। তবু আমার ভাগ্য আমাকে যেখানেই নিয়ে যাক সে আমায় আবার পাহাড়েই ফিবিয়ে দেয়, এখানেই আমার জন্ম, এখানেই আমার পরম শান্তি। ১৯৫৩-র মে মাসের এক সকালে আমরা অর্থাৎ আমি এবং হিলারী যখন এভারেস্টের শীর্ষে দাঁড়িয়ে আছি তখন এই ভাবনাই আমাকে আপ্লুত করেছিল। বৌদ্ধ চক্রের ন্যায় সৌভাগ্য আজ আমার দিকে মুখ ফিরিয়েছে। যে বালক ইয়াক চবাবার সময় স্বপ্ন দেখত এভারেস্ট আ৲ হণ করাব। সফল হয়ে সে আবার ফিরে এসেছে হিমালয়ের বুকে।

কোনও পাখি যার নাগাল পায় না

শেরপা এক অদ্ভুত জাতি। পর্বতারোহীরাই শুধুমাত্র এদের নাম শুনেছে, তাও আবার পথপ্রদর্শক আর মালবাহক হিসেবে। শেরপারা এক উপজাতি সম্প্রদায়. উচ্চ হিমালয়ে যাদের বাস। শেরপা কথার মানে হল—পূর্বদেশের মানুষ। তারা মোঙ্গলদের বংশধর, বহু বছর আগে তিব্বত থেকে এসে নেপালের শোলো খুম্বুতে বসবাস শুরু করে। তিব্বতের গিরিপথ অতিক্রম করে নেপালের উত্তরে পূর্বপ্রান্তের ভূখণ্ডই শোলো খুম্বু নামে পরিচিত। এটা কিন্তু একটা জায়গা নয়, দুটি জেলা। দক্ষিণের যে জেলা একটু নিচের দিকে তা শোলো। এখানে চাষবাস হয়, জীবন যাত্রার মানও নেপালের অন্যপ্রান্তের মানুষজনের মত। কিন্তু খুম্বু অনেক উঁচুতে, রুক্ষ—অনেকটা তিব্বতের মত। শেরপারা মূলত এখানেই বাস করে। এখন আর তিব্বতে কোনও শেরপা গ্রাম নেই। তিব্বতের দিকে এভারেস্টের পাদদেশে রংবুক মঠে বেশ কিছু শেরপা সন্ন্যাসী আছে। নেপালের থায়াংবোচে এবং রংবুক মঠের যোগাযোগ রক্ষা করেন এই সব সন্ন্যাসীরা। তিব্বতীদের মত শেরপারাও বৌদ্ধ। শেরপাদের, বিশেষত যাদের সঙ্গে বাইরের জগতের বিশেষ কোনও যোগ নেই তাদের আচার ব্যবহার, চালচলনের সঙ্গে তিব্বতীদের খুব মিল আছে। এ ছাড়া ব্যবসার স্বার্থে মানুষ দল বেঁধে দু'দেশের মধ্যে যাতায়াত করে। যে কোনও দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে পাশপোর্ট লাগে। কিন্তু নেপাল এবং তিব্বতীদের মধ্যে এটার প্রয়োজন হয় না। তিব্বত এখন কম্যুনিস্ট দেশ, নেপাল নয়। পৃথিবীটা প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে। কিন্তু হিমালয়ের গভীরে অনেক উঁচুতে গ্রামে যারা বাস করে হাজার বছরেও তাদের জীবন একই রকম আছে।

শোলো খুম্বুর মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে দুধকোশী। হিমবাহ থেকে অজস্র জলধারা এসে মিশেছে তাতে। এখান থেকে নেপালের যে কোনও জায়গায় যেতে হলে হাঁটা ছাড়া উপায় নেই। কখনও গভীর গিরিখাতের গা বেয়ে পায়ে চলা রাস্তা কখনও বা উপত্যকা দিয়ে হাঁটা। এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে যেতে অনেক সময়েই সরু গিরিখাতের দুই প্রান্তে জোড়া দেওয়া পুল সন্তর্পণে পার হতে হয়, শীতকালে আর গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিঝরা দিনগুলিতে এ পথ ভয়ঙ্কর দুর্গম। একমাত্র বসন্ত এবং শরৎকালে এখান থেকে কাঠমাণ্ডু যাওয়া যায় তবে তাও পাক্কা দু'সপ্তাহের পথ।

কিছুদিন আগেও অন্য দেশের লোকেদের নেপালে প্রবেশ নিষেধ ছিল। এখন অবশ্য সে বাধা আর নেই। তবে আজও যদি কেউ নেপালে যেতে চায় হয় হাঁটতে হবে আর না হয় উড়োজাহাজে যেতে হবে। ভারত এবং নেপালের মধ্যে যোগাযোগের জন্য একটা রাস্তা তৈরি হচ্ছে, আশা করা যায় খুব শীঘ্রই সেটা শেষ হবে। এছাড়া দক্ষিণ নেপালের কোশী নদীতে একটা বাঁধ দেওয়ার কাজ চলছে। সেটা শেষ হলে নেপালে চাষবাসের সুবিধে হবে। কাজেই নেপাল এখন পৃথিবীর অন্য দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উন্নতি করার চেষ্টা করছে। কিন্তু শোলো-খুম্বু আজও সেই আদিম কালেই রয়ে গেল, এখনও বহু বছর লাগবে সেখানে মোটর গাড়ি পৌঁছতে।

আমার জন্মভূমি রুক্ষ পাথরের দেশ, আবহাওয়া কষ্টদায়ক, তবু সেখানে চাষবাস হয়।

পশুচারণের তৃণভূমি আছে. শোলো জেলার আট থেকে দশ হাজার ফুট উচ্চতা পর্যন্ত গম চাষ হয়। আর চোদ্দ হাজার ফুট পর্যন্ত চাষ হয় বার্লি এবং আলু। চীন এবং ভারতীয়দের যেমন প্রধান খাদ্য চাল, তেমনি শেরপাদের প্রধান খাদ্য আলু। সেখানে পর্যাপ্ত আলুর ফলন হয়। আমাদের কিছু জমি ব্যক্তি মালিকানার এবং কিছু জমি সকলেব জন্যে। অনেকের আবার অনেক উঁচুতে এবং নদীর তীরে দু'জায়গাতেই জমি আছে। গ্রীষ্মকালে উঁচু জমিতে চাষ হয আর শীতকালে চাষ করার জন্যে লোকজন নিচে নেমে আসে। ইয়াক, ভেড়া, ছাগল চরাবার জন্যে তৃণভূমি আছে। ইয়াক আমাদেব খুব কাজে লাগে। ইয়াকের গোবর থেকে সার হয়, চামড়ায় জুতো আর লোম থেকে জামাকাপড় তৈরি হয়। এছাড়া, দুধ ঘি চিজ্ তো আছেই। আমাদের মধ্যে অনেকেই ইয়াকের মাংস খায়, একথাটা শুনলে গোঁড়া বৌদ্ধরা রেগে যাবে তাই জনসমক্ষে যেন কথা বলে আমি কারোও বিরাগভাজন হতে চাইনা। শোলো খুম্বুতে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়, বাইরে থেকে কিছু কেনাব প্রয়োজন হয় না। উনিশ হাজার ফুট উচ্চতার নাঙ্গা লা গিবিবর্ত্ম অতিক্রম করে শেরপা ব্যবসায়ীরা হামেশাই তিব্বতে যায় ব্যবসা করার জন্যে। তারা সেখানে মশলা আর পোশাক বিক্রি করতে যায়। নেপাল এবং ভারত থেকে ব্যবসায়ীরা আসে নুন, ইয়াক এবং ছোটখাট নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র নিয়ে। শোলো খুম্বুতে হাট বাজার বলে নির্দিষ্ট কোনও স্থান নেই যেখানে কেনাবেচা হতে পারে। কোনও শহর এমনকি বড়সড় বসতিও নেই। ব্যবসায়ীবা তাদের মালপত্র নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে এবং যা কিছু কেনাবেচা ঐ রাস্তার ধারেই। শোলো খুম্বুর সবচেয়ে বড় গ্রাম হল নামচে বাজার। বিদেশী পর্বতারোহীদের এভারেস্ট অভিযানের কল্যাণে নামচে আজ পৃথিবী খ্যাত। এই উপত্যকায় খুমজুং, পাংবোচে, ডামডাং, শাকসুম, শিমবুং, থামে ইত্যাদি বহু গ্রাম রয়েছে।

এ অঞ্চলের সব বাড়িই পাথরেব তৈবি, ছাদ কাঠের তৈরি, দরজা জানালাও কাঠেব। প্রায় সব বাড়িই দোতলা। একতলাটা গৃহপালিত পশুদেব জন্যে, দোতলায় বাড়ির লোকজন থাকে। শোবার ঘর, রান্নাঘর, মায পায়খানা পর্যন্ত ঐ দোতলাতেই, দোতলায় যাবার জন্যে ভিতর দিয়ে কাঠের সিঁড়ি আছে। আমি যখন ছোট ছিলাম, এমনকি আমার পূর্বপুরুষরাও যখন ছোট ছিলেন, তখন থেকে এখন পর্যন্ত একই রকম চলে আসছে।

অনেকেই বলেন আমার জন্ম নাকি থামেতে। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। সা-চু নামে একটা গ্রামে আমার জন্ম। সেখান থেকে মাকালু খুব কাছে, এবং এভারেস্ট মাত্র একদিনের পথ। পরবর্তী সময়ে আমার মা বাবা থামেতে এসে বসবাস করতেন, আমি সেখানেই বড় হয়েছি। সা-চু কথাটার মানে হল-'গরম জলের উৎস' এবং একে নিয়ে অনেক প্রাচীন গাথা প্রচলিত আছে। সা-চু অঞ্চলে অনেক বলবর্ধক ভেষজ জন্মায় এবং এদেব ঘিরে অনেকগুলো হ্রদ আছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বড়টা হল সোনিযা (Tsonya) যার মানে হল 'মাছ ভর্তি জলাশয়'। আর একটা আছে যার জলের রং চায়ের মত। ৭ ত আছে গৌতমবুদ্ধ ধ্যানশেষে এব জল চা ভেবে পান করতেন।

সা-চুকে কেন্দ্র করে অনেক গাথা প্রচলিত আছে। এর মধ্যে একটা হল—একবার রাজা গিয়ালবো ওয়াং এর সঙ্গে রাজা গিয়ালবো কুংএব এক ভযঙ্কব যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে আমার পূর্বপুরুষ কুংএর পক্ষে যুদ্ধ করে। তার শৌর্যে প্রীত হয়ে রাজা কুং তাঁকে এক ভূখণ্ড দান

করেন। আমার পূর্বপুরুষের সেই ভূখণ্ডের নাম ছিল ঘাংলা। সেই থেকে আমাদের গোষ্ঠী খাংলা নামে পরিচিত হয়। ঘাংলাতে একটা বৌদ্ধ মঠ আছে। মঠের কাছে গৌতমবুদ্ধের মাথার আকৃতির এক পাথর আছে. কোনও ধর্মপ্রাণ মানুষ এই পাথর স্পর্শ করে প্রার্থনা করলে সেই পাথর চুঁইয়ে জল পড়ে কিন্তু কোন অবিশ্বাসী মানুষ পাথর ছুঁলে পাথর শুকনোই থাকে। আমার ধর্মপ্রাণ মা একবার ঘাংলা মঠে তীর্থ করতে গিয়েছিলেন। আমার জন্মের সময় লামারা ভবিষ্যতবাণী করেন যে আমি খুবই ভাগ্যবান। অবশ্য যদি তিনবছর বয়সের পর বেঁচে থাকি। আমার বয়সের সঠিক কোনও হিসেব নেই. শোলো খুম্বুর কোনও শেরপা সন্তানেরই থাকে না। কারণ সেখানে তিববতী ক্যালেন্ডার ব্যবহার হয়। তাতে সালের কোনও হিসেব নেই, বছরগুলিকে পশুপাখির নাম দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। যেমন ঘোড়া, ষাঁড়, পাখি কিম্বা সাপ। ছ'বছর থাকে পুরুষ প্রাণী আর বাকি ছ'বছর স্ত্রী প্রাণীর নামে। যে বছর আমি জন্মেছিলাম সে বছরটি খরগোসের নামে চিহ্নিত ছিল। এখন ইংরেজী ক্যালেণ্ডারের সঙ্গে মেলালে সেটা ১৯০২, ১৯১৪ অথবা ১৯২৬ হয়। আমি এখন এত ছোট নই যে আমার জন্মসাল ১৯২৬ হবে আবার এত বুড়ো নই যে ভাবা যেতে পারে আমি ১৯০২ সালে জন্মেছি। কাজেই আমার জন্মসাল ১৯১৪ হওয়া উচিত. সে হিসেবে আমি যে বছর এভারেস্ট আরোহণ করি তখন আমার বয়স ছিল উনচল্লিশ। বছরের যে সময় জন্মেছিলাম সেটা চিহ্নিত করাও কঠিন নয়। আবহাওয়া এবং শস্য জন্মানোর হিসেব থেকে সেটা মে মাস বলেই মনে হয়। পরবর্তী সময় দেখা গেছে যে মে মাস আমার জন্যে সৌভাগ্যসূচক হয়েছে। ১৯৫২ সালের ২৮শে মে আমি ল্যাম্বার্টের সঙ্গে প্রায় এভারেষ্ট শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিলাম আর এর ঠিক একবছর একদিন বাদে ২৯শে মে সফল হলাম। শেরপারা জন্ম তারিখের কোনও হিসেব রাখে না। যাই হোক. তোমরা চাইলে ২৯শে মে কে আমার জন্ম তারিখ হিসেবে ভাবতে পার।

আমার মায়ের নাম কিন-জোম. বাবা খাংলা মিংমা। আমাদের শিশুর নামের সঙ্গে বাবা মায়ের নামের কোনও মিল থাকে না। সব মিলিয়ে আমরা তেরো ভাই বোন। সাত ভাই ছয় বোন। শোলো খুম্বুর জীবন বড়ই কঠিন, মৃত্যু কোনও ব্যাপার নয়। তাই এখন আমরা তিনবোন আর এক ভাই বেঁচে আছি। আমার দুই বোন তাদের স্বামীদের সঙ্গে দার্জিলিং-এ বাস করছে, ছোটটি আছে শোলো খুম্বুতে। শোলো খুম্বুর বাইরে যে জগৎ আমার বাবা মা তাকে দেখার কোনও সুযোগ পাননি। বাইরের জগৎ বলতে কাঠমাণ্ডু, রংবুক আর তিব্বত এই তাঁদের জানাশোনার গণ্ডি। আমার বাবা ১৯৪৯ সালে মারা যান। বৃদ্ধা মা ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত আমাদের গ্রাম থামেতেই ছিলেন।

ছোটবেলায় আমার নাম ছিল নামগিয়াল ওয়াংদি। আমার বাবা মা একবার আমাকে রংবুকের এক বিখ্যাত লামার কাছে নিয়ে এলেন। অনেক বইটই ঘেঁটে তিনি বললেন পূর্বজন্মে আমি একজন ধনীব্যক্তি ছিলাম। কাজেই আমার নামটা বদলাতে হবে। আমার নাম দিলেন তেনজিং নোরগে অথবা নোরকে। নোরগে কথার মানে হল ধনবান, ভাগ্যবান। আর তেনজিং অর্থাৎ 'ধর্মবিশ্বাসী'। তাহলে পুরো নামের মানে হল 'ভাগ্যবান অথবা ধনবান ধর্মবিশ্বাসী', নামটা আমার বাবা মায়ের বেশ পছন্দ হল। আমি যখন নিতান্তই ছোট তখন ঠিক করা হল আমাকে

মঠে পাঠানো হবে লামা হবার জন্যে। কাছের একটা মঠে মুণ্ডিত মস্তক লামার কাছে শিক্ষানবিশী করার জন্যে আমাকে ভরতি করা হল। তবে সেখানে বেশিদিন থাকতে হয়নি এই যা রক্ষে। একদিন কি জানি কি কারণে এক বয়স্ক লামা রেগে গিয়ে একটা কাঠের টুকরো দিয়ে আমার মাথায় সজোরে ঠুকে দিলেন। আর আমিও এক ছুটে সোজা বাড়ি। বাড়ির লোক আমায় খুব ভালবাসত। তাঁরা আমাকে আর মঠে যেতে দিল না। ভাগ্যিস এমনটা ঘটে ছিল, না হলে আমার জীবনটা কেমন হত? আমি যখন বন্ধুর কাছে আমার বাল্যের এই গল্পটা বলি তখন তারা ঠাট্টা করে বলে, 'ওঃ তাই বল? এবার বুঝলাম মাথার ঐ আঘাতেই তুমি পাহাড় পাগল হয়েছ।'

শোলো খুম্বুতে কয়েকজন মাত্র লামা আছেন যাঁরা লিখতে পড়তে জানেন কিন্তু সাধারণ মানুষদের একজনও লেখাপড়া জানে না। শেরপাদের নিজস্ব কোনও লিপি নেই, যা কিছু লেখাপড়া সব তিব্বতী ভাষায়, আর বিদ্যাচর্চার একমাত্র স্থান হল বৌদ্ধ মঠ, সেখান থেকে পালিয়ে এসে লেখাপড়া শেখার ক্ষীণ আশাটুকুও আমার শেষ হয়ে গেল। আজ খুব ছোট হলেও নামচেবাজারে ছোটদের জন্যে একটা প্রাথমিক স্কুল আছে কিন্তু আমাদের সময় বাড়ির কাজ করা আর খেলে বেড়ানো ছাড়া ছোটদের কিছুই করার ছিল না। ছোটবেলার অল্প কথাই আজ আমার মনে আছে। সামান্য যা কিছু মনে আছে তার মধ্যে একটা হল আমার এক বড় ভায়ের পিঠে উঠে ঘুরে বেড়ানো। অবশ্য অনেকদিন আগেই আমার সে বড় ভাই-এর অকালমৃত্যু হয়েছে। সবচেয়ে মজা লাগত শীতকালে বরফ পড়া শুরু হলে, ইয়াক আর অন্য জন্তুগুলি দল বেঁধে এসে নিচের ঘরে ভিড় করত, আর আমরা বাড়ির সব লোকজন গাদাগাদি করে দোতলার ঘরে বসে থাকতাম। কাঠের ধোঁয়ায় ঘর ভরে আছে, চায়ের জল ফুটছে, নাকে তার গন্ধ আসছে, সকলের মিলিত কথা বলার গুঞ্জন, সব মিলিয়ে কেমন পরিতৃপ্তির আমেজ। এতেই আমরা খুব আনন্দে থাকতাম, এর বাইরে এই জগতে যে আর কিছু আছে তা আমাদের জানা ছিল না।

ছোটদের সঙ্গে তাদের পিতামাতারা সবসময়ে ভাল ব্যবহার করত না, তাঁদের অনেককেই ছোটদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করতে দেখেছি। কিন্তু আমার বাবা আমায় খুবই স্নেহ করতেন। কখনও বা আমি আমার বড় বোন লামু কিপার সঙ্গে ইয়াকের দুধ দুইতে যেতাম। চুপ করে এক পাশে বসে তার দুধ দোয়া দেখতাম। দিদি দুধ দুয়ে টাটকা গরম দুধ খেতে দিত। আমাকে মায়ের মত ভালবাসত। পরে আমার সেই দিদি থায়াংবোচের বৌদ্ধমঠে ভিক্ষুনী হয়ে গেল। সেখানে সাত বছর ছিল। মঠে থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে ভিক্ষু নাওয়াংলার আলাপ হয়, পরে তাঁরা পরস্পরকে বিয়ে করেন। আমাদের দেশে এটা কোনও দোষের নয়। একজন ভিক্ষু এবং ভিক্ষুনী পরস্পরকে বিয়ে করতে পারেন। এখন আমার সেই ভগ্নীপতি একজন গৃহস্থ লামা। আমাদের ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী তাঁরা আর মঠে বাস করতে পারবেন না। এরপর তাঁরা বহুদিন শোলো খুম্বুতে বাস করার পর ১৯৫৩ সালে এভারেস্ট অভিযানের পর আমার সঙ্গে দার্জিলিং-এ এসে বসবাস শুরু করেন। আমার ঐ দিদির ছেলে গম্বু ১৯৫৩ সালের এভারেস্ট অভিযানে একজন মালবাহকের কাজ করে এবং দুবার সাউথ কল্ পর্যন্ত মাল নিয়ে উঠেছিল। যদিও সে তখন মাত্র কুড়ি বছরের যুবক তবু তার দক্ষতা ছিল সকল শেরপার চেয়ে ভাল।

ছোটবেলায় উত্তরদিকের ঐ উঁচু পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতাম অবাক দৃষ্টিতে। তখন ওখানে এভারেস্ট নামের কোনও পাহাড়ের কথা জানতাম না। যার নাম জানতাম সে হল চোমোলোংমা। যার মানে হল জগদ্ধাত্রী কিম্বা হাওয়ার দেবী। সকল শেরপা শিশুকেই তার মা ঐ উঁচু পাহড়টা দেখিয়ে বলত, ঐ দেখ সেই পাহাড় কোনও পাখি ওটাকে টপকাতে পারবে না।

সকল শিশুই তার ছোট্ট পরিচিত জগতটা নিয়ে আনন্দেই থাকে। আমারও তাই ছিল। বাবা, মা, দাদা, দিদি, আমাদের বাড়ি, আমাদের গ্রাম, আর ইয়াক চরাবার মাঠ। পূর্ব, পশ্চিম আর উত্তরে মাথা তুলে থাকা উঁচু উঁচু পাহাড়। দক্ষিণে বয়ে চলেছে দুধকোশী নদী, আমাদের গ্রাম ছেড়ে কিছুটা গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে উধাও হয়ে গেছে। ব্যাস! এই আমার জগৎ। একটু বড় হয়ে এই পৃথিবীর আরও কিছু কিছু কথা শুনলাম, তিব্বত আর তার পবিত্র শহর লাসার কথা জানলাম। আমার বাবা মায়ের কাছে বহুবার লাসার কথা শুনেছি। ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ হিসেবে লাসায় তীর্থ করতে যাবার বড়ই সাধ ছিল তাঁদের। কিন্তু সে বড় খরচসাপেক্ষ ব্যাপার। আর পাঁচটা বালকের সঙ্গে আমার অনেক তফাৎ ছিল। আমি ছিলাম বড়ই লাজুক, একা একা থাকতে পছন্দ করতাম। অন্যরা যখন নিজেদেব মধ্যে খেলা করছে, কাদা ছোঁড়াছুড়ি করছে আমি তখন এক কোণায় চুপ করে বসে থাকতাম, আপন মনে কত কি না কল্পনা করতাম। ভাবতাম লাসায় কোনও বিখ্যাত লোককে চিঠি লিখছি, আর আমার চিঠি পেয়ে তিনি আমায় নিতে এসেছেন। কখনও কল্পনা করতাম আমি একটা সৈন্যদলের সেনাপতি। ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধে যাচ্ছি কিম্বা দূর কোনও দেশে বেড়াতে যাচ্ছি। একটা ঘোড়া কিনে দেবার জন্যে বাবাকে প্রায়ই বিরক্ত করতাম আর আমার কথা শুনে বাবা খুব হাসত। সেই বাল্যকাল থেকেই ঘুরে বেড়াবার স্বপ্ন দেখতাম। জানিনা হয়ত বা শৈশব থেকে চলার এই অনন্ত তৃষ্ণাই আমাকে কোনও দিনও ঘরে থাকতে দিল না।

বহু বছর আগে থেকেই শেরপারা জঙ্গল পেরিয়ে দার্জিলিং চলে যেত কাজের আশায়। সেখানে তারা চা বাগানে কাজ করত, মোট বইত, কুলীর কাজ করত কেউ বা আবার রিক্সাও টানত। তারপর যখন ফিরত তখন নতুন দেশ সম্বন্ধে অনেক মজার মজার গল্প করত। এর মধ্যে শেরপাদের জীবনে একটা নতুনত্ব এল। ডঃ কেলাস্ নামে একজন ইংরেজ দার্জিলিং থেকে কয়েকজন শেরপাকে নিয়ে পর্বত অভিযানে গেলেন, এর কয়েক বছর বাদে জেনারেল ব্রুশ তাদের নিয়ে আর একটা অভিযানে গেলেন। হিসেব করে ঠিক সময়টা বলা সম্ভব নয় তবে এর পর থেকেই শেরপারা পর্বত অভিযান শুরু করল।

১৯২১, ১৯২২ এবং ১৯২৪ সালে তিনটে বড় মাপের এভারেস্ট অভিযান হল। সেই অভিযানে দার্জিলিং এবং শোলো খুম্বুর অনেক শেরপা অংশ নিয়েছিল, তারা ফিরে এসে অনেক দূর দেশের মানুষ বা 'চিলিনাঙ্গা'দের (অনেক দূর দেশ থেকে আসা মানুষদের আমরা ওই নামে ডাকতাম) সম্বন্ধে ভারি মজার মজার সব গল্প শোনাল, তাদের সঙ্গে অনেক উঁচু পাহাড়ে ওঠার কথা বলল। তাদের দেওয়া অদ্ভুত পোশাক আর জুতোগুলো দেখাল। এই সব কথা শুনে আর অদ্ভুত পোশাক দেখে আমি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলাম, তাদের কাছে একটা নতুন পর্বতের নাম শুনলাম, এভারেস্ট। আমি সবাইকে জিজ্ঞেস করলাম এভারেস্ট কি? ওরা বলল, আমাদের চোমোলোংমাই ওদের এভারেস্ট। তফাৎ শুধু এই যে ওরা

এটাকে তিব্বতের দিক থেকে চড়তে চেয়েছে, এবং আরও বলেছে যে এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড়। আমি বিস্ময় আর শ্রদ্ধা নিয়ে নতুন চোখে তাকালাম আমার শৈশবের সেই পর্বতচূড়ার দিকে 'কোনও পাখি যাকে অতিক্রম করতে পারবে না'।

১৯২২ এর অভিযানে সাতজন শেরপা তুষার ধসে প্রাণ হারাল। সেই প্রথম। আমাদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এল। ১৯২৪ সালে সেই দুঃখ কাটিয়ে আরও বেশি সংখ্যায় শেরপারা অভিযানে অংশ নিল। এবং এই সেই সাল যে বছর শীর্ষের খুব কাছ থেকে ম্যালোরী আর আরভিন নিখোঁজ হল। সেই কবে তাঁদের হারিয়ে যাবার কথা শুনেছি—আজও ভুলিনি। তার ঊনত্রিশ বছর বাদে এভারেস্ট শীর্ষে পৌঁছে পাঁতিপাতি করে খুঁজেছিলাম যদি তাদের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়। আমাদের বাড়ির কেউই এই সব অভিযানে অংশ নেয়নি, অভিযানে যাবার জন্যে আমার মন ছটফট করত, কিন্তু আমি তখন বড়ই ছোট। তারপর মাঝে অনেকগুলো বছর আর তেমন কোনও অভিযানের কথা শোনা গেল না, শোলো খুম্বুর জীবন আবার আগের মতই নিস্তরঙ্গ হয়ে এল। আমি বড় হচ্ছি। এখন বাড়ির কাজে বাবা আর দাদাদের সাহায্য করি। আলু আর বার্লি চাষে হাত লাগাই, ইয়াক চরাই, ভেড়া চরাই। ইয়াক আর ভেড়ার দুধ হয়, তার থেকে মাখন বানাই। উল দিয়ে গরমের পোশাক বুনি। বাইরের দুনিয়া থেকে নুন ছাড়া কিছুই কিনতে হয় না। মাঝে মধ্যে তিব্বত থেকে আসা শুকনো মাংস কিনি। নেপালে হিন্দু এবং বৌদ্ধদের মধ্যে প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ। অবশ্য মাঝে মধ্যে ইয়াকের গলার কাছে কোনও সূচালো জিনিষ ফুটিয়ে রক্ত বের করে নিই। অন্য খাদ্যবস্তুর সঙ্গে মিশিয়ে খাই, বলবর্দ্ধক। রক্ত বের করে নিলে যে শুধুমাত্র আমাদের উপকার হয় এমন নয় এতে ইয়াকগুলোকেও শান্ত রাখা যায়। গ্রীষ্মকালে প্রচুর খাওয়াদাওয়া করে এগুলো অসম্ভব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। শরৎকালে কিছু রক্ত বের করে নিলে ওগুলো ছোটাছুটি একটু কমিয়ে দেয়।

আগে আমরা খুব গরিব ছিলাম। আমার জন্মের পর থেকে আমাদের ভাগ্য ফিরেছে আর সেই অর্থে আমি একজন ভাগ্যবান শিশু। আমাদের ছোট্ট বাড়িটাতে অনেক লোকের ভিড়, আর এই বাড়িতে সবার মাঝে পরম আনন্দে দিন কাটত আমার। আমাকে কোনওদিন ক্ষিদের জ্বালা সইতে হয়নি। শোলো খুম্বুর জীবন ছিল খুবই সাধারণ, সেখানে প্রয়োজন অতি সামান্য। ইয়াকের চামড়া আর লোম থেকে আমাদের শীতের পোশাক তৈরি হয়। আমরা সব সময়ই মৃত ইয়াকের চামড়া ব্যবহার করতাম। ঠান্ডার দেশ তাই সব সময় জুতো পরে থাকতে হয়। আমাদের জুতো তিব্বতীদের মত চামড়া আর বেল্টের, উঁচু হিল। নেপাল এবং ভারতের মানুষ খালি পায়ে চলতে অভ্যস্ত। কিন্তু জুতো ছাড়া আমাদের চলবে না।

ছোটবেলায় ইয়াক চরাতে আমার খুব ভাল লাগত। ইয়াকগুলোকে ছেড়ে দিয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বহুদূর পর্যন্ত হেঁটে যেতাম। শীতকালে ঠান্ডা আর বরফের জন্যে খুব বেশিদূর যাওয়া শক্ত। কিন্তু গ্রীষ্মকালে খুব মজা হত। কচি নরম ঘাসে পা ডুবিয়ে হাঁটা ঠিক যেমনটি দেখেছি এই কয়েক বছর আগে সুইজারল্যান্ডে। হাঁটতে হাঁটতে অনেক উঁচুতে হিমবাহের কাছাকাছি পৌঁছে যেতাম। এখানে ইয়াকের প্রিয় কচি ঘাস জন্মায়। শুনেছি এই অঞ্চলেই ইয়েতি বা তুষার মানবের দেখা মেলে। আমাদের দেশে লোকের মুখে মুখে ইয়েতির কথা শোনা যায়। আমি শৈশব থেকেই এর কথা শুনেছি কিন্তু আজ পর্যন্ত ইয়েতি দেখিনি। আমার

জন্মের আগে আমার বাবা একবার ইয়েতির সামনে পড়ে গিয়েছিল। আমি আমার তিরিশ বছর বয়সে এদের পায়ের ছাপ দেখেছি। অবশ্য ছোটবেলায় ইয়াক চরাবার সময় এক অদ্ভুত জন্তুর পায়খানায় মরা ইঁদুর আব পোকামাকড় দেখেছি। মনে হয় এটা ইয়েতির পায়খানা। বাল্যকাল থেকেই ইয়েতির সম্বন্ধে আমার মনে ভয় ছিল কিন্তু তার চেয়েও বেশি ছিল কৌতূহল।

বিশাল শান্ত সুউচ্চ পবর্বতশীর্ষ সম্বন্ধে আমার একটা ভয় মেশানো কৌতূহল ছিল। তুষার রাজ্যের ঐ অজানা স্থান সম্বন্ধে লামাদের কাছে অনেক ভয়ঙ্কর গল্প শুনেছি। পাহাড়ের দেবতা আর অপদেবতা, ইয়েতি আর অদ্ভুত দর্শন সব ক্ষতিকর জন্তু জানোয়ার — এই ছিল সেইসব কাহিনীর উপাদান। এসব সত্ত্বেও অনেক শেরপা সেই সব পাহাড়ে অভিযানে গিয়েছে এবং তাদের মধ্যে যদিও কেউ কেউ প্রাণ হারিয়েছে তবু অনেকেই বেঁচে আছে আজও। আমিও স্বপ্ন দেখতাম ঐ সব পাহাড়ে অভিযানে যাবার। আমার চোখের সামনে মাকালু, লোৎসে, নুপৎসে, আমাদাবলাম, গৌরীশঙ্কর, চোওয়ু আর সবার সেরা চোমোলোংমা। আমার মত যে দিনরাত ঐখানে যাবার স্বপ্ন দেখে সে এই দুনিয়ার কি কাজেই বা লাগতে পারে'

ছোট্ট জায়গা শোলো খুম্বুতে থাকতে থাকতে একদিন ঠিক করলাম পালিয়ে যাব। আমার যখন তের বছর বয়স তখন বাড়ি থেকে পালালাম একদম একা, তবে দার্জিলিং যাবার জন্যে নয়, আমার লক্ষ্য কাঠমাণ্ডু। পরে রাস্তায় দু একজন সঙ্গী জুটে গেল। আমার দিদি লামু কিপা আমাকে সব সময় বলত যে আমি বাবা মায়ের বড়ই প্রিয় সন্তান, কখনই তাঁদের মনে কষ্ট দেওয়া আমার উচিত নয়। কিন্তু বাইরেব দুনিয়ার তীব্র হাতছানি আমায় ঘর ছাড়া কবল। মাকে লুকিয়ে ঘর ছাড়ার জন্যে মনে খুব কষ্ট পেলাম। এ যাত্রায় ঘুরপথে কাঠমাণ্ডু যেতে টানা দু'সপ্তাহ লাগল। কাঠমাণ্ডু বড় তাজ্জব আর অদ্ভুত শহর, এখানে সবাই হিন্দু, লোকের ভিড়, ব্যস্ত বাজার, বড় বড় মন্দিব। টানা পনের দিন রাস্তায় রাস্তায় টো টো করে ঘুরলাম। অবশেষে অনেক খুঁজে একটা বৌদ্ধমঠে আশ্রয় পেলাম।

মধ্য এবং পশ্চিম নেপালে বাস করে গোর্খা নেপালীরা। এরা বিখ্যাত যোদ্ধা জাতি। কাঠমাণ্ডুর রাস্তায় তাদের কুচকাওয়াজ আর যুদ্ধের বাজনা আমায় মুগ্ধ করেছিল। লোকজনকে মোঙ্গলদের মত দেখতে নয়, তাদের পোশাক বিচিত্র। খুব মজায় ছিলাম সেখানে। কিন্তু বাড়ির জন্য মন কেমন কবতে শুরু করল। কয়েকজন লোক কাজ কর্ম শেষ করে শোলো খুম্বু ফিরছে। তাদের পেছনে হাঁটা দিলাম। ফেরার রাস্তা অনেক ছোট। অনেক বছর পর বৃটিশ আর সুইসদের সঙ্গে এই পথে এভারেস্ট অভিযানে গিয়েছি। ছ'সপ্তাহ পরে ঘরে ফিরলাম, আমাকে ফিরে পেয়ে আমার বাবা মা খুব খুশি। এরপর টানা পাঁচ বছর শান্ত ছেলের মত বাড়িতে থাকলাম। তারপর ১৯৩২ সালে যখন আমাব বয়স আঠার বছর তখন আবার ঘর ছাড়লাম। এবার লক্ষ্য দার্জিলিং। এবারেও বাড়িতে না বলে এসেছি। শোনা যাচ্ছে ১৯৩৩ সালে এভারেস্টে একটা অভিযান হবে, যেভাবেই হোক আমায় সেই দলে সুযোগ পেতে হবে। বাবা মায়ের জন্যে মন ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। আমার মা বড়ই দয়ালু আর ধর্মপ্রাণ, তিনি জীবনে কোনও ভাল পোশাক পরেন নি ভাল খাবার খাননি, বরং সব সময়েই তা মঠের ভিক্ষু আর ভিক্ষুণীদেব দিয়ে দিতেন। সদা স্নেহময়, দয়ালু আমার মা, আজ আমি যা হয়েছি সবই তাঁর আশীর্বাদে।

এক নতুন জগৎ

আমার জীবন তিনটে ভাগে বিভক্ত, শৈশব আর বাল্য কেটেছে শোলো খুম্বুতে ইয়াক চরিয়ে। বাল্য থেকে যৌবনের কুড়িটা বছর পর্বতারোহণে মাল বাহকের কাজ করে আর তৃতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে যেদিন এভারেস্ট শীর্ষ থেকে নেমে এলাম সেদিন থেকে—জানিনা শেষ কেমন করে হবে।

আমার জীবনের দ্বিতীয় পর্বের শুরু আঠার বছর বয়সে। ১৯৩২ সালে আমি বাড়ি ছেড়েছিলাম। আমরা বার জন ছেলে মেয়ে অনেকদিন ধরেই বাড়ি থেকে পালাবার মতলব আঁটছিলাম। এখানে আমাদের কোনওকিছুর অভাব নেই শুধু টাকা পয়সা ছাড়া, আর এই টাকা পয়সা রোজগারের ধান্ধাতেই আমাদের বাড়ি থেকে পালানো। আমরা রাস্তার একটা গোপন স্থানে জমায়েত হয়ে রোজই শলাপরামর্শ করতাম। যে যার বাড়ি থেকে খাবার দাবার, কম্বল, টুকিটাকি প্রয়োজনীয় জিনিস সাধ্যমত জোগাড় করলাম। কিন্তু কেউই টাকা পয়সা বিশেষ জোগাড় করতে পারিনি।

সেইসময় আমরা যারা ঘর ছেড়েছিলাম দাওয়া থোন্ডুপ তাদের মধ্যে একজন। আজ সে একজন খুব নামকরা শেরপা। সে বয়সে আমার চেয়ে কিছু বড়। কিন্তু সেও এর আগে দার্জিলিং আসে নি, তবে আমাদের সকলের চেয়ে দার্জিলিং সম্বন্ধে অনেক বেশি খবর রাখত। তার কাছেই আমরা প্রথম জানতে পারি যে ১৯৩৩ সালে এভারেস্ট অভিযান হবে আর সেখানে মালবাহকের কাজ পেতে অসুবিধে হবে না। শুনে থেকে আমার মধ্যে দারুণ উত্তেজনা, মনে হচ্ছে এখান থেকে দৌড়ে দার্জিলিং চলে যাই। কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়—উঁচুনিচু রাস্তা, খরস্রোতা নদী, গভীর জঙ্গল, গিরিখাত, কঠিন বাঁক এসব অতিক্রম করা বড়ই কষ্টসাধ্য। পুরো রাস্তাটা আমরা একসাথে এলাম কিন্তু ভারত নেপাল সীমান্তের কাছে এসে ছিটকে গেলাম। এখন আমি একদম একা, তবু ভাগ্য ভাল যে সীমান্তে একজন ভাললোকের আশ্রয় পেলাম— রিঙ্গা লামা। শেরপা ছাড়া কোনও ভাষা আমার জানা ছিল না, রিঙ্গা লামা একটু-আধটু শেরপা ভাষা বলতে পারতেন। তাঁর বাড়ির লোকজন আমাকে খুব স্নেহ করতেন, তাঁরা আমাকে নেপালী পোশাক দিলেন, থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। পরিবর্তে আমি তাঁর বাড়ির কাজ করতাম, কাঠ কেটে আনতাম. আমার মন সব সময়েই খারাপ হয়ে থাকে। নিজের স্বদেশী লোকেদের ছেড়ে বড় অসহায় মনে হয়। জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে মাঝে মাঝে গাছের তলায় বসে একা একা কাঁদতাম, ক্রমে আমি বুঝতে পারছি বাস্তব আর কল্পনা এক জিনিষ নয়। একদিন থাকতে না পেরে রিঙ্গা লামাকে দার্জিলিং-এ আমার স্বদেশীয়দের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে অনুরোধ করলাম।

আমার মনের কথা বুঝতে পেরে তিনি বললেন "ও, এই কথা। ঠিক আছে কয়েকদিনের মধ্যে আমি দার্জিলিং যাব তোমাকে অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে যাব।" অবশেষে দার্জিলিং-এর উদ্দেশ্যে চলেছি। সীমান্ত থেকে মোটর গাড়িতে দার্জিলিং গেলাম, এর আগে আমি কখনও মোটর গাড়ি চড়িনি। সেখানে পৌঁছে শহর আর দোকানপাট দেখে মোহিত হয়ে গেলাম। যদিও এ শহর কাঠমাণ্ডুর মত বড় নয় তবে আধুনিক। রেলগাড়ি রয়েছে আর রয়েছে বিদেশী ইংরেজ। আমি এই প্রথম ইংরেজ দেখলাম। প্রথম দার্জিলিং-এ এসে আমি শহর থেকে একটু

দূরে বিঙ্গা লামার খুড়তুতো ভাই পৌবীর কাছে আলুবাড়িতে থাকতাম। আলুবাড়িতে প্রচুর আলু জন্মায়। এখানে আমার এক বন্ধু জুটল। তার নাম মানবাহাদুর তামাং। সে আমাকে নেপালী আর ইয়ালমো ভাষা শেখাত, তার কাজ ছিল গরুর জন্যে ঘাস কাটা। আজও মানবাহাদুরের সঙ্গে আমার আগের মতই বন্ধুত্ব আছে। সে এখন আমার বাড়ি তৈরিতে রাজমিস্ত্রীর কাজ করছে। সময় পেলে আমরা দুজন পুরনো দিনের গল্প করি। স্মৃতি চারণ করতে গিয়ে আমরা হেসে গড়িয়ে পড়ি। কাঠ কাটতে গিয়ে বনকর্মীদের হাতে ধরা পড়ার গল্প, তারা আমাদের গাছের সঙ্গে বেঁধে কি মারটাই না দিয়েছিল।

দুধ নিয়ে মাঝে মাঝে দার্জিলিং এ বিক্রি করতে যেতাম আর আমি ঠিক এটাই চাই। শহরটা একটা পাহাড়ের ধারে উত্তরমুখো হয়ে গড়ে উঠেছে। এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে সিকিমের উপত্যকা পার হয়ে পূর্ব হিমালয় দেখা যায়, এদের মধ্যমণি কাঞ্চনজঙ্ঘা। মুগ্ধ হয়ে ঐ পর্বতশ্রেণীর দিকে তাকিয়ে থাকি। আমি অন্তর দিয়ে যাদের ভালবাসি তারা আমাকে ছেড়ে যায়নি, এখানেও আছে। এছাড়া অজ গাঁয়ের একটা ছেলের কাছে আধুনিক শহর দার্জিলিং আর তার ঐশ্বর্যের আকর্ষণ কিছু কম নয়, শহরের যা কিছু নতুন ঝকঝকে সবই উপরের দিকে, নিচের দিকটা নেপালী বস্তি বাজার এলাকা। শহরের ওপর দিকে সুন্দর পরিচ্ছন্ন বাড়ীগুলিতে সাহেবরা থাকে। ধনী ভারতীয়রাও থাকে। এখানেই সব সুন্দর সুন্দর দোকান, সিনেমা হল সরকারি বাড়ি মহারাজার বাড়ি আর একটা বিরাট হোটেল। এই সব দেখতে দেখতে দুধ বিক্রির কথা ভুলে যেতাম। এর মধ্যে খবর পাওয়া গেল ১৯৩৩ সালে এভারেস্ট অভিযান হবে শুনে থেকে আমি মনে মনে উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। যে ভাবেই হোক দলে সুযোগ পেতে হবে। বছরের গোড়ার দিকে অভিযাত্রীদল ইংল্যাণ্ড থেকে দার্জিলিংএ আসতে শুরু করল। দলের নেতা হিউ রাটলেজ প্ল্যান্টার্স ক্লাবের বারান্দায় তাঁর অফিস খুললেন। কাজের জন্যে শেরপারা তাঁর সঙ্গে ভিড় করেছে। দুধ বিক্রি মাথায় উঠল, একটাই চিন্তা কি করে সুযোগ পাব। ভয় হল এত ছোট বলে যদি সুযোগ না দেয় তাই বন্ধু দাওয়া থোড়্পকে ধরলাম। থোড়্প এর মধ্যেই কাজ জুটিয়ে নিয়েছে। ওকে বললাম সাহেবকে আমার কথা বলতে। সব শুনে থোড়্প বলে, দেখ তুই খুবই ছোট তোর পক্ষে একাজ কঠিন হবে। আমি তর্ক জুড়লাম। তুমি একবার বলেই দেখনা আমি ঠিক পারব। কিন্তু অন্য শেরপারা থোড়্পকে সমর্থন করল। আমি দারুণ রেগে গেলাম। জীবনে এর আগে আমি এত রাগিনি। এরপর আমি একাই কাজ জোগাড় করার চেষ্টা করলাম কিন্তু সব যেন কেমন উল্টোপাল্টা হয়ে গেল। শোলো খুম্বুর সবাই বিনুনি করে চুল রাখে। দার্জিলিং এসে আমি প্রথমেই বিনুনী কেটে ফেলেছিলাম, এখানে মেয়েরা ছাড়া কেউই বিনুনী করে না। আমার পোশাক ছিল নেপালীদের মত যেটা বিঙ্গা লামা আমাকে দিয়েছিল। তাই সাহেবরা আমাকে নেপালী বলে ভুল করল, তারা পাহাড়ে শুধু শেরপাদেরই নিতে চায়। এছাড়া আমার পাহাড়ে চড়ার কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। আমার মনে হয় সকল ভবিষ্যৎ কর্মপ্রার্থীরই এমন তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়। অভিযানে ওরা আমাকে সঙ্গে নিল না। নির্দিষ্ট দিনে অভিযাত্রী দল দার্জিলিং থেকে রওনা হল আমি হতাশ হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

দার্জিলিং এ একটা বাড়িতে দুধ বেচতে যেতাম সেখানে একটা শেরপাদের মেয়ে আমার কাজ

করত। আমি কোনওদিন তার সঙ্গে শেরপা ভাষায় কথা বলতাম না। আর সেও কোনওদিন বুঝতে পারেনি যে আমি শেরপা। দুধ বেচা নিয়ে আমার সঙ্গে তার প্রায়ই ঝগড়া হত। দুধের মাপ নিয়ে সে প্রায়ই সন্দেহ প্রকাশ করত আর বলত, "দুধ যদি বেচতে চাও তবে ঠিক ঠাক মাপ দিতে হবে বাপু।" আমি বলতাম, "ঠিকই মাপ দিয়েছি। আমার কাছে বেশি আদায় করার মতলব ছাড়।" সে গাল দিত, "জোচ্চোর, বাজে লোক।" আমিও রেগে বলতাম বড্ড, "ছিটকেল মেয়ে তুমি।" এখানে এই সামান্য ঘটনাটা নিশ্চয়ই বলার কথা নয়, আমি বলতামও না, যদি না ঐ মেয়েটি আং লামু হত, হ্যাঁ পরবর্তী সময়ে ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল।

আমি দার্জিলিং-এ এসেছি এক বছর হয়ে গেছে। দেশ থেকে যারা আসে তাদের কাছে শুনতাম বাবা মা ধরে নিয়েছে আমি মারা গেছি। ঠিক করলাম ফিরে যাব, কিন্তু গৌরী রাজী হল না। তার একটাই কথা, যেতে হয় যাও তার আগে কাজের একজন লোক ঠিক করে দিয়ে যাও। অবশেষে অনেক খুঁজে একজন কাজের লোক ঠিক করে দিলাম। তারপর গৌরী আর কিছু বলার আগেই দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

বাড়ি ফিরে দেখলাম দার্জিলিং এ যা শুনেছি সেটাই ঠিক। আমি মরে গিয়েছি ধরে নিয়ে আমার বাড়ির লোকজন আমার পারলৌকিক ক্রিয়ার ব্যবস্থা করেছে। আমায় দেখে আমার বাবা মা কাঁদতে শুরু করলেন। একটু শান্ত হয়ে তাঁরা আমায় জড়িয়ে ধরে আদর করলেন এবং এবার আর বাড়ি থেকে পালানোর জন্যে আমাকে মার খেতে হয়নি। গতবছর আমি যখন ছিলাম না তখন দেশে এক ভূমিকম্প হয় যাতে আমাদের বাড়ির একটা অংশ ভেঙ্গে পড়েছে। দেশে ফিরে আমার প্রথম কাজ হল বাড়িটা নতুন করে গড়ে তোলা। এছাড়া আমি চাষের কাজেও মন দিলাম। কিছুদিন বাড়িতে থাকার পর আমি নাঙ্‌পা লা অতিক্রম করে তিব্বতের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম নুন কেনার জন্যে। আমাদের দেশে নুনের খুব অভাব। গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে রংবুকের কাছে খিনগ্রি গাম্সার নামে একটা জায়গায় পৌঁছলাম। রংবুকের মঠ আমাদের থায়াংবোচের চেয়ে অনেক বড়। এখানে পাঁচশর মত ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর থাকার ব্যবস্থা আছে। এই রংবুক এলাকা থেকেই এভারেস্ট অভিযান শুরু হয়। সেটা ১৯৩৪ সাল—কোনও অভিযানের ব্যবস্থা ছিল না, থাকলে আমার নুন কেনার কি হত কে জানে।

ফিরে আসার কয়েক মাস পরে বাবা আমাকে আবার তিব্বত পাঠালেন কি একটা কাজে। সেটা শরৎকাল। এই কয় মাসেই আমি বুঝে গেছি শোলো খুম্বুর একঘেয়ে নিস্তরঙ্গ জীবন আমার জন্যে নয়, বাইরের দুনিয়া আমাকে হাতছানি দিচ্ছে। আবার পালালাম—তিব্বতের বদলে দার্জিলিংএর দিকে পা বাড়ালাম। এরপর বাবার সঙ্গে আর মাত্র দুবার দেখা হয়েছে। ১৯৩৫ এবং ১৯৩৮ এর এভারেস্ট অভিযানে আমার রংবুকে থাকাকালীন তিনি নাঙ্‌পা লা অতিক্রম করে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। কিন্তু ১৯৫২ সালের আগে আমার মায়ের সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি, সেবারে আমি সুইসদের সঙ্গে শোলো খুম্বু হয়ে দক্ষিণ দিক দিয়ে এভারেস্ট অভিযানে গিয়েছিলাম।

এবার দার্জিলিং এসে গরু চরানো কিম্বা আলুচাষের জন্যে আলুবাড়িতে গেলাম না। দার্জিলিংএর দুটো এলাকাতে সাধারণত শেরপারা বাস করে। একটা হল টুংসুং বস্তি অন্যটা ভুটিয়া বস্তি। আমি টুংসুংএ বাস করতে লাগলাম। আমার ভাগ্য ভাল যে আং থার্কের

বাড়িতে জায়গা পেলাম। অভিজ্ঞ পর্বতারোহী হিসেবে সে তখনই প্রতিষ্ঠিত, আর আজ তো সে একজন বিখ্যাত শেরপারা। পাশেই থাকে পুরনো বন্ধু দাওয়া থোন্ডুপ এবং অন্যান্য বিখ্যাত শেরপারা যারা এরই মধ্যে এভারেস্ট অভিযানে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। এখন দার্জিলিং এর শেরপাদের মধ্যে একটাই বিষাদময় অভিজ্ঞতা আলোচিত হচ্ছে, আর তা হল ১৯৩৪ এর নাঙ্গা পর্বতের ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। সেই প্রথম শেরপারা সুদূর কাশ্মীরে একটা অভিযানে অংশগ্রহণ করল। ঐ অভিযানের অনেক উঁচুতে এক মারাত্মক তুষার ঝড়ে ছ'জন শেরপা আর চারজন জার্মান প্রাণ হারাল। টুংসুং বস্তির ঘরে ঘরে নেমে এল শোকের ছায়া সবাই বিষাদ ক্লিষ্ট।

পাশাপাশি আমরা সবাই এক অদ্ভুত তৃপ্তি অনুভব করছি, আমরা গর্বিত যে ঐ অভিযানে আমাদের জাত ভায়েরা বীরের মৃত্যু বরণ করেছে। ঐ অভিযানের দুজন জীবিত শেরপা দাওয়া থোন্ডুপ আর আং শেরিং এর মুখ থেকে আমরা সে বীরত্বের কাহিনী শুনেছিলাম।

অভিযানের শেরপা গেলি—যাকে আমরা গেলে বলে ডাকতাম সে এবং অভিযানের নেতা উইলি মার্ক ওপরের শিবিরে থাকার সময় উইলি মার্ক অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় গেলি মার্ককে নিয়ে নামতে শুরু করে। কিন্তু কিছুটা নেমে আসার পর মার্কের চলার ক্ষমতাও হারিয়ে যায়। ইচ্ছা করলে তাকে ওখানেই রেখে দিয়ে গেলি একা নেমে আসতে পারত কিন্তু সে তা করেনি, বরঞ্চ তাঁবু খাটিয়ে মার্ককে নিয়ে সেখানেই থেকে গেল তার সুস্থ হবার অপেক্ষায়। পরিণামে তাকেও উইলি মার্কের সঙ্গে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হয়েছিল।

বছরের এই সময়টা অভিযানের কোনও খবর নেই। ভূমিকম্পে দার্জিলিং-এর কিছু ক্ষতি হয়েছে। আমি সেন্ট পলস্ স্কুল মেরামতির কাজে জোগাড়ের কাজ পেলাম। মজুরী প্রতিদিন বার আনা। মজুরীটা একটু কম, তবু আমার পক্ষে তাই যথেষ্ট। যখন কোনও পর্বত অভিযান থাকে না তখন শেরপারা কোনও না কোনও কাজ জোগাড় করে নেয় রুটি রুজীর জন্যে। আমাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক ছোট খাট ব্যবসা করে তবে বেশির ভাগই গরিব। টুংসুং বস্তিতে কাঠের বাড়ি, টিনের চাল, একটা মাত্র ঘরে গাদাগাদি করে থাকা, খাদ্য বলতে আলু আর ভাত। আমাদের নিজের বলতে বিশেষ কিছুই নেই, রোজগারও সামান্য, দিন আনি দিন খাই—তাই বলে আমাদের দুঃখ নেই, কারণ আমাদের চাহিদাও কম।

এর মধ্যে ১৯৩৫ সালে আমার বিয়ে হল, বউয়ের নাম দাওয়া ফুটি। ফুটি কথার মানে সৌভাগ্যবতী সন্তানবতী, সেও শোলো খুম্বুর মেয়ে। টুংসুং-এর ছোট্ট ঘরটিতে আমাদের পরম আনন্দে কাটছে। তারপর একদিন বহু প্রতীক্ষার পর আমার জীবনে প্রথম অভিযানে যাবার সুযোগ এল।

দুবার এভারেস্ট অভিযান

সকলেই বলে প্রথমে ছোট কিছু দিয়ে শুরু করে পরে বড় ভাবনা ভাবতে হয়। আমার ক্ষেত্রে এর উল্টোটাই ঘটেছিল। ১৯৩৫ সালের বৃটিশ এভারেস্ট দলে আমি প্রথম পর্বতাভিযানে যাবার সুযোগ পেলাম। এটা ছিল বৃটিশদের পঞ্চম বড় মাপের এভারেস্ট অভিযান। ১৯২১ সালে তারা শীর্ষারোহণ এবং অনুসন্ধান এই দ্বিবিধ লক্ষ্য নিয়ে প্রথম এভারেস্ট অভিযান করে। সেটা হয়েছিল তিব্বতের দিক থেকে। আমরা যারা দার্জিলিং থেকে শোলো খুম্বুর রাস্তা জানি তাদের কাছে এই ব্যাপারটা একটু বিস্ময়কর লেগেছিল। মনে হয়েছিল এরকম একটা ছোট রাস্তা থাকতে কেন তিব্বতের দিক থেকে যাওয়া হল? আসলে এই কিছুদিন আগে পর্যন্তও ইউরোপীয়দের নেপালে প্রবেশের অনুমতি ছিল না।

১৯২১এর অভিযাত্রী দল রংবুক হিমবাহ ধরে আরোহণের প্রচেষ্টা শুরু করে এবং বহু চেষ্টার পর পূর্ব রংবুক হিমবাহের মধ্যে দিয়ে একটা রাস্তা খুঁজে পায়। এরপর বরফের একটি কঠিন দেওয়াল বেয়ে গিরিশিরার ওপরে ঘোড়ার পিঠের আকৃতির অপেক্ষাকৃত নিচু একটা জায়গায় পৌঁছয়।

বাইশ হাজার ফুট উচ্চতায় এই স্থান নর্থ কল বা উত্তর গিরিবর্ত্ম। সেবার অভিযাত্রী জি.এল. ম্যালরী আরও কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে এই পর্যন্ত এসে ফিরে যান উপযুক্ত সরঞ্জামের অভাবে, তবে একটা ব্যাপারে তাঁরা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন যে এই পথ দিয়ে শীর্ষে পৌঁছনো সম্ভব। এরপর তাঁরা ঐ অভিযানেই লোলা গিরিবর্ত্ম পর্যন্ত উঠেছিলেন, তাঁরা দেখলেন এখান থেকে এভারেস্টের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে শোলো খুম্বু পর্যন্ত পথ আছে। তাঁদের পক্ষে পথটা সহজ মনে হয়নি। তাছাড়া নেপাল এ ধরনের অভিযানের অনুমতি দেবে না।

১৯২২ এর অভিযানে বহু ইংরেজ এবং শেরপা অংশ গ্রহণ করে। এই অভিযানের তিনটে শিবির স্থাপন করে তারা এভারেস্টের সাতাশ হাজার ফুট পর্যন্ত উঠে আসে। এবার নর্থকলের পরেও কঠিন শৈলশিরার একস্থানে তারা শেষ শিবির স্থাপন করেছিল। ব্যর্থ অভিযান শেষে শৈলশিরার ঢাল দিয়ে নামার সময় আকস্মিক এক সমুদ্র প্রমাণ তুষার ধসে সাতজন শেরপার সমাধি হয়ে গেল। এরপর আবার তারা ১৯২৪ সালে এভারেস্ট আরোহণের প্রচেষ্টা চালায়। এবারে তারা উত্তর গিরিবর্ত্ম বা নর্থকলের ওপরে আরও দুটো শিবির স্থাপন করে। ছাব্বিশ হাজার আটশো ফুটের শেষ শিবিরে লাকপা ছেদি, মরবু জিসহে, সেমচুম্বিরা মাল পৌঁছে দিয়ে এক নজির সৃষ্টি করল। কর্ণেল ই.এফ. নর্টন এবং ডঃ টি. এইচ. সামারভেল এই শিবির থেকেই আঠাশ হাজার ফুট পর্যন্ত উঠতে সক্ষম হলেন।

১৯৫২ সাল পর্যন্ত এটাই ছিল সর্বোচ্চ উচ্চতা যেখানে অভিযাত্রীরা পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল। ১৯৫২ সালে সুইসদলের সঙ্গে আমি এবং রেমণ্ড ল্যাম্বার্ট আঠাশ হাজার ফুটের বেশি উঠেছিলাম। নর্টন এবং সামারভেলের পর শেষ শিবির থেকে শীর্ষে ওঠার চেষ্টা চালান মালোরী এবং আরভিন, তাঁরা আর ফিরে আসেন নি।

এরপর দীর্ঘ বিরতির পর ১৯৩৩ সালে বৃটিশরা আবার ফিরে এল। এই অভিযানে সুযোগ পাবার জন্যে আমি চেষ্টা করলাম, কিন্তু এবারেও তারা আমাকে দলে নিল না। এই দলটি

১৯২৪ সালের অভিযাত্রীদের চেয়ে বেশি কিছু করতে পারেনি, তবে কোনও দুর্ঘটনাও ঘটেনি। এবারে প্রথমে উইনি হ্যারিস এবং এল.আর. ওয়াগার এবং পরে ফ্রাঙ্ক স্মাইথ ও এরিক শিপটন, নর্টন যে পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন প্রায় সেই উচ্চতা পর্যন্ত যেতে পেরেছিলেন। শেষ ছ'নম্বর শিবিরে অসীম সাহসের সঙ্গে যে শেরপারা মাল পৌঁছে দিল তারা হল আং থার্কে, পাশাং, রিনজিং, ওলো, দাওয়া, শেরিং এবং কিপা। পাহাড়ের এই সাহসী শেরপা উপজাতিটিকে বৃটিশরা ভালবেসে টাইগার বলত। অবশেষে সরকারী ভাবে এদের অনেককেই তারা 'টাইগার' উপাধিতে ভূষিত করল, সেটা ১৯৩৮ সাল। তারপর থেকে তারা অনেককেই টাইগার উপাধি দিয়েছে।

আমার জীবনে প্রথম এভারেস্ট অভিযানে যাবার সুযোগ এল ১৯৩৫ সালে। দলনেতা এরিক শিপটন বছরের গোড়ায় দার্জিলিং এলেন। শীর্ষারোহণ নয় তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল উত্তর গিরিবর্ত্ম বা নর্থকলের দিকে ভাল একটা রাস্তার অনুসন্ধান করা যেমনটা হয়েছিল ১৯২১ সালে। দলে কাজ পাবার চেষ্টা চালাচ্ছি, কিন্তু মিঃ শিপটন এবং মিঃ ডব্লিউ. জে.কিড শেরপা সর্দার কার্মা পালকে জিজ্ঞেস না করে কাকেও কাজ দিতে রাজি নয়। আমার না ছিল অভিজ্ঞতার ছাড়পত্র না ছিল কার্মার সাথে পরিচয়। বিমর্ষভাবে দেখলাম দলে মালবাহক নেওয়া ঠিক হয়ে গেছে। এমন সময় হঠাৎ ঠিক হল যে আরও দুজনকে নেওয়া হবে। তখনও কাজ পাবার আশায় কুড়িজন শেরপা লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কোনও মতে সেই লাইনে ঢুকে পড়লাম, আমার পরনে ছিল খাঁকি হাফশার্ট আর হাফপ্যান্ট। মিঃ শিপটন এবং মিঃ কিড প্রত্যেককে আলাদাভাবে দেখতে দেখতে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন, অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট চাইলেন। মুশকিল হল আমি না জানি ইংরেজী না জানি হিন্দুস্তানী, হাত পা নেড়ে তাঁদের আমার অসহায়তার কথা বোঝাবার চেষ্টা করলাম। আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তাঁরা আমাকে লাইনের বাইরে আসতে বললেন। বুঝলাম আমার হয়ে গেল, এবারেও ওরা আমাকে দলে নিল না। একবুক অভিমান নিয়ে একজন কুড়ি বছরের শক্তসমর্থ যুবক ফিরে যেতে শুরু করলাম। সাহেবরা আমাকে পিছন থেকে ডাকছেন বুঝে মুখ ফেরালাম, বহিষ্কার নয় ওরা আমাকে মনোনীত করছেন। আমার সঙ্গে আরও একজন যুবক সেদিন মনোনীত হয়েছিল সে আং শেরিং। কয়েকবছর পরে নাঙ্গা পর্বত অভিযানে গিয়ে প্রাণ হারায়। আমাকে দলে নেওয়াতে কিছু পুরনো এবং অভিজ্ঞ শেরপা অসন্তুষ্ট হল, কিন্তু সেদিন আমি এতই খুশি হয়েছিলাম যে তারা আমাকে ধরে মারলেও আমি রাগ করতাম না। আমার মজুরী ঠিক হল দিনে বারো আনা আর যদি বরফের উপর মাল পৌঁছে দিতে পারি তবে তখন মজুরী হবে এক টাকা। যথেষ্ট! মজুরী নয় দলে সুযোগ পাওয়াটাই আমার একমাত্র কাম্য ছিল। আজ আমার স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে, আমি আমার প্রিয় চোমোলোংমার কাছে যেতে পারব। এর চেয়ে আনন্দের আর কিছুই হয় না। পরে ১৯৫৩ সালে লন্ডনের সম্বর্দ্ধনা সভায় মিঃ এরিক শিপটনকে দেখে আমার মনে পড়ে যায় এই সেই ব্যক্তি যিনি আমাকে জীবনের প্রথম সুযোগ এনে দিয়েছিলেন।

আগের আগের অভিযানের মত এবারেও প্রথমে দার্জিলিং থেকে উত্তরে দিকে হাঁটা শুরু হল। উঁচু নিচু পাহাড়, মালভূমি গিরিবর্ত্ম পার হয়ে আমরা সিকিম থেকে তিব্বতে গিয়ে

পৌঁছলাম। দার্জিলিং থেকে এভারেস্টের মূল শিবিরের সোজাসুজি দূরত্ব একশ মাইল। কিন্তু চলার পথ খুঁজে আমরা তিনশ মাইলের মত পথ অতিক্রম করলাম। নির্জন, নিস্তব্ধ পৃথিবীতে অভিযাত্রী, খচ্চর আর মালবাহকদের এক লম্বা মিছিল। নিত্যদিনের সঙ্গী ধুলো আর তীব্র বাতাস। তিব্বতের দিক দিয়ে যে অভিযান তাতে মূল শিবির পর্যন্ত মাল যেত খচ্চরের পিঠে কিন্তু নেপালের দিক দিয়ে অভিযানে বহু নদী আর ঝুলন্ত সেতু পার করার জন্যে মানুষের পিঠে ছাড়া মাল নিয়ে যাবার উপায় ছিল না। এখন আমাদের দলে মাত্র বারজন পর্বতারোহী শেরপা বাকিরা অধিকাংশই তিব্বতী যারা খচ্চরগুলো দেখাশুনো করার জন্যে ছিল। তিব্বতে মূল শিবিরে পৌঁছে প্রথমেই দলটি এভারেস্ট আরোহণের চেষ্টা করে নি। আশেপাশের ছোটখাট পর্বতশৃঙ্গগুলোতে অভ্যাস শুরু করল। পূর্ব রংবুক হিমবাহ পথে অভিযান শুরু হল। রংবুক হিমবাহের শিবিরে আমার জন্যে এক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। আমার আসার খবর পেয়ে বাবা নাঙ্পা গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। আসার পথে তিনি জীবনে দ্বিতীয় বারের জন্যে ইয়েতির মুখোমুখি পড়ে যান।

পূর্ব রংবুক হিমবাহের উপরে তৃতীয় শিবিরের স্থানে পৌঁছে এক মর্মান্তিক দৃশ্যের মুখোমুখি হলাম। আগের বছর মরিস উইলসন নামে একজন ইংরেজ তিনজন তিব্বতীকে সঙ্গে নিয়ে গোপনে এভারেস্ট অভিযানে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি আর ফিরে যাননি। ঝড়ে ক্ষতবিক্ষত এক তাঁবুর কাছে তাঁর মৃতদেহ দেখতে পেলাম। ঠান্ডায় শক্ত কাঠ হয়ে যাওয়া কঙ্কালসার দেহে শুকনো চামড়া লেগে আছে। দেখে মনে হয় তিনি যখন তাঁর জুতো খুলছিলেন তখনই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। একটা জুতো খোলা হয়ে গেছে, হাড়-কখানা-সার আঙ্গুল দিয়ে আর একটা জুতোর ফিতে খুলছেন এই হচ্ছে ছবি। আমার মনে হল উইলসন নর্থকল আরোহণে ব্যর্থ হয়ে যখন শ্রান্ত দেহে নিচের তাঁবুতে ফিরে আসেন তখন সেখানে কেউ ছিল না যে তাঁকে একটু সাহায্য করতে পারে। অবসন্ন ক্লান্ত দেহে প্রচন্ড ঠাণ্ডার ধকল সইতে না পেরে তাঁর মৃত্যু হয়।

হিমবাহের একধারে পাথরের আড়ালে আমরা তাঁর দেহ সমাধি দিলাম। আমি জানতাম এই অভিযানে উইলসন দার্জিলিং থেকে তিনজন ভোটিয়াকে ভাড়া করেন। তারা হল আমার চেনা তেওয়াং ভোটিয়া, রিনজিং ভোটিয়া এবং শেরিং ভোটিয়া। অভিযান থেকে ফিরে আমি তাদের মুখেমুখি হলাম, ঘটনার কথা জিজ্ঞেস করলাম। তারা আমাকে জানায় যে চলতি রাস্তাতেই তারা অভিযান শুরু করে কিন্তু সরকারি অনুমতি না থাকাতে আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে মাঝে মধ্যে পথ বদলেছে। রংবুক মঠে পৌঁছে তারা পনের দিন অপেক্ষা করে এবং অবশেষে অভিযান শুরু করে পূর্ব রংবুক হিমবাহে পরপর তিনটে শিবির স্থাপন করে। তিন নম্বর শিবিরের পর ভোটিয়ারা আরও উঁচুতে যেতে অসম্মত হয় এবং তখন আলোচনা করে ঠিক হয় যে উইলসন আরও উঁচুতে উঠবে আর তারা এখানে তাঁর জন্যে তিনদিন অপেক্ষা করবে। অবশেষে তিনদিন অপেক্ষা করার পরেও তাঁকে ফিরতে না দেখে এরা ফিরে আসে। তাদের এহেন কথা শুনে প্রতিবেশী হিসেবে আমি যারপরনাই লজ্জিত হলাম। আমি নিশ্চিত যে সৎ এবং বিবেচক মানুষের যা করা উচিত ছিল তারা তা করেনি। উইলসনকে ফিরতে না দেখে আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করা অথবা একটু উঁচুতে উঠে অনুসন্ধান করা এর কোনওটাই তারা করেনি। বুঝলাম আজ তাদের এই যে হঠাৎ অর্থের স্বচ্ছলতা এসেছে

এটা উইলসনের ফেলে যাওয়া অর্থ থেকেই হয়েছে। মুখে যা আসে তাই বলে আমি ওদের তিরস্কার করলাম, এছাড়া এখন আর কিই বা করার আছে।

১৯৩৫ সালে আমার জীবনে প্রথম এবং সবচেয়ে বড় মাপের অভিযান। একেবারে এভারেস্ট। আমার সামনে বরফ আর পাথরের দেওয়াল যথেষ্ট উঁচু, প্রাণের স্পন্দন নেই কোথাও। এরই মাঝে হিমবাহের মধ্যে আমরা শিবির স্থাপন করে চলেছি। এই সেই পর্বত, যার ছায়ায় আমি খেলা করেছি, বড় হয়েছি, আমাদের ইয়াক চরিয়েছি। অবাক হচ্ছি একথা ভেবে যে এখান থেকে আমাদের বাড়ি একটুখানি পথ। যদিও এদিক থেকে এভারেস্টকে সম্পূর্ণ অন্যরকম দেখতে লাগে।

মালবহনের কাজ বড়ই কঠিন। নিচের শিবিরে আমরা প্রতিদিন প্রায়ই নব্বই পাউন্ড মাল বয়েছি আর বরফের মধ্যে আরও উঁচুতে পঞ্চাশ পাউণ্ড। আর শুধু একদিন দুদিন নয় একাজ আমাদের করতে হয়েছে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ। তাছাড়া জীবনে প্রথম সুযোগ। আমার স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে। এমন অদ্ভুত পোশাক এর আগে পরিনি, ভারি বুট, রঙ্গীন চশমা। পর্ব্বতারোহণের কৌশল রপ্ত করতে হচ্ছে। যে ছেলে শোলো খুম্বুতে জন্মেছে বরফ তার কাছে নতুন কিছু নয়। কিন্তু সত্যিকারের পর্বতারোহণ করতে গেলে কিভাবে দড়ি ব্যবহার করতে হবে, কিভাবে আইস এ্যাক্স ধরতে হবে বরফে, পা রাখার ধাপ কাটতে হবে সবই শিখতে হবে। এছাড়া নিরাপদ ও সোজা রাস্তা খুঁজে বের করার মত বুদ্ধি চাই। কিভাবে দ্রুত তাঁবু খাটাতে হয় তাও শিখতে হবে। এত উঁচুতে আমি এই প্রথম এলাম তবে তার জন্যে আমার শরীরে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। যে কজন শেরপা বাইশ হাজার ফুট উচ্চতার নর্থকলে মাল পৌঁছে দিয়ে এসেছে আমি তাদের মধ্যে একজন। যদিও শিক্ষানবিশ হিসেবে সাহেবরা আমাকে কঠিন কাজ দিতে চাইত না তবু আমি ইচ্ছে করেই কঠিন কাজগুলো বেছে নিতাম। এতে তাঁরা আমাকে পছন্দ করা শুরু করলেন। এই অভিযানে দলটি নর্থকলের বেশি ওঠেনি কারণ মূলত এটা ছিল একটা অনুসন্ধানী দল। তাছাড়া পর্বতারোহীর সংখ্যাল্পতা এবং সাজসরঞ্জামের অভাবও ছিল। নর্থকলে পৌঁছে আমি বুঝতে পারলাম মানসিকভাবে আমি অন্য শেরপাদের চেয়ে আলাদা ধরনের। পাহাড় থেকে নেমে আসার কথায় সবাই যখন আনন্দিত আমি তখন বেদনাক্লিষ্ট। মাল বওয়াটা ওদের পেশা, আর আমি চেয়েছি মাল বইবার সুযোগে যদি আরও উঁচুতে ওঠা যায়। বাকি জীবনে আমার এই মানসিকতার পরিবর্তন হয়নি। পরবর্তী সময়ে এভারেস্ট অভিযানে এসে আমি বাকি পৃথিবীর কথা ভুলে যেতাম। কিন্তু প্রথম অভিযানে এই পর্যন্ত। এবার আমাদের ফিরে যাবার পালা। মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিলাম, তোমার বয়স তো এই সবে একুশ, পড়ে আছে বাকি জীবন। আবার সুযোগ আসবে..... আবার... আবার....। তখন নিজেকে সত্যিকারের টাইগার হিসেবে প্রমাণ দিতে পারবে।

ফিরে এলাম নিজের ঘরে, দার্জিলিং-এ। এরপর বেশ কিছু দিন আমরা সুখে সংসার করলাম। আমাদের একটা ফুটফুটে সুন্দর ছেলে হল, নাম রাখলাম নিমা দোরজী, একটা শিশু প্রতিযোগিতায় নিমা প্রথম পুরস্কার পেল। কিন্তু আমাদের হৃদয়ে গভীর বেদনা জাগিয়ে ১৯৩৯ সালে মাত্র চার বছর বয়সে তার মৃত্যু হল।

১৯৩৫ সালের বসন্ত কাল, আমার জীবনে দ্বিতীয় পর্বতাভিযান। ভারতীয় [illegible] এবং [illegible] বিভাগের একজন কর্মী মিঃ কুক এবং তাঁর একজন জার্মান বন্ধু উত্তর সিকিমের [illegible] কাছে চবিবশ হাজার ফুট উঁচু কাব্রু শৃঙ্গ অভিযানে গিয়েছিলেন। সেই দলে শেরপা [illegible] ছিল আং শেরিং, পাশাং ফুটার, পাশাং কিকুলি এবং আমি। পাশাং ফুটার [illegible] আর কিকুলি তখনই যথেষ্ট খ্যাতিমান। এর চার বছর পর আমেরিকান দলের [illegible] অভিযানে গিয়ে সে বীরের মৃত্যু বরণ করে। কাব্রু অভিযানে আমিই ছিলাম দলের [illegible] সদস্য। কিন্তু মাল বয়েছি সবচেয়ে বেশি আর হাঁটার গতিতে কাউকে প্রথম হতে দিইনি। আশি পাউণ্ড মাল নিয়ে সবার আগে মূল শিবিরে পৌঁছেছিলাম। এই অভিযানে আমার দায়িত্ব ছিল মূল শিবির পর্যন্ত মাল পৌঁছে দেওয়া এবং দায়িত্ব শেষ করে আমাকে ফিরে আসতে হয়েছিল। মিঃ কুক তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে সে যাত্রায় কাব্রু আরোহণ করেছিলেন কিন্তু সঙ্গে শেরপা নেননি।

শীতকালে শেরপাদের কোনও অভিযানের কাজ থাকে না। সে বছর শীতকাল আমি দার্জিলিং-এ থেকে ছেলে বৌয়ের সঙ্গে পরম আনন্দে কাটিয়ে দিলাম। ১৯৩৬ এর বসন্তে আবার পর্বত অভিযানের প্রস্তুতি শুরু হল। এই বছর আমি দুটো অভিযানে অংশ নিলাম। প্রথমটাই এভারেস্ট অভিযান। এবারে সুযোগ পেতে আমার আর কোনও অসুবিধা হয়নি, গতবারের সকল শেরপাকেই এই দলে নেওয়া হল। ১৯৩৩ সালের দলনেতা হিউ রাটলেজের নেতৃত্বে বহু প্রখ্যাত পর্বতারোহী ছিল এই অভিযানে। দলে এরিক শিপটন ছাড়াও ফ্রাঙ্ক স্মাইথ রয়েছেন। দলনেতার কাজ চালাবার পক্ষে মিঃ রাটলেজের বয়সটা একটু বেশি মনে হলেও তাঁর মত সহৃদয় সুন্দর মানুষকে পেয়ে শেরপারা বেজায় খুশি। ষাটজন শেরপা, বহু মালবাহক এবং খচ্চর সব মিলিয়ে এক মহামিছিল। অভিযান এক যুদ্ধযাত্রার চেহারা নিয়েছে। এবারের পদযাত্রা শুরু হল কালিম্পং থেকে। সমস্ত মালপত্র রোপওয়ের সাহায্যে সেখানে নিয়ে যাওয়া হল তারপর দলের লোকজন একত্রিত হয়ে কালিম্পং থেকে হাঁটা শুরু করল। দলটাকে দুভাগে ভাগ করে নেওয়া হল, প্রথম দল রওনা হবার পরের দিন দ্বিতীয় দলটিকে রওনা করিয়ে দেওয়া হল। যদি এমনটি করা না হত তবে প্রথম জন দিনের মধ্য ভাগে গন্তব্যে পৌঁছলে শেষজন গভীর রাতের আগে পৌঁছতে পারত না। আমাকে দলে ডাক্তারের সাহায্যকারী হিসেবে কাজ দেওয়া হল, ফলে আমি তাঁর সঙ্গে থেকে পাহাড়ের বিশেষ রোগ এবং অসুস্থতা সম্বন্ধে জানতে পারলাম। ছোটখাট দুর্ঘটনার চিকিৎসা করতে শিখলাম।

১৯৩৬এর অভিযান সম্পর্কে বৃটিশদের মনে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে এবারে তারা অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে। সাজসরঞ্জামের অভাব ছিল না, খাবার দাবার পর্যাপ্ত, অভিযাত্রীরা প্রত্যেকেই অভিজ্ঞ এবং মনে প্রাণে সতেজ। কিন্তু গোড়া থেকেই নানা দুর্ভোগে দলটি একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। আবহাওয়া কোনও সময়ে ভাল নয়, মাঝে মাঝে মনে হত আমরা বোধহয় বর্ষাকালে এসে গেছি। ক্রমাগত তুষারপাতের মধ্যে দিয়ে এক, দুই এবং তিন নম্বর শিবির স্থাপন করলাম। এরপর যখন নর্থ কলের দিকে উঠছি তখন প্রায় বুক সমান বরফ। বরফে চোরা ফাটলের ভয় আর তুষার ধ্বসের আতঙ্ক ১৯২২ এর নর্থকলের দুর্ঘটনার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। দিনের প্রথম ভাগে তুষারপাত এবং পরের দিকে দুরন্ত হাওয়ায় এরই

মধ্যে দিয়ে আমরা কজন নর্থকলে শিবির স্থাপন করলাম। এমন জঘন্য আবহাওয়া জীবনে দেখিনি। পথ চলতে কয়েক ফুট দূরের মানুষ দেখা যায় না। মাঝে হাওয়ার গতি বেড়ে ঝড় শুরু হল। তখন বাধ্য হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে নিচের শিবিরে নেমে এলাম। নিচের শিবিরে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করলাম যদি প্রকৃতি একটু শান্ত হয়, কিন্তু তার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। তখন কয়েকজন ঠিক করল এই অবস্থাতেই ওপরে ওঠার চেষ্টা করবে. রাটলেজ বাধা দিলেন। তিনি বললেন, এভারেস্ট তার জায়গাতেই থাকবে। আমরা সুস্থ থাকলে আবার আসতে পারব কিন্তু কোনও দুর্ঘটনা আমার কাম্য নয়। ফলে আরও কয়েক সপ্তাহ হিমবাহের শিবিরে কাটিয়ে আমরা ফিরতে শুরু করলাম। ফেরার পথে গাদং পাগা বলে এক স্থানে এসে এক খরস্রোতা নদী পার হবার জন্যে দড়ির সেতু ছিল, আমরা সকলেই নিজেদের শক্ত করে বেঁধে অতি সতর্কতার সঙ্গে পার হচ্ছি. একজন শেরপা কোনওরকম বাঁধন ছাড়াই পার হতে শুরু করল। আমরা তাকে সতর্ক করলাম. অনেক বাধা দিলাম, কিন্তু সে কোনও নিষেধ শুনল না। নদীর মাঝ বরাবর এসে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল আর শত চেষ্টাতেও নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। দড়ি থেকে হাত খুলে জলে পড়ে গেল। খরস্রোত নদীতে সাঁতার কাটতে যারা অভ্যস্ত তারা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করল কিন্তু নদীর স্রোত এত তীব্র যে তার কাছে পৌঁছবার আগেই তাকে বহুদূরে নিয়ে চলে গেল। আমরা শুধু পুরনো শেরপা কায়দায় তার চুলে বাঁধা ফিতেটুকু শেষবারের মত দেখতে পেলাম।

বিফল মনোরথ হয়ে আমরা কালিম্পং ফিরলাম। সবার মন ভারাক্রান্ত। কিন্তু মিঃ রাটলেজের জন্যে আমার মন বেদনায় ভরে গেল। এমন একজন সুন্দর মানুষ অথচ এখনই তাঁর যা বয়স হয়ত এটাই তাঁর শেষ এভারেস্ট অভিযান। ঘটনাচক্রে আর কখনও তাঁকে আমি হিমালয়ে আসতে দেখিনি। আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় যখন এভারেস্ট আরোহণের পর আমি ইংল্যাণ্ড গেলাম। আমাকে দেখে তিনি আলিঙ্গন করে বললেন "বাবা, তুমি এভারেস্টে উঠেছ এতে আমি দারুণ খুশি হয়েছি। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, কিন্তু তুমি পেরেছ, আজ আর আমার কোনও দুঃখ নেই। তুমি ফিরে গিয়ে আমার বাকি শেরপা সন্তানদের আমার ভালবাসা জানিও।" তিনি আমাদের যেভাবে ভালবাসতেন তা একমাত্র কোনও পিতার পক্ষেই সম্ভব. সত্যিই আমরা তাঁর সন্তানের মত ছিলাম।

টাইগার সম্মানপ্রাপ্তি

১৯৩৬ সালের এভারেস্ট অভিযান থেকে ফিরে বেশি দিন বিশ্রাম করতে পারলাম না। মধ্য হিমালয়ের গাড়োয়ালে এক অভিযানে অংশ নেবার জন্যে এরিক শিপটন আমাকে দলে নিলেন। রয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মেজর ওসমাস্টনের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। তিনি আবার সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার একজন কর্তাব্যক্তি। জরীপের কাজে তিনি নন্দাদেবী অঞ্চলে যাবেন, তাঁর একান্ত ইচ্ছা আমিও তাঁর সঙ্গে যাই। এই অভিযানে আমার জীবনে অনেক কিছুই প্রথম ঘটল। আমি প্রথম সমতলে এলাম, প্রথম ট্রেনে চাপলাম, কলকাতা এবং দিল্লীর মত শহর দেখলাম এবং প্রথম বুঝলাম গরম কি জিনিষ! মিঃ ওসমাস্টন গাড়োয়াল হিমালয়ে বিশেষ করে নন্দাদেবী অঞ্চলে বহু বছর ধরে বহু জরীপের কাজ করেছেন। এই প্রথম বারের মত তার সবগুলোতেই আমি তাঁর সঙ্গী ছিলাম।

১৯৩৪ সালে শিপটন আর একজন বিখ্যাত পর্বতারোহী এইচ. ডব্লউ টিলম্যানকে সঙ্গে নিয়ে ঋষিগঙ্গাকে অনুসরণ করে গিরিখাত এবং বিপজ্জনক সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করে বেসিনের মত (চারিদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা গামলার মত স্থান) এক অতিসুন্দর জায়গায় হাজির হয়ে ছিলেন যেখানে মূলশিবির স্থাপন করে নন্দাদেবী আরোহণের চেষ্টা করা যেতে পারে। সঙ্গে পর্যাপ্ত সাজসরঞ্জাম এবং লোকজন না থাকাতে তাঁরা সেবারের মত আর বেশি উঁচুতে ওঠেন নি, তাঁরা নন্দাদেবীর পায়ের কাছে এই স্থানকে নন্দাদেবী স্যাংচুয়ারী বলে চিহ্নিত করেছিলেন, আক্ষরিক অর্থেই যার মানে হল পবিত্রভূমি বা অভয়ারণ্য।

১৯৩৬ সালে শিপটন যখন এভারেস্ট আরোহণের জন্যে অভিযানে ব্যস্ত তখন টিলম্যান অন্য একটা দল নিয়ে নন্দাদেবী অভিযানে ব্যপৃত। ওসমাস্টনের সঙ্গে আমরা যখন স্যাংচুয়ারীর পথে এগিয়ে যাচ্ছি তখন টিলম্যানের দল নেমে আসছেন। উৎফুল্ল টিলম্যানের কাছে জানলাম তিনি এবং এন. ই. ওডেল (এই সেই জগৎবিখ্যাত ওডেল যিনি ১৯২৪ সালে ম্যালরী এবং আরভিন এভারেস্ট শীর্ষের কাছ থেকে নিখোঁজ হয়ে যাবার পর তাঁদের খোঁজে এভারেস্টের সাতাশহাজার ফুট উচ্চতা পর্যন্ত একা একা উঠে গিয়েছিলেন) নন্দাদেবী শীর্ষে আরোহণ করেছেন। ঐ দলেরই আর একজন তরুণ সদস্য ডাঃ চার্লস হাউসটন্ প্রায় শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিলেন কিন্তু আগের রাতে খাদ্য গ্রহণে অনিয়ম হওয়াতে মারাত্মক পেটের গোলমালের শিকার হয়ে ঐ স্থান থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হন। পঁচিশ হাজার ছশো যাট ফুটের নন্দাদেবী শৃঙ্গ আরোহণ তখনও পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ আরোহণের রেকর্ড হয়ে রইল। পরে ১৯৫০ সালে ফরাসীদের অন্নপূর্ণা মূল শৃঙ্গ আরোহণ সে রেকর্ড ম্লান করে দেয়। অন্নপূর্ণা কথার মানে অন্নদাতৃ মা, হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয় ধর্মালম্বীদের কাছেই অত্যন্ত পবিত্র পর্বত। দুর্গম অন্নপূর্ণার মূল শিবির এলাকায় পৌঁছতে অভিযাত্রীদের ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে।

এবারের অভিযানে আমি মাঝপথেই অসুস্থ হয়ে পড়লাম। আমার মনে হয় দার্জিলিং থেকে সমতলের গরম আবহাওয়ার মধ্যে দিল্লী হয়ে গাড়োয়াল আসার পথেই আমার শরীরে গোলোযোগ শুরু হয়। আবার এ হতে পারে যে এক নাগাড়ে বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে চলার ফলে

এমনটা হয়েছে কিম্বা এভারেস্ট থেকে ফিরে, বিশ্রাম না নেওয়ার ফলে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, অত্যন্ত দুর্বল, অনেক সময় এমন হয়েছে যে দলনেতার নির্দেশে অন্যেরা আমাকে পিঠে করে বয়ে নিয়ে গিয়েছে। সেই সময় মিঃ ওসমাস্টন আমার প্রতি যে স্নেহ এবং ভালবাসা দেখিয়েছিলেন সে ঋণ আমি জীবনে ভুলব না। প্রতিজ্ঞা করলাম যদি কখনও সুযোগ আসে তবে তাঁর এই স্নেহের প্রতিদান দেবার চেষ্টা করব। অনেক চিকিৎসা হল কিন্তু রোগ উপশমের কোনও লক্ষণ নেই। ইংরেজরা বলাবলি করছে যে এটা যকৃৎ ঘটিত একটা বিদঘুটে রকমের অসুখ। অবশেষে ঐ অঞ্চলের পাহাড়ী মানুষরা আমাকে পরীক্ষা করে বলল যে পাহাড়ের গায়ে বেড়ে ওঠা তাদের পরিচিত এক বিশেষ রকমের ছত্রাক বেটে সিদ্ধ করে যদি সেই জল খাওয়া যায় তবে এ অসুখ ভাল হয়ে যাবে। তাই করা হল কিন্তু সেদ্ধ জল খেয়ে আমার এমন বমি শুরু হল যে মনে হল নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসবে। শেষ পর্যন্ত ঐ ঔষুধেই সুস্থ হলাম, কিন্তু দুর্বলতা থেকেই গেল। আমাদেব দল ঋষিগঙ্গার উজান বেয়ে বিখ্যাত ঋষি গিরিখাত ধরে সুন্দর ফুলে ঢাকা তৃণভূমি হয়ে নন্দাদেবী সাংচুয়ারীতে প্রবেশ করল। এরপর কয়েক সপ্তাহ মেজর ওসমাসটন সাংচুয়ারীতে মূল শিবির স্থাপন করে জরীপের কাজ চালালেন। দুর্বল শরীরে আমি কিছুই করতে পারিনা, মূল শিবিরের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করি আর টিলম্যানের অভিযানে মৃত শেরপাটির পাথর দিয়ে ঢাকা সমাধি যখনই চোখে পড়ে তখনই মনে হয় আর একটু হলে আমারও এই দশা হত। অবশেষে কাজ শেষ করে আমরা রানীক্ষেত ফিরলাম সেখান থেকে দার্জিলিং। এই অভিযানে আমি কোনও কিছুই করতে পারিনি, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দিন কাটে আর ভাবি যদি আবার সুযোগ আসে তাহলে ভাল কিছু করে দেখাব।

অভিযানে না গেলে শেরপারা নানারকম কাজ করে উপার্জন করে। ভ্রমনার্থীদের গাইডের কাজ করা এরকমই একটা কাজ। আমিও কখনও কখনও গাইডের কাজ করি, তাদের নিয়ে টাইগার হিলে চলে। যাই পরিষ্কার আবহাওয়া থাকলে এভারেস্টের চূড়ার অল্প অংশ দেখা যায়। এছাড়া দার্জিলিং থেকে পায়ে চলা পথ সন্দকফু-ফালুট, এখান থেকে এভারেস্টকে স্পষ্ট দেখা যায়। সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি এক আনন্দে আমার মন ভরে ওঠে। সে আছে আমারই চোখের সামনে, তৃপ্তিতে মন ভরে যায়, আবার বিষাদের ছায়া ঘনায় এই ভেবে যে সে আছে ঠিকই কিন্তু আমি যেতে পারছি কই। এর মধ্যে আর কোনও এভারেস্ট অভিযানের খবর পাওয়া যাচ্ছেনা তবে শোনা গেল ১৯৩৮ সালে আবার অভিযান হবে—আর কত দিন চুপ করে বসে থাকতে হবে!

১৯৩৭ সালে আমি গাড়োয়াল হিমালয়ের এক অভিযানে যাবার আমন্ত্রণ পেলাম। ডুন স্কুলের দুজন শিক্ষক মিঃ জে. টি এম. গিবসন এবং জে.এ.কে. মার্টিন বন্দরপুঞ্ছ (যার মানে হল বাঁদরের লেজ)-এ যাওয়ার জন্যে আমাকে আর রিনজিংকে আমন্ত্রণ জানালেন। এরপরে আরও তিনবার আমি মিঃ গিবসনের সঙ্গে অভিযানে গিয়েছি। মাঙ্কি টেল (বন্দরপুঞ্ছের) উচ্চতা কুড়ি হাজার সাতশো কুড়ি ফুট, নন্দাদেবী কিম্বা এভারেস্টের তুলনায় কিছুই নয়। অবশ্য এর আগে মাঙ্কি টেলে কোনও অভিযান হয়নি আব রাস্তাটাও সহজ নয়। সেবারে প্রচণ্ড তুষার পাতের জন্যে মাত্র সতেরো হাজার ফুট থেকে আমাদেব ফিরে আসতে হয়েছিল।

ব্যর্থ হয়ে দ্বিতীয়বার চেষ্টা না করে অন্য কতকগুলো অভিযান চালিয়েছিলাম। এইভাবে আমরা যখন নদীর ধারে তাঁবু লাগিয়ে আছি তখন বিভিন্ন দিকে পরিদর্শন করার জন্যে দুটো দলে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়লাম। মিঃ গিবসন আর রিনজিং নদীর এপারে; আমি এবং মিঃ মার্টিন ওপারে চলে গেলাম। কথা হল সকলেই রাত্রের মধ্যে ফিরে আসব। কিছুদূর চলার পর ঘন কুয়াশায় চারদিকে আচ্ছন্ন হয়ে গেল আর এর কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবল বৃষ্টি শুরু হল। ফলে রাস্তা হারিয়ে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। তাঁবুর রাস্তা হারিয়ে গেল। সঙ্গে পর্যাপ্ত সরঞ্জাম বা স্লিপিং ব্যাগ কিছুই ছিল না। চিৎকার করে আমরা অন্যদের খুঁজতে লাগলাম কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার জন্যে কিছুই বুঝতে পারছি না। বৃষ্টির তীব্রতা এতই বেড়ে গেল যে এখন আর পরস্পরের গলার শব্দও শুনতে পাচ্ছিনা। অবশেষে একটা গুহা দেখে তারই মধ্যে আশ্রয় নিলাম। খারাপ আবহাওয়ার দুদিন সেই গুহায় বন্দী থেকে তাঁবুতে ফিরলাম। এরপর দীর্ঘপথ হেঁটে আমরা তিব্বত সীমান্তের এক গ্রামে এসে পৌঁছলাম, ফিরতি পথে গভীর জঙ্গলে আবার পথ হারালাম। পথ হারিয়ে ঘুরতে ঘুরতে খিদের জ্বালায় জংলীফল খেয়ে খিদে নিবারণ করতাম। কয়েকদিন পরে জঙ্গলের মধ্যে কয়েকজন লোকের দেখা পেলাম, একটা গাছের তলায় তারা খেতে বসেছে। তাদের কাছে যথেষ্ট খাবার ছিল, তার মধ্যে কিছু বিক্রি করার জন্যে অনুরোধ করলাম কিন্তু তারা রাজী হল না। তাকিয়ে তাকিয়ে তাদের খাওয়া দেখছি হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। হিমালয়ের এই অঞ্চলের লোকেদের মধ্যে একটা সংস্কার আছে আর তা হল কোনও অচেনা লোক যদি তাদের খাদ্যবস্তু ছুঁয়ে দেয় তবে সেই খাবার তারা আর স্পর্শ করবে না। আমি কথাটা মিঃ গিবসনকে বললাম। গিবসন লোকগুলির কাছে গিয়ে 'এটা কি? ওটা কেমন খেতে?' বলে খাবারগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতে লাগল। এরকম একটা অবস্থার মধ্যে পড়ে লোকগুলো কেমন হকচকিয়ে গেল এবং অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে খাবার ফেলে উঠে পড়ল। আমরা তাদের অনেক বোঝালাম, খাবার নষ্ট করার জন্যে দাম দিতে চাইলাম কিন্তু কোনও কথাই তাদের শান্ত করতে পারল না এবং রেগেমেগে সেখান থেকে চলে গেল। বুঝলাম একটা কিছু গণ্ডগোল হতে পারে। কালবিলম্ব না করে আমরা সেখান থেকে সরে পড়লাম। অবশ্য এর মধ্যে আমাদের একটা সুন্দর ভোজ সমাধা হয়ে গেল।

এই অভিযানে সবসময়েই আমরা খাদ্য সমস্যায় ভুগেছি। এক নাগাড়ে তিন সপ্তাহ কোনও টাটকা খাবার জুটল না। একটা গ্রামে এসে একটা গোটা ছাগল কেটে রান্না করলাম। আমরা এতই ক্ষুধার্ত ছিলাম যে ঐ কজন লোক মিলে সব মাংসটা খেয়ে নিলাম। ফল যা হবার তাই হল, পরের দিন থেকেই পেটের গোলযোগে তিনদিন ঐ গ্রামেই থেকে যেতে হল। অবশেষে একরকম কড়া মদ জাতীয় আরক আনিয়ে খেলাম নিজেদের বুদ্ধিতেই এবং তাতেই কাজ হল। সবাই ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলাম।

এই একই যাত্রায় আমরা বিখ্যাত তীর্থস্থান গঙ্গোত্রী হয়ে গোমুখ গেলাম। এরপর বদ্রিনাথ এবং কামেটের মধ্যভাগের আঠারো হাজার ফুট উচ্চতার বির্নি গিরিবর্ত্মকে উত্তর দিক থেকে অতিক্রম করে দক্ষিণে পৌঁছলাম। ১৯৩২ সালের প্রথম সফল কামেট অভিযানে ক্যাপ্টেন ই. বির্নি দক্ষিণ দিক থেকে এই গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে উত্তরে পৌঁছেছিলেন। তাঁর নাম

অনুসরণে এর নাম হয় বির্নি পাশ বা বির্নি গিরিবর্ত্ম।

একই বছরে আমি দুবার গাড়োয়াল হিমালয়ের অভিযানে অংশ নিলাম এবং দুটোই আমার পক্ষে তৃপ্তিদায়ক কিন্তু কিছুতেই এরা এভারেস্টের তৃষ্ণা মেটাতে পারে না। এভারেস্টের তৃষ্ণা আমাকে অশান্ত করে তুলল। অবশেষে ১৯৩৮ এর অভিযানের আয়োজন হল। এটা এভারেস্টের সপ্তম অভিযান এবং আমার তৃতীয়বারের অংশ গ্রহণ। এবারের দলনেতা এইচ.ডব্লিউ. টিলম্যান। ১৯৩৬ সালে যে দল এসেছিল এই দলটি ছিল তার চেয়ে আকারে ছোট। টিলম্যান ছাড়াও দলে ছিলেন এরিক শিপটন, ফ্রাঙ্ক স্মাইথ এবং এন. ই. ওডেল। এছাড়া দুজন নতুন অভিযাত্রী পিটার লয়েড এবং ক্যাপ্টেন অলিভারের এটাই প্রথম এভারেস্ট অভিযান। টিলম্যানের স্বভাবটি ছিল ভারি মজার, প্রত্যেক শেরপার পছন্দের মানুষ। তাঁর ভ্রূযুগল ঘন এবং বিশাল, মুখটি ছিল যথেষ্ট বড়। আড়ালে আড়ালে আমরা তাঁকে বালু বা ভল্লুক বলে ডাকতাম। সাধারণ মালবাহকরা ফিরে যাবার পর আরও উঁচুতে বরফের রাজত্বে মাল বইবার জন্যেই কেবল শেরপারা হাত লাগাবে তার আগে নয় এই প্রথা তিনিই প্রথম চালু করেন। এর আগে শেরপারাও সাধারণ মালবাহকদের মত আগাগোড়া সমান ভার বইতে বাধ্য হত। এছাড়া 'টাইগার উপাধি' এবং 'টাইগার পদক' সরকারি ভাবে তিনিই প্রথম চালু করেন।

এবারেও আগের রাস্তা ধরেই দলটি এগিয়ে গেল। এপ্রিলের গোড়ায় রংবুক মঠ ছাড়িয়ে আরও উঁচুতে মূল শিবির স্থাপন করা হল এবং এখানেই দ্বিতীয় ও শেষবারের মত আমার বাবার সঙ্গে আমার দেখা হল। তিনি নাঙ্পা লা পেরিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। এরপর ১৯৪৯ সালে শোলো খুম্বুতে আমার স্নেহময় পিতা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আমার ভালমানুষ বাবা, তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধার শেষ নেই। রংবুক হিমবাহে পৌঁছে আমরা সরাসরি নর্থ কল বা উত্তর গিরিবর্ত্মের দিকে না গিয়ে ১৯৩৫ সালের অভিযানে যা করা হয়েছিল অর্থাৎ দ্বিতীয় রাস্তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম। আমাকে এবং আং শেরিং ও জিংমেকে নিয়ে মিঃ টিলম্যান লোলা গিরিবর্ত্মের মাথায় উঠে এলেন। এই সেই জায়গা যেখান থেকে মালোরী এবং আরভিন তাঁদের শেষ যাত্রা শুরু করেছিলেন। এখান থেকে এভারেস্টের অন্যদিকটা অর্থাৎ দক্ষিণ পশ্চিমের ঢাল বেয়ে সোজা নিচেটা প্রায় আমার গ্রাম থামে পর্যন্ত দেখা গেল। আশ্চর্য ব্যাপার এখান থেকে খুম্বু হিমবাহের আরও নিচে ইয়াকের দল চরতে দেখলাম এবং মনে হল সঙ্গে কেউ একজন রয়েছে। টিলম্যানের আশা এখান থেকে ঢাল বেয়ে সোজা উল্টো দিকে পৌঁছে যাওয়া যাবে। কিন্তু এ যাত্রায় সেটা সম্ভব হচ্ছে না, কারণ পুরো পথটাই গভীর বরফে ঢাকা এবং ঢাল সুতীক্ষ্ণ। নামা হয়তো বা সম্ভব হবে কিন্তু বরফের যা অবস্থা তাতে উঠে আসা সম্ভব নয়। আমরা যখন লোলার মাথায় তখন আবহাওয়া খারাপ, চারিদিক কুয়াশায় ঢাকা খুম্বুর সেই বিখ্যাত বেসিন (কড়াইয়ের মত দেখতে বা পাহাড় দিয়ে ঘেরা স্থান) যেটা দেখে ওয়েলসের অনুকরণে মালোরী নামকরণ করেছিলেন ওয়েস্টার্ণ কুম বা কিউম। এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয় যে ঐ পথে আদৌ এভারেস্ট আরোহণ সম্ভব কিনা? অথচ আমি সেদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি আজ থেকে পনের বছর পর ঐ পথেই এভারেস্টে আরোহণ করা সম্ভব হবে।

এরপর মূল শিবিরে ফিরে এসে আমরা দুটো দলে ভাগ হয়ে গেলাম। একটা দল এগোল পূর্ব রংবুক হিমবাহ ধরে অন্যটা মূল রংবুক ধরে। পুরনো রাস্তার তুলনায় নতুন রাস্তা কঠিন বলে মনে হল। পূর্ব রংবুকের পথ যথেষ্ট কঠিন কিন্তু মূল রংবুক দুর্গম। এছাড়া গিরিবর্ত্মের নিচে একটা জায়গা আছে যেখানে সর্বক্ষণ হিমানী সম্প্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আর এখানেই আমি জীবনের প্রথম হিমানী সম্প্রপাতের শিকার হলাম। দুর্ঘটনা যখন ঘটল তখন আমরা ছ'জন দুটো দড়িতে আরোহণ করছি। ক্যাপ্টেন অলিভার, ওয়াংদি এবং আমি একটা দড়িতে অন্যটিতে টিলমান এবং অন্য দুজন শেরপা। খাড়া বরফের দেওয়াল, নরম বরফে কোমর পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে, আমরা অতিকষ্টে উঠে আসছি। এমন সময় চারদিকে বরফ ফাটার আওয়াজ এবং সাথে সাথে বরফ গড়িয়ে আসছে। গড়ানো বরফের পাল্লায় পড়ে আমরাও গড়িয়ে নিচে নামছি, ডিগবাজি খাচ্ছি—মাথা বরফের মধ্যে ঢুকে গেল, চারদিক অন্ধকার। ১৯২২ সালে এখানে কি ঘটেছিল সে কথা মনে পড়ে গেল। তারই কি পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে? এই কি শেষ? যে ভাবেই হোক বাঁচতে হবে। মাথার ওপর দিয়ে আইস এ্যাক্স ছুঁড়ছি, বরফ কেটে বের হয়ে আসবার চেষ্টা করছি। ভাগ্যক্রমে হঠাৎই একসময়ে আমরা থেমে গেলাম, পতন রোধ হল। বরফের খুব একটা ভেতরে ছিলাম না তাছাড়া আমার আইস এ্যাক্স শক্ত বরফের সহায়তা পেয়ে গেল এবং তারই সাহায্যে আমি বাইরে এলাম—চারদিকে উজ্জ্বল আলো, এখনও বেঁচে আছি! আমাদের ভাগ্য ভাল যে বরফ খুব নিচে গড়িয়ে নামেনি এবং আমরা সবাই বাইরে আসতে পেরেছি। আমাদের পতন যেখানে রোধ হল, হিমানী সম্প্রপাত যেখানে থামল, সেখান থেকে দশ ফুট নিচে এক বিশাল বরফের ফাটল চোখে পড়ল, আর একটু হলেই ঐ ফাটলে আমদের তুষার সমাধি হতে পারত। কিন্তু আমাদের বিশেষ কোনও ক্ষতি হয়নি। অলিভার কেবলমাত্র তার উলের টুপিটা হারিয়েছে—যাকগে!

আমরা নর্থকলে চার নম্বর শিবির স্থাপন করলাম। এই নিয়ে আমার চারবার নর্থকলে আসা হল। নর্থকল থেকে আমরা আরও উঁচুতে উঠতে শুরু করলাম। একটা দড়িতে আমি, ফ্রাঙ্ক স্মাইথ, এবং এরিক শিপটন, এছাড়া ছ'জন শেরপা আমাদের সঙ্গে চলেছে তারা হচ্ছে রিনজিং, লোবসাং, ওয়াংণ্ডি নরবু, লাকপা তেনজিং, দা শেরিং এবং ওলো ভুটিয়া। আমরা উত্তর পূর্বদিক দিয়ে উঠছি আগের অভিযানের পথ ধরে। পঁচিশ হাজার আটশো ফুটে পঞ্চম শিবির স্থাপন করলাম। এখনও পর্যন্ত আমার জীবনে এটাই সর্বোচ্চ উচ্চতায় ওঠা। অবশ্য কোনও অসুবিধা হচ্ছে না কিন্তু আবহাওয়া খারাপ। গভীর বরফে চারদিক আচ্ছাদিত, আমরা আইস এ্যাক্স দিয়ে বরফ কেটে এগিয়ে যাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি সাহেবরা মাথা নাড়ছে, মনে হয় বলছে, আর ওঠা যাবে না।

পাঁচ নম্বর শিবিরে এসে ঠিক করলাম আমরা ছ'নম্বর শিবির স্থাপন করব এবং সেইমত এগিয়ে যাবার প্রস্তুতি নিলাম, এদিকে দুজন শেরপা উত্তর গিরিবর্ত্ম থেকে পাঁচ নম্বরে আসার পথে অসমর্থ হয়ে পড়ল। তাদের কাছে দলের তাঁবু এবং জ্বালানী রয়েছে যেটা ছাড়া চলবে না। তাঁবু কম পড়ে যাচ্ছে দেখে কয়েকজন শেরপা নিচে নেমে যেতে চাইল। কিন্তু এসব কিছুই ভাবতে হবে না যদি ঐ দুজনের ফেলে রাখা মালটা তুলে আনা যায়। আমি ঠিক করলাম যদি অনুমতি পাই তাহলে নিচে থেকে মালটা তুলে আনব। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাহেবরা

অনুমতি দিলে আমি নামতে শুরু করলাম। গিরিবর্ত্মের কাছাকাছি এসে বোঝা দুটো দেখতে পেলাম। দুটোকে একসঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে বোঝা পিঠে তুলে নিলাম। মাল নিয়ে উঠতে উঠতে জীবনে প্রথম অনুভব করলাম, একেই বলে পর্বতারোহণ। তখনকার দিনে বরফে চলার জন্যে জুতোয় ক্রাম্পন বাঁধা হত না। খাড়া দেওয়ালে ওঠার সময় হঠাৎ পা পিছলে গেল, কোনও মতে আইস এ্যাক্স বা তুষার গাঁইতির সাহায্যে পতন রোধ করলাম। আর সেটা যদি না পারতাম তাহলে এক মাইল নিচে রংবুক হিমবাহে আছড়ে পড়তাম। সন্ধ্যে নামার একটু আগে আমি শিবিরে ফিরলাম। মিঃ শিপটন এবং মিঃ স্মাইথ আমার জন্যে বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। আমার সাফল্যে তাঁরা যথেষ্ট বাহবা দিলেন। এবং সে কথা মনে রেখে অভিযানের শেষে কুড়ি টাকা বকশিষ দিয়েছিলেন।

পরের দিন সাতাশ হাজার ফুট উঁচুতে ছ' নম্বর শিবির স্থাপন করলাম। ১৯৫২ সালে সুইসদের সঙ্গে এভারেস্ট অভিযানে আসার আগে পর্যন্ত আমি আর এতটা উচ্চতায় উঠতে পারিনি। সেই দিনই ফ্রাঙ্ক স্মাইথ এবং শিপটন ছাড়া বাকি সকলে পাঁচ নম্বরে নেমে এলাম। এখানে লয়েড, টিলম্যান এবং কয়েকজন শেরপার সঙ্গে দেখা হল। সাহেবরা ছ'নম্বরে উঠে যাবে আর আমরা নিচে নর্থকলে অপেক্ষা করব। তবে খুব বেশিদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হয়নি, বরফের আধিক্য দেখে তাঁরা আর বেশি ওপরে যাবার সাহস করেননি। ১৯২৪ এবং ১৯৩৩ সালে যেখানে পাথর দেখা গিয়েছিল এখন সেখানে গভীর বরফে ঢাকা। তবু শক্ত বরফ হলেও ভেবে দেখা যেত কিন্তু তুলোর মত নরম বরফ ঠেলে এগিয়ে যাওয়া মুশকিল তাই শীর্ষারোহণের আশা ছাড়তে হয়েছে। এবারের অভিযানে আমার কাছে মজার ব্যাপার হল যে আমি প্রথম অক্সিজেন সিলিন্ডার এবং তা ব্যবহারের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি দেখলাম। টিলম্যান অক্সিজেন নেওয়া পছন্দ করতেন না, তাঁর বিশ্বাস অক্সিজেন ছাড়াই এভারেস্ট আরোহণ করা সম্ভব। অন্যরাও অক্সিজেন ব্যবহার করায় খুব একটা আগ্রহ দেখালেন না। কেবলমাত্র লয়েড নর্থকল এবং সেখান থেকে আরও উঁচুতে এটা নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তা দিয়ে নানা রকম পরীক্ষা করতেন। কি এক বিদঘুটে যন্ত্র! এটাই ছিল আমার প্রথম দেখার প্রতিক্রিয়া। এটা ছিল যেমন বড় তেমনি ভারি। অন্য শেরপরা তা দেখে হাসাহাসি করত আর বলত 'সাহেবী হাওয়া'। এটা কতটা আরাম দেবে জানিনা তবে বয়ে বেড়ানো এক যন্ত্রণা। পরবর্তী সময়ের অভিযানে অনেক ছোট আকারের সিলিন্ডার ব্যবহার হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে রংবুকের মঠে এসে আমাদের এবারের অক্সিজেন সিলিন্ডারের এক বিচিত্র ব্যবহার লক্ষ্য করলাম। মঠের বারান্দায় সেটা ঘন্টার মত ঝোলানো আছে। সন্ধ্যে বেলা এটাতে ঘন্টা বাজিয়ে ভিক্ষু ভিক্ষুনীদের নিজ নিজ ঘরে ফেরার নির্দেশ দেওয়া হয়।

ধীরে ধীরে আবহাওয়া খারাপ হয়ে আছে, নেমে যাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। কিন্তু নামব বললেই তো আর নামা যায় না। এর মধ্যে ব্যাপক তুষারপাত শুরু হল। সব সময়েই ভয় এই বোধহয় হিমানী সম্প্রপাত ঘটে যাবে। এরই মধ্যে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত এক দুর্বিপাক। নর্থকলের শিবিরে সকালবেলা আমি তাঁবুতে তাঁবুতে ঘুরে চা দিচ্ছি, পাশাং ভুটিয়ার তাঁবুতে এসে দেখি সে কেমন অস্বাভাবিক ভাবে শুয়ে আছে। আমি তার হুঁশ ফেরাবার জন্যে অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু তার বিহ্বলতা কাটল না। এরিক শিপটন তখন শিবিরের দায়িত্বে।

তাকে সুস্থ করার জন্যে তিনি অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না। পাশাং-এর পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। এই সময় টিলম্যান ওপরের শিবিরে ছিলেন। নেমে এসে তিনি বরফের ঢাল বেয়ে বহু কষ্টে পাশাংকে মূল শিবিরে নামিয়ে আনলেন। বহুদিন পরেও সে সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারেনি। এই একটাই দুর্ভাগ্য ছুঁয়ে গেছে এবারের অভিযানকে—অবশ্য ব্যর্থতার দায়ও কিছু কম নয়। তবে এর ভাল দিকও ছিল। আগেই বলছি টিলম্যান সরকারী ভাবে প্রথম 'টাইগার' উপাধির প্রচলন করেন। যে সমস্ত শেরপারা এবারের অভিযানে ছ' নম্বর শিবির পর্যন্ত গিয়েছিল সরকারী ভাবে তাদেরই প্রথম টাইগার উপাধি ও পদক দেওয়া হল। প্রথম টাইগারদের মধ্যে নিজের নাম দেখতে পেয়ে আমরা খুশি মনে দার্জিলিং ফিরলাম। এর পর থেকে টাইগার উপাধি দেবার দায়িত্ব বর্তেছে ভারতে পর্বতাভিযানের মূল সংস্থা হিমালয়ান ক্লাবের স্কন্ধে। এবারের অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। সামনে ১৯৩৯ এবং ৪০, দেখা যাক কি হয়।

কিন্তু আমি জানিনা বাইরের দুনিয়ায় তারপর কি এমন ঘটল যে দীর্ঘ চোদ্দ বছর আমাদের অপেক্ষা করতে হল আমাদের প্রিয় চোমোলোংমার কাছে যাবার জন্যে।

বিশ্বযুদ্ধের দিনগুলি

একজন নাবিকের সঙ্গে একজন শেরপার খুব মিল আছে। তাদের কাছে সুসময় মানে কাজের উদ্দেশ্যে নিশ্চিন্ত গৃহকোণ থেকে দূরে বহু দূরে চলে যাওয়া। একজন শেরপা রমনীর কাছে এটা কোনও উদ্বেগের ব্যাপার নয়, কারণ সে জানে তার স্বামী কোথায় গিয়েছে।

১৯৩৮ সালের গোড়ায় আমি প্রথম গাড়োয়াল গিয়েছিলাম। এখন আবার মেজর ওসমাস্টনের সঙ্গে জরীপের কাজে আলমোড়া যাচ্ছি। ভারতের উত্তর সীমান্তে যুগপৎ তিব্বত এবং পশ্চিম নেপালের সীমান্ত মিলেছে এই আলমোড়া জেলায়। আলমোড়ার কিছু কিছু অঞ্চল অত্যন্ত দুর্গম, আমাদের আগে বাইরের খুব কম লোকই এসেছে এই সব অঞ্চলে। জরীপের কাজে আমরা মাঝে মাঝে তিব্বত সীমান্তে পৌঁছে যেতাম, যেখান থেকে কৈলাস পর্বত দেখা যায়। যদিও কৈলাসের উচ্চতা মাত্র বাইশ হাজার ফুট তবু এর সৌন্দর্য অতুলনীয়, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের লোকেরা একে হিমালয়ের যে কোনও পর্বত শীর্ষের চেয়ে বেশি পবিত্র মনে করে। এর ঠিক পায়ের নিচেই পবিত্র মানস সরোবর, বহু দূর দূরান্তের ধর্ম পিপাসুরা এই পবিত্র স্থান দর্শন করতে আসে। আমারও খুব ইচ্ছে করে যদি একবার ঐ স্থানে যাবার সুযোগ পাই।

মেজর ওসমাস্টন একজন দক্ষ পর্বতারোহী। এবারে তিনি এসেছেন হিসাব করে পর্বতশীর্ষের উচ্চতা নির্ণয় করে তা ম্যাপে লিখে রাখার জন্যে। আমি ছাড়াও চোদ্দ জন বিভাগীয় কর্মচারী একগাদা মালবাহক নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে দলটি দু মাস কাটিয়ে দিল ঐ অঞ্চলে। তারপর দার্জিলিং ফিরে পুরো শীতকালটা স্ত্রী দাওয়া ফুটি আর তিন বছরের ফুটফুটে ছেলে নিমাকে নিয়ে আনন্দে কাটালাম। এই বছরেই আমাদের দ্বিতীয় সন্তান পেম পেম-এর জন্ম হল। পুত্র নিমাকে নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন। ওকে আদর করে বলতাম, "বাবা, আমি যখন অনেক বুড়ো হব আর পাহাড়ে যেতে পারব না তখন তুই আমার জায়গা নিবি আর সর্বশ্রেষ্ঠ টাইগার হবি।"

১৯৩৯-এর বসন্তকালে নতুন অভিযানের আমন্ত্রণ পেলাম। এক কানাডিয়ান মহিলা বেরিল স্মিটন দার্জিলিং-এর হিমালয়ান ক্লাবে শেরপার খোঁজ করলেন। কাছে পিঠে নয়, তিনি যাবেন ভারতের উল্টো দিকে তিরিচ মির পর্বত অভিযানে। তিরিচ মির হিমালয় এলাকার বাইরে সিন্ধু নদী পার হয়ে আফগান সীমান্তের হিন্দুকুশ পর্বতমালার অংশ। দূরত্বটা আমার কাছে বিচার্য নয়, নতুন জায়গা দেখতে পাব এটাই বড় কথা। সিদ্ধান্ত নিলাম আমিও যাব আর তাই কয়েকজন শেরপার সঙ্গে দলে ঢুকে গেলাম। এখন ভেবে দেখছি যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ভালই করেছিলাম না হলে পরের ছটা বছর আমার কাছে হয়ত অন্যরকম হতে পারত।

প্রথমে আমরা পাঞ্জাবের লাহোর পৌঁছলাম। সেখানে মিসেস স্মিটনের স্বামী ক্যাপ্টেন স্মিটন এবং তাঁদের বন্ধু ওজিল (Ogil) এর সঙ্গে মিলিত হলাম। এরপর আমরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের চিত্রল বলে একটা জায়গায় এলাম। এই প্রদেশ এখন পাকিস্তানের অন্তর্গত। এখান থেকে আমাদের বাকি কাজ সমাধা করে পঁচিশ হাজার দুশো যাট ফুট উচ্চতার তিরিচমিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। দলটি তুলনামূলক ভাবে ছোট, সাজ সরঞ্জামের

অভাব রয়েছে, তার সঙ্গে মিশেছে তীব্র হাওয়া এবং প্রচন্ড ঠাণ্ডা; যে কোনও সময়ে তুষারক্ষত হবার ভয়। এতসব প্রতিকূলতার মধ্যেও আমরা তেইশ হাজার ফুট পর্যন্ত উঠতে সক্ষম হলাম। সঙ্গে ভাল সরঞ্জাম থাকলে হয়ত সফল হতাম। তবু আমরা দুঃখ পেলাম না, কারণ এবারের অভিযান সফল হওয়ার চেয়ে নতুন জায়গা দেখার ইচ্ছেতেই সংগঠিত হয়েছিল। মিসেস স্মিটন একজন দক্ষ পর্বতারোহী, তিনি পুরো অভিযানে সকলের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছিলেন। এই তিরিচ মির অভিযানেই আমি প্রথম শেরপা সর্দারের দায়িত্ব পালন করেছিলাম। তবু ১৯৪৭ সালের আগে সরকারী ভাবে সর্দারের স্বীকৃতি পাই নি।

জুলাই মাসের প্রথমে অভিযান সমাপ্ত করে অন্য শেরপারা দার্জিলিং ফিরে গেল কিন্তু আমি চিত্রলেই থেকে গেলাম। অভিযানের শুরুতে মেজর হোয়াইট বলে এক সাহেব আমাদের প্রচুর সাহায্য করেছিলেন, তিনি চিত্রলস্থিত ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর স্কাউট শাখার অধিকর্তা। আমার সঙ্গে তাঁর একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তিনি আমাকে চিত্রলে থেকে যেতে অনুরোধ করলেন। আমি থেকে গেলাম, ইচ্ছে ছিল কয়েকমাস কাটিয়ে দার্জিলিং ফিরে যাব। কিন্তু এখানে আমার এতই ভাল লেগে গেল যে কোথা দিয়ে একটা বছর কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না।

১৯৪০ এর প্রথম দিকে দার্জিলিং থেকে খবর এল দূষিত জল খেয়ে আমার ছেলে রক্ত আমাশায় মারা গেছে। নিমা দোরজী! আমার ছেলে—মাত্র চার বছরেই সব শেষ হয়ে গেল। দার্জিলিং এর জন্যে মনটা কেঁদে উঠল। মেজর হোয়াইটকে মনের কথা বললাম। এর মধ্যে আমার আরও একটা মেয়ে হয়েছে, তারও নাম রাখলাম নিমা। দার্জিলিং এসে দুই মেয়ে এবং স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আবার চিত্রল ফিরে এলাম। এর মধ্যে ইউরোপে যুদ্ধ লেগেছে, হিমালয়ে এখন অভিযান বন্ধ, তাছাড়া চিত্রল আমার খুব ভাল লেগেছে।

আমাকে ফিরে আসতে দেখে মেজর খুব খুশি হলেন। এরপর কয়েক মাস তাঁর অফিসে আর্দালির কাজ করলাম। কিছুদিন পরে তিনি আমাকে চিত্রল স্কাউটের অফিসার মেসে একটা চাকরী জোগাড় করে দিলেন। এখানে থাকতে থাকতে ইউরোপীয় আদব কায়দা রপ্ত করলাম, রাঁধুনী হিসাবে খ্যাতি পেলাম। কালক্রমে মেসের সমস্ত কর্মচারীর ওপরওয়ালা হিসেবে পদোন্নতি হল। মেস চালানোর অভিজ্ঞতা থেকে বুঝলাম ভবিষ্যতে রুজীর জন্যে একটা হোটেল চালানো আমার পক্ষে কঠিন হবে না।

আমাদের রেজিমেন্ট উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়ায় কাজেই আমাদের পক্ষে এক জায়গায় বেশি দিন থাকা সম্ভব হত না। মেজর হোয়াইট আমাকে ছেলের মত ভালবাসতেন, সব সময়েই আমাকে ভাল খাবার, সুন্দর সুন্দর জামাকাপড় উপহার দিতেন। আর যখনই বেড়াতে যেতেন সব সময় আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এই সময় পর্বতারোহণের কোনও সুযোগ আমার ছিল না কিন্তু শীতকালে কাশ্মীরে স্কী করার সুযোগ পেতাম। স্কী করতে আমার খুব ভাল লাগত। স্কীর যে গতি তো রেলগাড়ির গতিকেও হার মানায়। মেজর সাহেব বলতেন, দেখ এই স্কী করা একদিন পর্বতারোহণকালে তোমার কাজে লাগবে। স্কী করার জন্যে আমরা উঁচু পাহাড়ে যেতাম না, ছোট ছোট টিলায় অভ্যাস করতাম। একদিন এইভাবে অভ্যাস করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়লাম আর তাতেই

পাঁজরের হাড় ভেঙে গেল, হাঁটুতে খুব চোট পেলাম।

চিত্রলে আমি ছাড়া অন্য কোনও শেরপা এমনকি কোনও নেপালী পর্যন্ত ছিল না। স্বজনবর্জিত দেশে মাঝে মাঝে আমার খুব একা লাগত আর প্রকারান্তরে এটাই আমাকে সাহায্য করেছিল অচেনা জগতের সঙ্গে মানিয়ে নিতে। চিত্রলে আমি ইংরেজ, ভারতীয়, তুর্কী, আফগান এমন হরেক দেশের নানা ধরনের মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলাম। ইংরাজী, হিন্দি, পস্তু, চিত্রলী, হিন্দুস্তানী ভাষাও রপ্ত করে নিলাম। জীবনের চাকা দ্রুত গড়িয়ে চলেছে । দেশের কথা, দার্জিলিংএর ভাবনা এখন আর আমাকে সেভাবে আচ্ছন্ন করে না। এমন হল যে আমার প্রিয় চোমোলোংমার কথাও আর তেমন করে মনে পড়ে না। একদিন মেজর হোয়াইটের কাছে আমার নামে একটা চিঠি এল। তার থেকে জানতে পারলাম ১৯৩৮ এর এভারেস্ট অভিযানে কৃতিত্বের জন্যে আমি টাইগার পদক লাভ করেছি । অবশ্য পদক হাতে এল ১৯৪৫ সালে, আমি তখন দার্জিলিং-এ।

ক্রমশ যুদ্ধের পরিধি বাড়ছে। রেডিওতে প্রতিদিন পৃথিবীর নানা দেশে যুদ্ধের গতি-প্রকৃতির কথা শুনি। আমি এই প্রথম জানলাম যে পৃথিবীতে ইংরেজ ছাড়াও আরও অনেক জাতি আছে। যুদ্ধের কথা শুনতে শুনতে মনে হত আমার উচিত ছিল সৈন্যদলে যোগ দেওয়া। আবার পর মুহূর্তে ভাবতাম স্কাউটে থাকলেও তো প্রকারান্তরে সৈন্যদলেই থাকা। এদিকে যুদ্ধ চলাকালীন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হচ্ছে। তার ঢেউ এখানেও আসছে, শুনছি ভারতবর্ষ দুটো ভাগ হবে। দ্বিতীয়টা হবে পাকিস্তান। এখানে বেশির ভাগ লোক মুসলমান। এবার হিন্দু মুসলমান অশান্তি শুরু হল। আমি যেহেতু হিন্দু অথবা মুসলিম কোনও সম্প্রদায়ের নই তাই আমাকে কোনও সমস্যায় পড়তে হল না। রাজনীতি সম্বন্ধে কোনও দিনই জ্ঞান ছিল না। আমার একটাই উদ্দেশ্য ছিল, আর তা হল নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করে যাওয়া।

চিত্রলে ধনী হবার একটা সুযোগ এসেছিল আমার আর তাও জানলাম অনেক পরে। কি রকম? চিত্রলের আশেপাশে অনেক দামি পাথর পাওয়া যায়, পাথরগুলো যে দামি আমি তো কোন ছাড় সেখানকার অধিবাসীরাও জানত না। আমি দেখেছি বাইরে থেকে লোক এসে এদের কাছ থেকে বস্তা করে ঐ পাথর নিয়ে যায়, পরিবর্তে হয়ত এক ব্যাগ চা দেয় বা ঐ জাতীয় কিছু। আমি দার্জিলিং আসার সময় কৌতূহলবশত ঐ রকম কয়েকটা পাথর সঙ্গে এনেছিলাম যা দেখে সেখানকার কিছু ব্যবসায়ী উত্তেজিত হয়ে আমার কাছে জানতে চায় যে এইসব দামী পাথর আমি কোথা থেকে পেলাম। তখন চিত্রল অনেক দূর—পাকিস্তানে। আমার বন্ধুবান্ধব আমাকে প্রচুর উৎসাহ দিল সেখানে গিয়ে ঐ পাথর পাঠাবার জন্যে। হয়ত আমার পক্ষে তা সম্ভব হত এবং প্রচুর টাকা রোজগার করতে পারতাম কারণ মেজর হোয়াইট তখনও চিত্রলে রয়েছেন। জীবনে যেন তেন প্রকারে ধনী হওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, অন্যভাবে সফল হওয়াটাই আমার একমাত্র কাম্য, তাই সে চেষ্টা আমি করিনি।

চিত্রলে মেজর হোয়াইট ছাড়া ডাঃ এন. ডি. জেকিল নামে এক সিভিল সার্জেনের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তিনি অন্য আর পাঁচটা ইংরেজের মত রুক্ষ স্বভাবের ছিলেন না পরন্তু দয়ালু ছিলেন। বিশেষ করে আমার স্ত্রী কন্যাদের প্রতি স্নেহশীল ছিলেন। তিনি আমার সঙ্গে

এমন ব্যবহার করতেন যেন আমি এক মহারাজা কিম্বা মেজর জেনারেল। ১৯৫৩ সালে আমার লণ্ডন ভ্রমণের সবচেয়ে আনন্দের স্মৃতি ছিল আবার তাঁর দেখা পাওয়া। আমি শুনে অবাক হয়ে গেলাম যখন শুনলাম পাঁচশ মাইল পথ পার হয়ে তিনি আমাকে দেখতে এসেছেন। শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে এল।

ডঃ জেকিলের সঙ্গে আমার জীবনের এক করুণ ইতিহাস জড়িয়ে গেছে। চিত্রলে এসে আমার স্ত্রী দাওয়া ফুটি প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ত। এখানকার জল হাওয়া তার সহ্য হচ্ছিল না। ডাঃ জেকিল সাধ্যমত তাকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করতেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না। তার শরীর দিন দিন খারাপ হচ্ছে। অবশেষে তাঁর সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল—১৯৪৪ সালে এখানেই সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল। আমার কাছে এ এক অসহ্য শোক। পাঁচ বছরের পেমপেম আর চারবছরের নিমা সদ্য মাতৃহারা হয়ে আমাকে দিশেহারা করে তুলল। আমার কন্যাদের দেখাশুনা করার কেউ নেই। একজন আয়া রাখলাম তাদের দেখাশুনা করার জন্যে, সেও তাদের যত্ন নেয় না। তখন বাধ্য হয়ে ১৯৪৫ এর গোড়ায় ঠিক করলাম আমি দার্জিলিং ফিরে যাব। এই ক' বছরে পনেরো'শ টাকা জমিয়েছি, যথেষ্ট সঞ্চয়। তখন পুরোদমে যুদ্ধ চলছে, গাড়ি পাওয়াটা সমস্যা। কোনও মতে একটা ঘোড়া যোগাড় করে তার পিঠের দুদিকে দুটো থলি ঝুলিয়ে দিলাম। মেয়েদের ঘোড়ার পিঠের থলিতে বসিয়ে চিত্রল থেকে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে দার বলে একস্থানে নিয়ে এলাম। দারে ট্রেন চলে কিন্তু ভিড়ের চাপে ট্রেনে চড়ে কার সাধ্য। পরপর কদিন চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। মেয়েদের কথা চিন্তা করে আমি অস্থির হয়ে পড়লাম। যেভাবেই হোক আমাকে গাড়িতে উঠতেই হবে। মেজর হোয়াইট অনেকদিন আগে আমাকে একজোড়া মিলিটারী পোশাক দিয়েছিলেন, সেটা তখনও আমার কাছে রয়েছে। মেজরের স্টারগুলো তখনও জামায় তেমনি আছে। পোশাকটা আমার সঙ্গেই আছে, মনে পড়ে গেল। সেই পোশাক পরে গম্ভীর মুখে এক প্রথম শ্রেণী কামরার দিকে এগিয়ে গেলাম সঙ্গে মেয়েরা। কেউ আমাদের বাধা দিল না, বিনা বাধায় একটি পয়সাও খরচ না করে আমি ট্রেনে চেপে ভারবর্ষের একপ্রান্ত থেকে এক আর এক প্রান্ত শিলিগুড়ি পৌঁছে গেলাম। শিলিগুড়ি আসবার আগে আমি আমার পোশাক বদলে নিলাম, পরিচিত লোকেদের হাতে ধরা পড়ে বেআইনী কাজের জন্যে আমি জেলে যেতে চাই না। শিলিগুড়ি থেকে বাসে চেপে ছ'বছর বাদে আবার দার্জিলিং।

দেশের লোক আমার কিম্ভূত পোযাক, আদবকায়দা আর কথা বলার ঢং দেখে হেসে বাঁচে না। তারা আমাকে পাঠান বলে ডাকতে শুরু করল, যেমনটি বলা হয় উত্তর পশ্চিম সীমান্তের অধিবাসীদের। যদিও চিত্রলে আমি ভালই ছিলাম তবু আপনজনদের মাঝে ফিরে আসতে পেরে আমি খুশি। সমস্যা থেকেই গেল, একজন পুরুষ মানুষের পক্ষে বাচ্চা সামলানো যে কি কঠিন কাজ তা বুঝতে পারছি। বন্ধু বান্ধব পরামর্শ দিল অন্তত বাচ্চাগুলোর জন্যেও আবার বিয়ে কর। ঠিক আছে, কিন্তু মেয়ে কোথায়। অবশেষে খুঁজে পেতে মেয়ে পাওয়া গেল আং লামু। আরে এত সেই মেয়ে, আমার দার্জিলিং আসার প্রথম দিকে দুধ বেচতে গিয়ে যার সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া হত। পরে আরও জানা গেল আং লামু দাওয়া ফুটির সম্পর্কে মামাতো বোন। মেয়েরা তাদের মাকে খুঁজে পেল, আমি মুক্তি পেলাম।

পাহাড় আজও সেখানেই আছে

বিয়ের দু'সপ্তাহের মধ্যে আমি আবার পর্বতারোহণের জন্যে বেরিয়ে পড়লাম। আমার আশঙ্কা ছিল আমার স্ত্রী এর জন্যে রেগে যাবে। কিন্তু সে শান্ত মনে মেনে নিল, এটাই হল একজন শেরপা রমণীর বৈশিষ্ট্য।

বহু দিন পরে আমার প্রথম সফর। খুব বড় নয়, এমন কি পর্বতারোহণ সংক্রান্তও কিছু নয়। তখনও যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধের কারণেই কিছু আমেরিকান তখন ভারতে রয়েছে। এদের মধ্যে একজন হল লেঃ কর্ণেল এইচ. টেলর। তিনি তিব্বতে যাবার একটা অনুমতি যোগাড় করেছেন, আমি সহযোগী। দুটো ঘোড়া নেওয়া হল আমাদের দুজনের জন্যে। কয়েকটা খচ্চরের পিঠে মালপত্র চাপিয়ে সিকিম থেকে বিভিন্ন গিরিবর্ত্মের ঝোড়ো হাওয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের যাত্রা হল শুরু। সিকিম পার হয়ে আমরা তিব্বতের নিকটতম শহর জনংসে পৌঁছলাম। যদিও এভারেস্ট অভিযানে আমি রংবুক পর্যন্ত গিয়েছি তবু এবারে অনেকদিন পরে তিব্বতে আসতে পেরে আমার ভাল লাগছে। দেখলাম কর্ণেল টেলরও বেশ মজা পাচ্ছেন। তার ব্যবহারটা সব সময়েই যথেষ্ট অন্তরঙ্গ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ। তিনি আমার কাছে প্রতিশ্রুতি আদায় করলেন যে আমি একবার আমেরিকা যাব এবং তখন তিনি আমাকে জীপ চালাতে শেখাবেন। আর তখন থেকেই আমার মনে জীপ কেনার স্বপ্ন জাগল। যদি কখনও পয়সা হয় তবে একটা জীপ গাড়ি কিনব যেটা দার্জিলিং এর রাস্তার পক্ষে উপযুক্ত। এবার আমরা দশমাস তিব্বতে ছিলাম। অন্য আমেরিকানদের মতই কর্ণেল টেলর হাঁটার চেয়ে ঘোড়ায় চাপতেই বেশি পছন্দ করতেন। দার্জিলিং ফিরে তিনি আমাকে দুশো টাকা বখশিষ দিয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষে তিনি আমেরিকা চলে গেলেন, পিছনে রেখে গেলেন আমার জন্যে জীপ কেনার স্বপ্ন। টিপ্‌স থেকে জমানো টাকায় দুটো ঘোড়া কিনলাম — মাল বইবার কাজে লাগবে। অন্য শেরপারা যখন পাহাড়ের উঁচুনিচু পথে সারাদিন মাল বওয়ার কঠিন পরিশ্রম করছে আমি তখন দুপুরের মধ্যে সব কাজ সেরে বাড়ি চলে যেতাম। তবে বসে থাকা আমার ধাতে সয় না, পরিশ্রম করতে না পারলে আমার ভাল লাগে না। যুদ্ধের আগের দিনগুলোর মত ভ্রমণার্থী আর পর্যটকদের নিয়ে টাইগার হিলে যাওয়া শুরু করলাম। এইভাবে একদিন আমি সাতজন আমেরিকান মহিলাকে নিয়ে টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখতে গিয়েছি। আমার মত আরও অনেক গাইড পর্যটকদের নিয়ে গেছে। যে চূড়োটাকে তারা এভারেস্ট বলে দেখাচ্ছে আসলে তা সত্যি নয়। এরকম মিথ্যা কথায় আমি খুব লজ্জা পেলাম। টাইগার হিল থেকে লোৎসে এবং মাকালুর পিছনে এভারেস্টকে ছোটই দেখায়, মাকালুকেই এভারেস্ট বলে ভুল হয়। পর্যটকদের যেমন দেখানো হবে তারা তাই বুঝবে, কাজেই ওরাও মাকালুকে এভারেস্ট বলে মনে করছে। আমি এমন মিথ্যে বলতে পারব না। আমি মহিলাদের আসল এভারেস্ট দেখানোর চেষ্টা করলাম এবং কেন সেটাকে ছোট দেখাচ্ছে সেটা বুঝিয়ে দিলাম। তাঁরা আমার ব্যবহারে এতই খুশি হয়েছিলেন যে পরে তাঁরা তাঁদের দেশের বন্ধুবান্ধবদের আমার ঠিকানায় পাঠাতেন।

দার্জিলিং ভারি মজার জায়গা, এখানে সব সময়েই নানা দেশের মানুষজনের দেখা পাওয়া যায়। একদিন সকালে আমি চৌরাস্তায় হাঁটছি দেখি মিসেস পিটা আসছেন, সঙ্গে একজন

অপরিচিত ভদ্রলোক। তিরিচ মির অভিযানের পর এই আমাদের প্রথম দেখা, পরস্পরকে দেখে আমরা খুব খুশি হলাম। ভাবছি মিসেস স্মিটন কখন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবেন। পরে আমার লজ্জার একশেষ। ইনিই মিস্টার স্মিটন। যুদ্ধের সময় বোমার টুকরোয় তাঁর মুখের চেহারাটা আমূল বদলে গেছে এবং স্বামী-স্ত্রী অত্যন্ত আন্তরিক। জোর করে একদিনের জন্যে আমাকে কালিম্পং নিয়ে গেলেন।

মাঝে মাঝে পর্যটকদের নিয়ে টংলু, সান্দাকফু, ফালুট চলে যেতাম। পর্যটকরাই যে শুধু আমাদের কাছে অনেক কিছু জানতে পারত তাই নয় আমিও তাঁদের সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখতাম। একবার এক ইংরেজ দম্পতিকে নিয়ে টংলু গিয়েছি। ভদ্রমহিলাকে দেখতে ভারি সুন্দর, বিশেষ করে তাঁর ঝকঝকে দাঁতের বাহার। আমরা টংলুর বাংলোতে রাত্রিযাপন করলাম। যথারীতি সকালে উঠে গরম জল করে তাঁদের দিতে গেছি, মনে হল মেমসাহেব আমাকে দেখে উঠে বসলেন। কাছে গিয়ে আমি হতবাক। এ কিরে বাবা! কোনও বাংলোয় এলাম? এ তো কোনও অল্পবয়স্কা সুন্দরী নয়। ফ্যাকাসে হলুদ চামড়া, ফোকলা দাঁত। চেয়ে দেখি টেবিলে কিছু ক্রিম জাতীয় জিনিস, একটা কাচের জারে দুপাটি ঝকঝকে বাঁধানো দাঁত জলে ডোবানো। গরম জল সেখানেই নামিয়ে দিয়ে কোনওরকমে পালিয়ে এলাম। কিছুক্ষণ পর মেমসাহেব বেরিয়ে এলেন, যথারীতি অল্পবয়স্কা এক সুন্দরী মহিলা।

অনেক ভালো বছর পার হয়ে গেছে পাহাড়ে যেতে না পেরে হাঁপিয়ে উঠেছি। এমন সময় ১৯৯৬ সালে ডন স্কুলের পুরনো বন্ধু মি. গিবসন এবং মি. মার্টিন-এর কাছ থেকে ডাক পেলাম। তারা বন্দরপুঞ্ছ অভিযানে চলেছে। জানতে চেয়েছে আমি যেতে রাজি আছি কিনা। নিমন্ত্রণ পেয়ে আমি ছেলেমানুষের মত উল্লসিত হয়ে উঠলাম। হিমালয় ছাড়া আমি কিছুই ভাবতে পারি না। আবার পর্বত অভিযানে যাচ্ছি ফিরে যাব সেখানে, যেখানে জন্মেছি আমি। কথা অনুযায়ী গাড়োয়ালে এসে দলের সঙ্গে যোগ দিলাম। এবার দলে আগের দুজন ছাড়াও রয়েছেন মি. আর এল হোল্ডসওয়ার্থ যিনি ১৯৩২ সালে কামেট অভিযানের সদস্য ছিলেন, রয়েছেন রয়াল আর্টিলারির মেজর মুনরো আর রয়েছেন ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর লে. এন ডি জয়াল। পরবর্তী সময়ে লে. জয়ালের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এবারেও বন্দরপুঞ্ছ আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। খারাপ আবহাওয়া এবং ব্যাপক তুষারপাতের জন্যে আঠার হাজার ফুটের বেশি উঠতে পারলাম না। ফিরে আসার সময় গিবসন বললেন, ঠিক আছে আবার ফিরে আসব, বাঁদরের ঐ লেজ একদিন ধরবই। আমি হেসে ফেললাম। ওটা কি আর এখন বাঁদরের লেজ আছে? ওটা এখন ডুন স্কুলের পর্বত হয়ে গেছে।

আমার ঘরের কাছে, দার্জিলিং-এর কাছেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম পর্বতশীর্ষ কাঞ্চনজঙ্ঘা। জীবনের অর্দ্ধেকটাই কেটে গেছে আমার এর কাছে থেকে, অথচ আমি কখনই কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানে অংশ নিইনি। কতবার এভারেস্ট অভিযানে গেলাম, গাড়োয়ালে গেলাম, বহু দূরে কাশ্মীর, কারাকোরাম আর সুদূর চিত্রলে গেলাম অথচ ভাগ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানে যাবার সুযোগ আসেনি। ১৯০৫ সালে সুইজারল্যান্ডের একটা ছোট দল এই আরোহণের চেষ্টা চালাতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। তারপর বহু বছর বাদে ১৯২৯ সালে ফারমার নামে এক আমেরিকান যুবক একদম একা কাঞ্চনজঙ্ঘা শীর্ষে আরোহণের

প্রচেষ্টা চালিয়ে নিখোঁজ হয়; যেমনটি হয়েছিল এভারেস্ট অভিযাত্রী উইলসনের ক্ষেত্রে। ১৯২৯ থেকে ১৯৩১ এর মধ্যে তিনটি বড় মাপের অভিযান হয়, এর মধ্যে দুটি দল জার্মান এবং একটি সুইস। ১৯৩০ এর সুইস অভিযাত্রী দলটি তাদের অভিযান শুরুর গোড়াতেই এক ভয়ঙ্কর হিমানী সম্প্রপাতের সম্মুখীন হয়ে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছিল। ভীষণ সেই হিমানী সম্প্রপাত দেখে মনে হয়েছিল বোধহয় সমস্ত পাহাড়টা ভেঙ্গে পড়বে. কিন্তু এক হতভাগ্য শেরপার জীবন নিয়ে সে বাকি সকলকে আশ্চর্যজনকভাবে নিষ্কৃতি দিয়েছিল। ১৯২৯ এবং ১৯৩১ এর জার্মান দল সিকিমের জেমু হিমবাহের পথে অগ্রসর হয়েছিল। প্রথমবার তারা নর্থ ইষ্ট স্পার এর মাথায় ওঠার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত দ্বিতায়বারে বহু প্রচেষ্টার পর ঐ স্পারের মাথায় ছাবিবশ হাজার ফুটের বেশি উচ্চতায় পৌঁছে যায়। সে বছর একজন র্জামান অভিযাত্রী এবং একজন শেরপা মারাও গিয়েছিলেন। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত কাঞ্চনজঙ্ঘা শীর্ষে আরোহণের জন্যে আর কোনও রকম প্রচেষ্টা চোখে পড়েনি। (বইটা যখন ছাপার জন্যে পাঠানো হয়েছে তখন ১৯৫৫ সালের মে মাসে ডঃ চার্লস ইভান্সের নেতৃত্বে একটি বৃটিশদল কাঞ্চনজঙঘা আরোহণ করে—র‍্যামজে উলম্যান)

যদিও কাঞ্চনজঙ্ঘা দার্জিলিংএর খুব কাছে এবং সহজেই এর মূল শিবিরে পৌঁছনো যায় কিন্তু এখানকার আবহাওয়া অস্থির এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব বেশি। পাহাড় সদা সর্বদাই মেঘে ঢাকা, চূড়া দেখাটাই মুশকিল। আর অন্য ঋতুতে এখানকাব গরম হাওয়া মেঘ এবং তুষারের সংস্পর্শে এসে বড়বড় তুষার ধসের সৃষ্টি করে। কাঞ্চনজঙঘাকে ঘিরে কাব্রু, জানু, সিম্ভু, জোনসং, কাং, কোকতাং, এবং পাণ্ডিমের মত পর্বতগুলি বিরাজ করছে। এর মধ্যে অনেকগুলোতেই সফল অভিযান সংগঠিত হয়েছে।

কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযান যতই শক্ত হোক পৃথিবীর এই তৃতীয বৃহত্তম পর্বত সম্বন্ধে পর্বতারোহীরা খুব বেশি দিন উদাসীন থাকতে পারবে না। এর মধ্যেই বেশ কয়েকটি অনুসন্ধানমূলক অভিযান হয়ে গেছে। যদিও আমি নিজে কখনও কাঞ্চনজঙঘা অভিযানে অংশগ্রহণ করিনি তবে বেশ কয়েকবার এর কাছাকাছি গিযেছি। ১৯৩৫ সালে কাব্রু অভিযানে গিয়েছি।

এবছর, ১৯৪৬ সালে গাড়োয়াল থেকে ফিরে দুবার ওদিকে যাওয়া হয়ে গেছে। ১৯৪৬ সালে প্রথম যাত্রায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ভাবতীয় সৈন্যবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত মেজর। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জেমু এবং ইয়ালুং হিমবাহ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করা। জেমু গ্যাপ পর্যন্ত উঠে এসে বুঝেছিলাম কি ভয়ঙ্কর বিপদসঙ্কুল এই অঞ্চল। যে কোনও দল এসেছে এই জেমু গ্যাপ অঞ্চলে তারা কোনও না কোনও দুর্ঘটনায় পড়েছে, আর কাউকে প্রাণও দিতে হয়েছে। দুর্ঘটনায় পতিত এমনই একটা দল হল কাপ্টেন লাংটন স্মিথের পরিচালনায় সুগার লোফ অভিযান। এই দলটির সকলেই তুষার ঝড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

অন্য একটি অভিযানে বেঙ্গল ল্যাম্পের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে. সি. রায় নামে এক অভিযাত্রী নিখোঁজ হয়ে যান। আমরা ঐ অঞ্চলে যাচ্ছি শুনে মিঃ বায়ের আমেরিকান স্ত্রী আমাদের সঙ্গে দেখা কবেন এবং অনুরোধ করেন যদি আমরা তাঁর কোনও স্মৃতি চিহ্ন নিয়ে আসতে পারি। তাই অভিযান চলাকালীন আমরা চোখ খুলে রেখেছিলাম যদি কোনও কিছু

পাওয়া যায়। প্রথমে আমরা কাপ্টেন স্মিথের দলের একজন শেরপার মৃতদেহ খুঁজে পেলাম। গ্রীন লেকের কাছে একটা পাথরের ফাঁকে সেটা পাওয়া গেল। তার হাতের কাছে রয়েছে একটা রান্নার কড়াই আর কিছু পোড়া কাঠকয়লা। এখানেই কাছে পিঠে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে অনেকগুলো ফটোগ্রাফিক ফিল্মের খাপ পড়ে আছে। এগুলি অবশ্যই ক্যাপ্টেন স্মিথের। কিন্তু ক্যাপ্টেন স্মিথ অথবা তাঁর বাকি সদস্যদের কোনও সন্ধান পেলাম না। এই গ্রীন লেক অঞ্চলে অনেকগুলো ছোট ছোট জলাশয় আছে যার অনেকগুলোই নরম বরফে ঢাকা। আশঙ্কা হয় ভুল করে এর কোনও একটার ওপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে তাদের সলিল সমাধি হয়েছে। কিছু দিন পর সেখান থেকে ফেরার পথে গ্রীন লেকের ধারে মিঃ রায়ের দেহ খুঁজে পেলাম, কেউ বোধহয় কবর দেবার চেষ্টা করেছিল। আমরা আবার নতুন করে তাঁর দেহ কবর দিলাম। হাত থেকে খুলে নিলাম ঘড়িটা, স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে সেটা তাঁর স্ত্রীকে ফেরত দিতে হবে।

বাড়ি ফিরে স্থির হয়ে বসবার আগেই ক্যাপ্টেন জে. ডব্লিউ. থর্ণলের কাছ থেকে ডাক এল, আবার জেমু হিমবাহে যেতে হবে নতুন করে কাপ্টেন স্মিথের অনুসন্ধানে। সঙ্গে আরও ছ'জন শেরপা। হিমবাহ অঞ্চলে পৌঁছে ছোটছোট দলে ভাগ হয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়েও কোনও সন্ধান পেলাম না। তবে ইয়েতি সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করলাম। এবং এই সুযোগে ইয়েতি সম্বন্ধে মানুষের যে কৌতূহল তাব যতটা আমি জেনেছি এবং শুনেছি তা এখানে ব্যক্ত করব। এই ১৯৫৬ সালেই জেমু হিমবাহ অঞ্চলে অদ্ভুত সব পায়ের ছাপ দেখেছি যেটাকে ইয়েতির পায়ের ছাপ বলা হচ্ছে। আবার ১৯৫২ সালের সুইস এভাবেস্ট অভিযানে মূল শিবিরের কাছে ঐ ধরনের পায়েব ছাপ দেখেছিলাম। বাল্যকালে শোলো খুম্বুতে ইয়াক চরাবার সময় যে প্রাণীটির মল দেখেছিলাম সেটা ইয়েতির পায়খানা বলেই আমার বিশ্বাস। আমি আমার বাবার কাছ থেকে যা শুনেছি তা হল মাকালুর কাছে বরুণ হিমবাহ অঞ্চলে তিনি প্রাণীটির প্রথম দেখা পান। সা-চু (নদী)র জন্ম হয়েছে বরুণ হিমবাহ থেকে। এখানেই তিনি প্রথম হঠাৎই একবার এই প্রাণীটির সামনে পড়ে যান। এটা অনেকটা বড় আকারের বাঁদরের মত দেখতে, তফাৎ হল শুধু এর চোখগুলো গর্তে বসা এবং কপাল উঁচু। ধূসর রংএর বড় বড় লোমে ঢাকা। লোমের বিন্যাস ঃন কোমরের কাছ থেকে দুভাগে বিভক্ত। উপরের দিকের লোম উপর দিকে উঠেছে এবং কোমরের নীচে থেকে লোমগুলো পায়ের দিকে নেমেছে। এটা ছিল একটা স্ত্রী ইয়েতি এবং চাব ফুটের মত লম্বা। এর স্তনগুলি বড় এবং ঝুলন্ত। যখন দুপায়ে দৌড়ে পালাচ্ছিল তখন স্তনগুলিকে হাত দিয়ে ওপর দিকে ধরে রেখেছিল। আমার বাবা প্রাণীটিকে দেখে দারুণ ভয় পেয়েছিলেন। ততক্ষণে সে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করেছে আর মুখ দিয়ে তীক্ষ্ণ বাঁশির মত একটা শব্দ করছিল। আমাদের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে, যে লোক ইয়েতির দেখা পায় তার শীঘ্রই মৃত্যু হয়। তখন থেকে বাবা কেমন বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। তবু তিনি ভাগ্যবান যে তাঁর মৃত্যু হয়নি কিন্তু তারপর প্রায় একবছর অসুস্থ ছিলেন। এরপর ১৯৩৫ সালে তিনি আবার ইয়েতির দেখা পান। সেটা ছিল আমার প্রথম এভারেস্ট অভিযান। নাঙপা-লা অতিক্রম করে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছিলেন। রংবুক হিমবাহের ওপর একনম্বরে শিবিরে তিনি রয়েছেন একা, অভিযাত্রী দলের

সকলেই হয় মূল শিবিরে না হয় দু-তিন নম্বর শিবিরে। ভাল করে ভোরের আলো ফোটেনি হঠাৎ তাঁর কানে এল এক তীক্ষ্ণ বাঁশির শব্দ, শব্দটা কেমন চেনাচেনা। সন্তর্পণে তাঁবুর দরজা ফাঁক করে দেখেন প্রাণীটি দক্ষিণ থেকে উত্তরদিকে নেমে আসছে। ভয়ে না পারছেন তাঁবুর মধ্যে থাকতে, না পারছেন পালাতে। প্রাণীটি আপন খেয়ালে আপন পথে চলে যাবার পর তিনি পড়িমরি করে দুনম্বর শিবিরের দিকে উঠতে লাগলেন, আমি সেখানেই ছিলাম। আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরে বললেন, "কোনও শোলো খুম্বু থেকে আমি আসছি আমার ছেলেকে দেখতে, অথচ এমনই দুর্ভাগ্য যে পড়ে গেলাম ঐ কিম্ভূত জন্তুটার সামনে।" যাই হোক সেবারেও তিনি মারা যাননি এমনকি অসুস্থও হননি।

হিমালয়ের আধীবাসীদের মধ্যে ইয়েতিদের সম্পর্কে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। তার কতটা কল্পনা আর কতটাই বা সত্যি তা বলা সম্ভব নয়। শোলো খুম্বুতে যে গল্প প্রচলিত আছে সেটা হল, তারগনা বলে এক গ্রামের মানুষজন হঠাৎ একদিন সকালে ক্ষেতে কাজ করতে গিয়ে দেখে যে কেউ কেউ এসে যেন ব্যাপক ক্ষতি করে গেছে। কুঁড়ে ঘরগুলো ভেঙ্গেছে কিন্তু মজার কথা আবার সেগুলোকে ঠিক করার চেষ্টা করেছে। ক্ষেতের ফসল উপড়ে ফেলে আবার সেগুলো বসাবার চেষ্টা করেছে। এটা যে ইয়েতির কাজ সে ব্যাপারে গ্রামের লোক নিশ্চিন্ত হল কারণ গ্রাম থেকে নির্জন প্রান্তরে তারা ইয়েতির প্রচুর মল দেখতে পেল। পরপর কদিন এমন চলার পর গ্রামবাসীরা রেগে গিয়ে যে অঞ্চলে ইয়েতিগুলো প্রথমে জমায়েত হয় বলে মনে করল সেখানে বেশ কয়েক বোতল ছাং আর কয়েকটা ধারালো কুকরী রেখে দিল। এরপর রাত্রে যখন সবাই গ্রামে ফিরে গেছে তখন যথারীতি ইয়েতিরা এসে হাতের কাছে ছাংএর বোতল পেয়ে তা পান করে মাতাল হয়ে পড়ল। গ্রামবাসীরা ঠিক এমনটাই চেয়েছিল। এরপর মাতাল অবস্থায় হাতের কাছে কুকরী পেয়ে তারা নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি শুরু করল। এবং গল্পটা এইভাবে শেষ হয়েছে যে সকালবেলা গ্রামবাসীরা এসে দেখে ক্ষেতের আশেপাশে কয়েকটা ক্ষতবিক্ষত ইয়েতির মৃতদেহ পড়ে আছে। গল্পটা অবশ্য বহু দিন আগেকার অর্থাৎ আমার ঠাকুরদার বাবার আমলের। সে যাই হোক তারপর থেকে তারগনা গ্রামের লোকেদের আর এরকম ঝামেলায় পড়তে হয়নি।

শেরপা বিশ্বাস অনুযায়ী দু'ধরনের ইয়েতি দেখা যায়। একদল হল 'মিত্রে' যারা মানুষখেকো অন্যদল হল 'ছুত্রে' যারা শুধু পশুদের মাংস খায়। দু'দলের মধ্যে ছুত্রে আকারে বড়, প্রায় একটা ভাল্লুকের মত। শুধু তফাৎ হচ্ছে যে এদের পায়ের আঙ্গুলগুলো উল্টো দিকে। পাশ্চাত্য দেশের অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে ইয়েতি একধরনের ভাল্লুক, অন্যদের মতে ইয়েতি বাঁদর জাতীয় প্রাণী। আমি ইয়েতিদের সম্বন্ধে একথা জানতে পারি যখন জুলিয়ান হাক্সলে একবার দার্জিলিং এসেছিলেন এবং আমার কাছে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। খুব কম লোকই দাবি করে যে তারা ইয়েতি দেখেছে। পাহাড়ের দেহাতী মানুষ কিন্তু চায়না যে তারা কখনও ইয়েতির মুখোমুখি হোক। কারণ তারা মনে করে একবার ইয়েতির দেখা পেলে যতরকমের অপদেবতা তাদের ভর করবে। আর আমার কথা যদি বল তবে বলব ভদ্র অথবা মাতাল, সামনের দিকে হাঁটছে কিম্বা পিছন দিকে কোনও অবস্থাতেই আমি কোনও ইয়েতির দেখা পাইনি। কোনও সংস্কার কোনও অতিপ্রাকৃত ব্যাপার কিছুতেই আমার বিশ্বাস নেই।

ইয়েতির সম্বন্ধে প্রচলিত গল্পগুলোতেও আমার আস্থা নেই। কিন্তু এমনও মনে করিনা যে আমার বাবা ইয়েতি দেখেছে বলে যে দাবি করেছেন তা মিথ্যে কারণ মিথ্যে বলা তাঁর স্বভাব ছিল না। তবে বিভিন্ন অভিযানে আমি যে অস্বাভাবিক পায়ের ছাপ দেখেছি তা কোনও অদ্ভুত দর্শন প্রাণীর এবং আমার মনে হয় প্রাণীগুলি সাধারণত রাত্রেই চলাফেরা করে ও উঁচু পাহাড়ে বাস করে। ১৯৫৪ সালে বৃটিশ এবং ভারতীয়রা যৌথভাবে ইয়েতির সন্ধানে এভারেস্ট এলাকায় অভিযান চালায়। আমারও ইচ্ছে ছিল। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক যাওয়া হয়নি। এই অভিযানে অদ্ভুত সব পায়ের ছাপ দেখা গেছে কিন্তু ইয়েতি নামক কোনও প্রাণীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়নি। পরিশেষে একটা কথা বলি. আমরা তো অনেক কিছু দেখলাম, জানলাম, সন্ধান করলাম, জয় করলাম। এমন কয়েকটা বিষয় থাকনা, যার রহস্য আমরা কোনও দিনই ভেদ করতে পারব না!

জয়-পরাজয়

দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের শেষে পৃথিবীর সব দেশের মতই দার্জিলিংএর জীবন কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হল। বড় কোনও অভিযানের খবর নেই। ভারতবর্ষ সদ্য স্বাধীন হয়েছে—সবকিছুই অনিশ্চিত। মার্কিন সৈন্যবাহিনী আর বৃটিশ সরকারের লোকজন বিদায় নিয়েছে, নতুন ভ্রমনার্থী চোখে পড়ে না। চা বাগান বন্ধ, সবাই কাজের জন্যে হা পিত্যেশ করছে, বেকারী আর দারিদ্র্য ঘরে ঘরে, সংসার চলে না।

আমার সংসারের হালও খুব খাবাপ। শ্বশুর মশাই গত হয়েছেন। শাশুড়ী ঠাকরুণ শয্যাশায়ী, আমরা ছাড়া তাঁকে দেখার কেউ নেই। চিত্রল থেকে যে টাকা পয়সা এনেছিলাম তা অনেকদিন আগেই ফুরিয়ে গেছে। বাধ্য হয়ে আমার স্ত্রী আং লামু লোকের বাড়ি আয়ার কাজ নিল। আর বিকেলে স্মিথ ব্রাদার্সদের দাতের ডাক্তারখানায় সহযোগীর কাজ করে। উদয় অস্ত পরিশ্রম করছে, কি করে পরিবারের সকলের মুখে দুটো অন্ন তুলে দেওয়া যায়। তার সেই কঠিন সংগ্রামের কথা আমি কোনও দিন ভুলব না, কৃতজ্ঞ চিত্তে চিরকাল মনে রাখব।

আং লামুর জন্ম দার্জিলিং-এ। সে যখন খুব ছোট তখন বাড়ির লোকদের সঙ্গে একবার শোলো খুম্বু গিয়েছিল কিন্তু সে সব তার তেমন মনে পড়ে না। সব শেরপার মতই তার বাবাও গরিব ছিল। আট বছর বয়স থেকে সে দার্জিলিং-এর রাস্তায় মাল বইত। একটু বড় হয়ে লোকের বাড়ি আয়ার কাজ নিল, আর এইরকম আয়ার কাজ করার সময়েই বাল্যকালে আমার সঙ্গে তার দেখা হয়। গৃহকর্তার জন্যে আমার কাছ থেকে দুধ নেবার সময় প্রায় রোজই সে আমার সঙ্গে ঝগড়া করত। তখন দুজনের কেউই জানতাম না যে ভবিষ্যতে আমাদের কি পরিণতি হবে। ১৯৩৮ সালে তার জীবনে একটা মস্ত বড় সুযোগ এল। যে ওয়ালেসদের বাড়িতে সে কাজ করত তারা সে বছরেই ইংল্যাণ্ড ফিরে যাবার সময় ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করার জন্যে আং লামুকে সঙ্গে নিয়ে গেল। সেখানে তারা লণ্ডনের প্রাণকেন্দ্র হাইড পার্কের কাছে থাকত। এর আগে সে কখনও জাহাজ চাপেনি। দিনের পর দিন জল যাত্রায় সে অসুস্থ হয়ে পড়ল, পরে লণ্ডন পৌঁছে এমন অবস্থা হল যে হাসপাতালে ভর্তি করে দিতে হল। বেশ কয়েক মাস লণ্ডনে থাকার পর মিসেস ওয়ালেসকে আবার ইংলণ্ডের বাইরে যেতে হল আর আং লামু দেশে ফিরে এল। একেবারে একা বিশ্বযুদ্ধের মাঝে জাহাজে চেপে দেশে ফেরা আজও তার কাছে দুঃস্বপ্নের মত হয়ে আছে।

১৯৫৩ সালে আমার সঙ্গে আং লামু যখন আবার ইংলণ্ড গেল তখনও কিন্তু কেউ জানে না যে এর আগেও সে ইংলণ্ডে গিয়েছিল। কারণ তার স্বভাবটি ছিল বড়ই চাপা। ইংরেজী ভাষাটা সে ভালই বুঝতে পারে এবং তার নাম যে আং লামু এটাও সে যে সব বাড়িতে কাজ করেছে তারা জানেনা। তারা জানে ওর নাম নিমা।

এই সেদিন, যখন এভারেস্ট আরোহণ করলাম, সেই সময় একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিল। আর এমনটা ঘটার একটাই কারণ আং লামু যতটা লাজুক, নিজের সম্বন্ধে ঠিক ততটাই নিস্পৃহ। আমি বৃটিশদের সঙ্গে এভারেস্ট অভিযানে গিয়েছি আর আমার স্ত্রী নিউ এলগিন হোটেলে এক ইংরেজ রমণীর আয়া হিসেবে কাজ করছে। এভারেস্ট বিজিত হয়েছে, কাগজে

আমার সম্বন্ধে লেখা বোরোয়, ছবি ছাপে। তাই দেখে সে আমাকে নিয়ে কাগজে কি লেখা হয়েছে অন্যদের কাছে তা জানতে চায়। সে ইংরেজী বুঝতে পারে কিন্তু পড়তে পারে না। একদিন ঐ হোটেলে এক ইংরেজ রমণীকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, "নিমা তুমি কি তেনজিংকে চেন? সে কি তোমার কেউ হয়?" লজ্জিত হয়ে সে তাড়াতাড়ি উত্তর দেয়, "না, না, আসলে তিনি আমাদের টুংসুং বস্তির একজন পরিচিত বাসিন্দা।" ব্যাপারটা হয়ত এখানেই মিটে যেত এবং এখানে একথা বলার দরকার হত না যদি না পরবর্তী সময় এটার একটা মধুর পরিসমাপ্তি হত। এবার হল কি এভারেস্ট থেকে ফিরে আমরা কলকাতায় গেলাম, সংবর্ধনা দেওয়া হবে, সঙ্গে আমাব স্ত্রী গিয়েছে। সেখানে অনেক ইংরেজ নারী পুরুষ এসেছে। আমি লক্ষ্য করে দেখি এক ইংরেজ রমণী আমার চেয়ে আমার স্ত্রী সম্বন্ধে বেশি আগ্রহী। একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর কৌতূহল চাপতে না পেরে একেবারে সামনে এসে চেঁচিয়ে উঠল, "হায় ভগবান। এত আমাদের নিমা!"— তাঁর প্রায় অজ্ঞান হবার অবস্থা। এমন কেন ঘটল তা যখন আং লামুকে জিজ্ঞেস করলাম তখন সে আমাকে আগের ঘটনা জানাল।

এইভাবেই আমাদের জীবন কেটে যাচ্ছে। কখনও মজা কখনও দুঃখ। কখনও উত্থান কখনও বেদনা—পাহাড়ে যেমন চড়াই আর উৎরাই। একজন স্বামী ভাগ্যবান যদি তার জীবনের সব কিছু সে সমানভাবে ভাগ করে নেয় তার স্ত্রীর সঙ্গে, যেমন আমার জীবন প্রবাহ বয়ে চলেছে আং লামুকে কেন্দ্র করে।

যুদ্ধ শেষ হয়েছে কিন্তু দাবিদ্র আব বেকারীর জ্বালায় জীবন কেমন ক্লান্তিকর বিমর্ষ হয়ে গেল। সমস্ত সংসারটার দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে আমার স্ত্রী। আমার আজ কাজ জোটে তো কাল জোটে না। দিনগত পাপক্ষয়। আমাদের উত্তরে তুষার ধবল কাঞ্চনজঙ্ঘা তেমনি সুন্দর তেমনি মহিমময়, অথচ আজ আমাদের পরস্পরের মধ্যে যেন এক ঘৃণার পাঁচিল উঠে গেছে, তার দিকে তাকালে মনে হয় সে আমায় মুখ ভেঙ্গচাচ্ছে। এ আমার কি হল? আমি কি আর কোনও দিন ওই শ্বেত শুভ্র তুযারের হাতছানিতে জেগে উঠতে পারব না? যাকে আমি এত ভালবাসলাম, যার কোলে আমার জন্ম, সেই হিমালয় কি আমার জীবন থেকে চিরতরে হারিয়ে যাবে! আমি টাইগার হিলে যাওয়া ছেড়ে দিলাম, এখন আর কোনও পর্যটক নেই। এভারেস্ট যদি আজ তার জায়গায় থেকে থাকে তবে সে তাই থাকুক, আমি তাকে দেখতে চাই না, তার কথা ভাবতে চাইনা! কিন্তু আমার সমস্ত মন জুড়ে তো রয়েছে সে।

এর মধ্যে ১৯৪৭ সালের বসন্তকালে একটা তাজ্জব ঘটনা ঘটল, এমন ঘটনা যিনি ঘটালেন তিনি হলেন মিঃ আর্ল ডেনম্যান। ডেনম্যানের জন্ম কানাডায়, ইংল্যাণ্ডে বড় হয়েছেন আর এখন বাস করেন আফ্রিকার কোনও এক ইংরেজ কলোনীতে। বহু জায়গায় ঘুরেছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বহু ধরনের অভিযানের অভিজ্ঞতা তাঁর আছে। কিন্তু যত কিছু লোমহর্ষক ঘটনার সাক্ষীই তিনি হোন না কেন আসলে এগুলি তাঁর মনে তেমন রেখাপাত করেনি। তার চেয়ে অনেক বড় একটা ঘটনার জন্যে তিনি প্রতীক্ষা করছেন। স্বপ্ন দেখছেন। তিনি সংকল্প করেছেন এভারেস্ট অভিযানে যাবেন একা। না ঠিক একা নয়—আবার পূর্ণাঙ্গ একটা অভিযাত্রী দল নিয়েও নয়। আর তাঁর এই অভিযানে উপযুক্ত সঙ্গী শেরপার খোঁজে তিনি দার্জিলিং এসেছেন।

ঘটনাচক্রে তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়ে গেল। একদিন পুরনো শেরপা সর্দার কার্মা পাল্ আমাকে ডেকে বললেন, "দেখ তেনজিং এই শহরে একজন সাহেব এসেছেন। তাঁর মাথায় এক অদ্ভুত পরিকল্পনা আছে, যা শুনে তুমি উৎসাহ পাবে।"

— "নিশ্চয় পর্বতারোহণ সংক্রান্ত?"

— "তা না হলে আর তোমাকে ডাকব কেন?"

পরের দিন আরও একজন শেরপা বন্ধু আং দাওয়া এবং আমি হাজির হলাম কার্মার অফিসে। ডেনম্যানের সঙ্গে আলাপ হল। এসেছেন একা, পয়সাকড়ি তেমন কিছু নেই, সাজ সরঞ্জাম এভারেস্ট মানের নয়। এমনকি তিব্বতে প্রবেশের অনুমতিটুকুও সঙ্গে নেই। এমন অদ্ভুত এভারেস্ট অভিযানের কথা আগে কখনও শুনিনি। তাঁর সাথে আমার যা কিছু কথাবার্তা সবই কার্মাকে দোভাষী করে। তিনি খুব চেষ্টা করলেন যাতে আমি তাঁর সঙ্গে যাই। আমার সম্বন্ধে তার এই মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহের কারণ আমি টাইগার ব্যাজপ্রাপ্ত এবং শেরপাদের মধ্যে আমিই একমাত্র এভারেস্টের সাতাশ হাজার ফুট পর্যন্ত উঠেছি। তিব্বতী ভাষায় দখল, ইংরাজী অল্প স্বল্প বলতে পারা এবং সেরা শেরপা হিসেবে পরিচিতি আমার এই ধরনের গুণাবলী নাকি তাঁকে আকৃষ্ট করছে। যদিও আমি মনে করি আমার সম্বন্ধে এত ভাল ভাল কথা তোষামোদ ছাড়া কিছুই নয় তবু এর আগে আমি তাঁর মত এমন দৃঢ়চেতা একগুঁয়ে মানুষ দেখিনি। এক অদ্ভুত আকর্ষণ রয়েছে তাঁর মধ্যে—ভেবে দেখাব প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেদিনের মত চলে এলাম।

ডেনম্যানের কথায় ভেবে দেখার কি আছে বুঝতে পারিনা, অনুমতি ছাড়া তিব্বতে আদৌ ঢুকতে পারব কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আর যদিও পারি তবুও ধরা পড়ার সমূহ সম্ভাবনা। আর ধরা পড়লে এই লোকটার যা হোক হবে কিন্তু তার সঙ্গী হিসেবে আমাদেরও দুর্ভোগের শেষ থাকবে না। না হয় কোনও মতে ঢুকে পড়লাম, কিন্তু আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না তিনজনের এমন একটা দল নিয়ে এভারেস্ট আরোহণ করা সম্ভব। তাছাড়া এই দুঃসাহসী প্রচেষ্টায় যথেষ্ট ঝুঁকি আছে। ডেনম্যানের টাকা পয়সার যা অবস্থা তাতে আমাদের ঠিকমত মজুরী দিতে পারবে কিনা সন্দেহ। আর যদি আমাদের কোনও দুর্ঘটনা ঘটে তবে আমাদের পরিজনদের কোনও ক্ষতিপূরণই সে দিতে পারবে না। এইরকম অবস্থায় সঙ্গে যাব বলাটাই বোধহয় হবে সবচেয়ে পাগলামি। তবু যাব না বলতে পারলাম না। এভারেস্ট মানেই আমার কাছে এক স্বপ্ন মাখা নাম, মাটির পৃথিবীর কোনও যুক্তিই আমাকে আটকে রাখতে পারল না।

—'চল, একটা চেষ্টা করেই দেখা যাক।' আমরা রাজী হয়ে গেলাম।

রাস্তায় বেরিয়ে জানা গেল তিব্বতে প্রবেশ দূরের কথা সীমান্তের ধারে কাছে যাবে না, ডেনম্যান এরকম একটা লিখিত প্রতিশ্রুতি আগে ভাগেই দিয়ে বসে আছে। কাজেই গোপনীয়তা এখন খুবই জরুরী। সেইমত আমরা প্রথমেই আলাদা আলাদা রওনা হয়ে পথিমধ্যে একজোট হলাম। তারপর সিকিমের চিরাচরিত পথ ধরলাম। যে কোনও সত্যিকারের পর্বত অভিযানের সঙ্গে একটা বিষয়ে এই অভিযানের মিল আছে আর তা হল প্রত্যেকটা বিষয় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরিকল্পনা মাফিক সংগঠিত করা। প্রতিদিনের রসদ সেই দিনই জোগাড়

করতাম, পরের দিনের কথা চিন্তা করতাম না। কখনও কখনও নির্জনতাকে বেছে নিতাম, আবার কখনও বা ছোট ব্যবসায়ী দলের সঙ্গে মিশে যেতাম। আর সেই সময় তাদের কাছ থেকে ভারবাহী পশু ভাড়া করতাম মাল বইবার জন্যে। এইভাবে বহু পাহাড় ডিঙ্গিয়ে আমরা সীমান্তে হাজির হলাম, এবং ডেনম্যানকে পরামর্শ দিলাম চলতি পথ ছেড়ে অন্যপথ ধরতে, কারণ সীমান্তে টহলদারি দল আছে। সেইমত একটা অপ্রচলিত গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে তিব্বতে প্রবেশ করলাম। এখান থেকে পশ্চিমপথে রংবুক মালভূমিকে লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলাম। এরপর থেকে আমাদের দুর্দশা চরমে উঠল। ভালমত খাবার জোটে না, খাবার জোটে তো অন্য কোনও সমস্যা এসে হাজির হয়। পথটা অপ্রচলিত এবং দুর্গম। একদিন তো মালবহণকারী ইয়াকগুলো খাদের একদম ধারে চলে গেল, যে কোনও সময় পড়ে যেত। আমাদের সবচেয়ে ভয় টহলদারী বাহিনীকে, আর সত্যি সত্যি একদিন তাদের নজরে পড়ে গেলাম। কাগজপত্র কিছুই নেই, তারা আমাদের ফিরে যেতে বলল, অভিনয় করলাম সত্যি বোধহয় ফিরে যাচ্ছি, কিন্তু তা না করে ঘুর পথে চলা শুরু করলাম। গ্রাম আর শহরগুলোকে সব সময় এড়িয়ে চলি পাছে আবার ধরা পড়ি। অবশেষে কঠিন যাত্রা একদিন শেষ হল, আমরা রংবুক মঠে পৌঁছলাম। এখানে আমাদের কেউ সন্দেহ করেনি। সব বাধা শেষে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি সেখানে, যেখানে তুষারধবল এভারেস্ট সোজা দাঁড়িয়ে আছে চোখের সামনে। যেন রাশি রাশি শুভ্রধবল তুষারে কেউ মুড়ে দিয়েছে চরাচর—যেমনটি দেখেছিলাম আজ থেকে ন'বছর আগে। পুরনো দিনের সেই উত্তেজনা এসে হৃদয় মন জুড়ে বসল। তাই বলে আমি বাস্তব থেকে মোটেই বিচ্যুত হইনি, আমি খুব ভাল করেই জানি, যে উদ্দেশ্যে আজ আমরা এখানে, তা হবার নয়।

১৯৩৪ সালে মরিস উইলসনের সেই করুণ পরিণতির কথা মনে পড়ে গেল। খুব নিচু গলায় নিজেকে বললাম, 'তেনজিং, তুমি কি চাও তোমারও এমনটা ঘটুক? ঠান্ডায় শক্ত কাঠ হয়ে যাওয়া মৃতদেহ গুলোকে তাঁবুর ভেতর থেকে বের করে আনার সুযোগ যেন কেউ না পায়, মনে রেখ।'

এবার শুরু হল আরোহণ। নিচের শিবিরের স্থানগুলো পার হয়ে হিমবাহের পথে আমরা নর্থকলের পায়ের নিচে বরফের দেওয়ালের কাছে তাঁবু লাগালাম। মাত্র তিনজন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে যাচ্ছি। প্রকৃতি রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করেছে। এমন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আর কখনও পড়েছি বলে মনে হচ্ছে না। ঠান্ডার দাপটে অসহ্য এক মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হল। অবশেষে ঠান্ডা সহ্য করার ক্ষমতা যখন প্রায় শেষ হতে বসেছে তখন বুঝলাম জামাকাপড় এবং সাজ সরঞ্জামগুলোকে যতটা নিম্নমানের ভেবেছিলাম সেগুলো ঠিক ততটা নয়, তার চেয়েও নীচু মানের। প্রয়োজনীয় খাবারের খুব অভাব, এমনকি গা গরম রাখার জন্যে যে চা তাও ফুরিয়ে গেল। দুটি মাত্র তাঁবু, এক টুকরো কাগজের যেটুকু ঠান্ডা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা এদের ক্ষমতা তার বেশি কিছু নয়। তায় আবার এর একটা ডেনম্যানের দখলে। অবশ্য কদিন পরে দেখি সেটি ছেড়ে তিনি আমাদেরটিতে চলে এসেছেন। তিনজনের শরীরের গরমে যদি ঠান্ডা থেকে একটু রেহাই পাওয়া যায়। তবে আমরা খুব দ্রুত এগিয়ে চলেছি। যে কোনও বড়মাপের অভিযানে শিবির স্থাপনের আগে সেখানে মাল পৌঁছে দেওয়া হয়, তারপর সেখানে তাঁবু

লাগানো হয়, পরে অভিযাত্রীরা সেখানে আসে। এক্ষেত্রে সে সব কোনও ব্যাপার নেই। প্রতিদিন নতুন শিবিরে উঠে আসছি এবং অতিদ্রুত নর্থকলের ঠিক নিচে বরফের ঢালে শিবির স্থাপন করলাম। আমি বেশ বুঝতে পারছি এই পর্যন্তই শেষ। এরপর আর কোনও মতে ওঠা সম্ভব নয়। ডেনম্যানের অবস্থা করুণ। বেচারার ঠান্ডা সহ্য করার ক্ষমতা আমাদের মত নয়। তাকে দেখে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে এই বোধহয় মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে আর উঠবে না। রাত্রে ঘুমতে পারেনা, অবশেষে চতুর্থ শিবির থেকে নর্থকলে উঠে আসার চেষ্টা করলাম। না, অসম্ভব! ঠান্ডা একেবারে হাড়ের মধ্যে বিঁধে যাচ্ছে, ঝোড়ো হাওয়ায় ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে। তাঁবুতে ফিরে এলাম ব্যর্থ, বিপর্যস্ত হয়ে—আমরা পরাজিত। ডেনম্যান বুঝতে পারছে। সে একজন দৃঢ়চেতা সাহসী মানুষ। অসম্ভব তার ভাবপ্রবণতা কিন্তু সে পাগল নয়। সে মরতে রাজি নয়—ফিরে যাবারই সিদ্ধান্ত নিল। তার এই ফিরে যাবার সিদ্ধান্তে আমি সত্যি কৃতজ্ঞ, আমার জীবনে আমি এতটা কৃতজ্ঞতা কোনও কিছুতেই প্রকাশ করিনি। কারণ এমনি প্রতিকূল অবস্থায় মৃত্যুর হাতছানিতে ডেনম্যান যদি এগিয়ে যেতে চাইত তবে তাঁকে সঙ্গ দেওয়া ছাড়া আমাদের কিছুই করার থাকত না।

শুরু হল নামা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই কঠিন ঠান্ডা থেকে পালাতে হবে। ডেনম্যান নেমে আসছে, আমাদের তাড়া লাগাচ্ছে, ভাবখানা যেন কখনই সে এভারেস্ট আরোহণের স্বপ্ন দেখেনি। বিশ্রাম নেবার প্রশ্ন নেই—থামবার কথা ভাবছি না, তিব্বতের মালভূমি ছেড়ে উল্টো দিকে দৌড়চ্ছি। ভাগ্য ভাল রক্ষিবাহিনীর নজরে পড়িনি। দার্জিলিং থেকে রওনা হয়ে এভারেস্ট থেকে আবার দার্জিলিং ফিরতে আমাদের মাত্র পাঁচ সপ্তাহ সময় লাগল, ভাবা যায়? সবকিছু যেন চোখের নিমেষে ঘটে গেল, পাগলামির চূড়ান্ত। দার্জিলিং ফিরে কয়েকদিনের মধ্যেই ডেনম্যান ফিরে গেল। সবকিছু আবার আগের মত চলেছে, এখন মনেই পড়ে না যে কদিন আগে সত্যি সত্যি এভারেস্ট অভিযানে গিয়েছিলাম।

কয়েকমাস পরে ডেনম্যানের চিঠি পেলাম। সে ১৯৪৮-এর বসন্তকালে আবার আসছে। যথা সময়ে ডেনম্যান হাজির, এবার সে যে সমস্ত সাজসরঞ্জাম এনেছে সেগুলো আগের তুলনায় যথেষ্ট ভাল তবে সে যা আনতে পারেনি তা হল তিব্বত প্রবেশের অনুমতি। অনুমতি ছাড়া আমাদের আগের অভিযান দার্জিলিং-এর মানুষজনের কাছে যথেষ্ট সমালোচিত হয়েছে। এবারেও যদি আবার বেআইনী অভিযানের মতলব করি তবে সেটা মোটেও ভাল হবে না, শাস্তি পেতে হবে, একথা তারা আমাকে জানিয়ে দিল। আমার চেয়ে উপযুক্ত মানুষের সন্ধান না পেয়ে ডেনম্যান তার পরিকল্পনা বাতিল করে দিল। ফিরে যাবার সময় তার সমস্ত সাজ সরঞ্জাম আমাকে দিয়ে গেল। কারণ সেগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে যেটুকু দরকার সেই গাড়িভাড়া তার সঙ্গে নেই—অদ্ভুত মানুষ! যদিও সে তার এভারেস্ট আরোহণের স্বপ্ন মাখা জেদ্ নিয়ে আর ফিরে আসেনি তবু আমাদের বন্ধুত্ব আজও অটুট আছে, আমরা এখনও পরস্পরকে চিঠি লিখি। ১৯৫৩ সালে প্রথম মানুষ হিসেবে আমি যখন এভারেস্ট আরোহণ করলাম তখন আমার মাথায় যে হনুমান টুপিটা ছিল সেটা ডেনম্যানের দেওয়া। সে না পারুক অন্তত তার একটা স্মৃতি এভারেস্টের মাথায় উঠল প্রথম।

১৯৪৭ সালে ডেনম্যানের সঙ্গে এভারেস্ট অভিযানে গিয়েছিলাম বেকার জীবনে একটা

কাজ পাবার তাগিদে কিন্তু ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কাজ জুটে গেল যদিও সেটা এভারেস্ট অভিযানের মত বড় মাপের কোনও অভিযান নয়। এবারে পয়সা কড়ির কোনও অভাব নেই এবং পরিকল্পনা নিখুঁত। এটা গাড়োয়াল হিমালয়ের একটা অভিযান। দলের নেতা বিখ্যাত পর্বতারোহী আন্দ্রে রস্ শেরপাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে আগেই দার্জিলিং চলে এসেছেন। আমি কোথায় যাচ্ছি কেন যাচ্ছি বুঝে ওঠার আগেই আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নেওয়া হল। শেরপা সর্দার আমার পুরনো বন্ধু ওয়াংদি নরবু। দার্জিলিং থেকে সরাসরি গাড়োয়াল, সেখানে দলের অন্য সদস্যদের সঙ্গে আলাপ হল। আলফ্রেড সুটার একজন জাঁদরেল ব্যবসাদার, অভিজ্ঞ পর্বতারোহী এবং শিকারী; রেনি ডিটার্ট, এর সঙ্গে আমি পরবর্তী সময়ে এভারেস্ট অভিযানে গিয়েছি ; মিসেস এ্যানেলিস লোনার, কমবয়সী মহিলা পবর্তারোহী; আল্পসের গাইড এ্যালেক্স গ্রেভেন; সবাই সুইজ্যারল্যান্ডের অধিবাসী। সুইসদের সঙ্গে এটাই আমার প্রথম অভিযান। এবারে খুব বড় মাপের কোনও পর্বতাভিযানের পরিকল্পনা নেই, সবই কুড়ি হাজার ফুটের মধ্যে। অবশ্য হিমালয় ছাড়া পৃথিবীর যে কোনও পর্বতেই এগুলো যথেষ্ট বড় মাপের অভিযান। প্রথমেই আমরা যে পর্বতশীর্ষের উদ্দেশ্যে অভিযান চালালাম তা হল কেদারনাথ। বহু চেষ্টা করে আমরা মূল শিবিরের জায়গা খুঁজে পেলাম। সেখান থেকে বেশ কয়েকটা শিবির স্থাপন করার পর শীর্ষে পৌঁছবার পথ পরিষ্কার দেখতে পেলাম। এবার শীর্ষারোহী দল প্রস্তুত হল, আমি দলভুক্ত হলাম না। আমার কাজ হল মিসেস লোনারের সঙ্গে শীর্ষ শিবিরে অপেক্ষা করা। মিসেস লোনার পর্বতারোহণে ভালই দক্ষ কিন্তু তবু আমার মত তাঁকেও দলে নেওয়া হল না। বিরসবদনে আমরা থেকে গেলাম। তবু যা হোক আমার সঙ্গিনীটি বেশ আমুদে আর আড্ডাবাজ, আমাদের মন্দ কাটবে না। পরের দিন শীর্ষারোহী দলকে বিদায় জানিয়ে সারাদিন তাঁদের পথ চেয়ে বসে থাকলাম। বিকেলে দেখলাম তাঁরা নেমে আসছেন কিন্তু যেমন উৎফুল্ল দেখব ভেবেছিলাম তা দেখলাম না। যে ভঙ্গিতে তাঁরা নামছিলেন তা দেখে মনে হল কিছু একটা বিপদ ঘটেছে। উদ্বিগ্ন হয়ে যখন তাঁদের কাছে পৌঁছলাম শুনলাম একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। দুজন করে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় এক তীক্ষ্ণ শৈলশিরা ধরে শীর্ষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা। এমন সময় মিঃ সুটার এবং ওয়াংদি নরবু রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় হঠাৎই পা পিছলে পড়তে শুরু করল। শুধু চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া কিছুই করার নেই। কঠিন ঢাল দিয়ে গড়িয়ে তাঁরা হাজার ফুট নিচে পড়ে গেলেন। এমন একটা দুর্ঘটনা চোখের সামনে ঘটে গেল বাকিরা কিংকর্তব্য বিমূঢ়। বহু নিচে দেখা যাচ্ছে তাঁদের, বাঁচা সম্ভব নয়। শৈলশিরার যে জায়গায় তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে সরাসরি দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছনও সম্ভব নয়। অনেক ঘুরে যখন তাঁরা সেখানে পৌঁছলেন তার মধ্যে কয়েক ঘন্টা সময় পার হয়ে গেছে। এমন একটা দুর্ঘটনা অথচ আঘাত মারাত্মক কিছু নয়, সুটারের কিছুই হয়নি, সে দিব্যি হাঁটতে পারছে শুধু ঘটনার আকস্মিকতায় কেমন বিমূঢ় হয়ে পড়েছে। বন্ধুদের দেখা পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যই তাঁর সে ভাব কেটে গেল। কিন্তু ওয়াংদির কিছু আঘাত লেগেছে, তার একটা পা ভেঙ্গে গেছে এবং আর একটা পায়ের বেশ কিছুটা সুটারের জুতোর ক্রাম্পনের খোঁচায় গভীর ভাবে কেটে গেছে। ওয়াংদিকে বয়ে আনতে হবে কিন্তু দীর্ঘ কঠিন ওঠা নামায় সকলেরই শরীর কাহিল, এখন এই অবস্থায় যেটা

করা সম্ভব তা হচ্ছে কাছে পিঠে নিরাপদ স্থানে তাবু খাটিয়ে ওয়াংদিকে স্লিপিং ব্যাগে পুরে সেই তাঁবুর মধ্যে শুইয়ে দেওয়া। তাঁবুর দরজা বন্ধ করে দিয়ে তাঁরা ফিরে এসেছেন।

সন্ধ্যে নেমে এসেছে, রাত্রে কিছু করা সম্ভব নয়, পরের দিন আলো ফোটার আগেই উদ্ধারকারী দল রওনা হল আর আমাকে তো যেতেই হবে। আগের দিনের পরিশ্রমে অন্যরা যেভাবে ক্লান্ত তাদের কাছে বেশি কিছু আশা করা উচিত নয়। ওয়াংদি, আমার পুরনো বন্ধু তাকে আমি গভীরভাবে ভালবাসি। ১৯৩৮ সালের এভারেস্ট অভিযানে আমরা একসঙ্গে টাইগার সম্মানে ভূষিত হয়েছি। যে কোনও মূল্যে তাকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করতে হবে।

ভাগ্য ভাল আবহাওয়া সেদিন শান্ত ছিল, অল্প সময়ের মধ্যে দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেলাম। সাদা বরফের ওপর দূর থেকে চকোলেট রঙের তাবু দেখা যাচ্ছে। তাকে কি অবস্থায় দেখব জানি না। যাক ওয়াংদি এখনও বেঁচে আছে এবং মোটামুটি ভাল আছে। শুধু যেটা আশা করিনি তা হল তার গলায় ক্ষত চিহ্ন এবং সেখানে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। পরে তার মুখেই এই ক্ষত সম্বন্ধে জানতে পেরেছিলাম। সে যখন নিচে পড়ল তখন প্রচণ্ড আঘাতে প্রায় অচেতনা। সঙ্গীরা কখন যে তাকে তাঁবুর মধ্যে রেখে সকলে চলে গেছে সে তা জানতে পারেনি। অনেক পর জ্ঞান ফিরলে সে এটুকু বুঝতে পারে যে তাকে ফেলে সকলে চলে গেছে। এখন শুধু ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া— মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করা। ধীরে ধীরে নিজের ছুরিটা বের করে ওয়াংদি। মৃত্যু ত্বরান্বিত হোক, অবসান হোক এই হিমশীতল প্রতীক্ষার। ছুরি চালায় নিজের গলায়, কিন্তু দুটো কারণে অলৌকিকভাবে বেঁচে গেল সে। প্রথমত তার শরীর এতই দুর্বল যে গভীর ভাবে ছুরি চালাবার ক্ষমতা নেই তার। দ্বিতীয়ত ছুরি চালাবার মুহূর্তে মনে পড়ে গেল স্ত্রীর কথা, ছেলেমেয়েদের কথা। অন্তত ওদের জন্যে যেভাবেই হোক তাকে বাঁচতে হবে। বাকী রাতটুকু সে শান্ত হয়ে শুয়ে রইল। গলায় ক্ষত যেটুকু সৃষ্টি হয়েছিল তার থেকে রক্ত বের হবে অস্বাভাবিক ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে ক্ষতমুখ বুজিয়ে দিল।

এরপর কখনও পিঠে কখনও কাঠের চাকালাগানো মত স্লেজের সাহায্যে সতর্কতার সঙ্গে তাকে নামিয়ে আনলাম। এইভাবেই নিচের দিকে নামতে নামতে অবশেষে বাস রাস্তায় এলাম। সেখান থেকে মুসৌরীর হাসপাতাল, প্রাণশক্তির জোরে সে দ্রুত আরোগ্য লাভ করতে লাগল। অবশেষে বাড়ি ফিরল। অবশ্য আগের নরবুকে আমরা আর কখনওই ফিরে পাইনি। এর কয়েক বছর বাদে যখন তাকে এই দার্জিলিং-এ আবার দেখলাম তখন বুঝলাম সেই দুর্ঘটনা শুধু তার শরীর নয় মনটাকেও ভেঙে দিয়ে গেছে। আর কোনও দিনই অভিযানে যেতে পারবে না আমার পুরনো বন্ধু—ওয়াংদি নরবু। এরপর সে আর সামান্য কটা বছর বেঁচেছিল। এই অভিযানে আমরা আর কি করতে পারতাম জানিনা তবে অভিযান বাতিল করলে নরবুর বিশেষ কোন লাভ হত না এটা আমরা বুঝলাম। কাজেই তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে আমরা আবার ফিরে এলাম। ওয়াংদি নেই, এবার একজন সর্দার দরকার, আমাকেই সে পদ দেওয়া হল। একজন শেরপার জীবনে সবচেয়ে বড় সম্মান হল সর্দারের পদ লাভ করা, এতে একজন সাধারণ শেরপার জীবনটাই বদলে যায়। সর্দার হতে পেরে আমি খুব খুশি হলাম কিন্তু পাশাপাশি মনটা বিষাদে ভরে গেল, এ কথা ভেবে যে একজন বন্ধুর দুর্ভাগ্যের মধ্য দিয়ে আমার পদোন্নতি হল।

পাহাড়ে একটা ঘটনা ঘটে যাবার পর যেমন হয় এক্ষেত্রেও তাই ঘটল, দলটি ভয়ে প্রথমে একটু সঙ্কুচিত হয়ে রইল, অবশ্য অচিরেই তারা তাদের জড়তা কাটিয়ে উঠল। এবার শীর্ষারোহী দলে আমাকে সুযোগ দেওয়া হল, বাকিরা হলেন- আন্দ্রে রস, ডিটার্ট, সুটার এবং গ্রেভান। ধীরে ধীরে আমরা আবার দুর্ঘটনা স্থলে উঠে এলাম যেখান থেকে কেদারনাথ শীর্ষ পরিষ্কার দেখা যায়। কেদারনাথের উচ্চতা মাত্র বাইশ হাজার ফুট, এভারেস্টের নর্থকলের উচ্চতার সমান। কিন্তু আমার জীবনে প্রথম কোনও পর্বতশীর্ষে আরোহণ। সুতরাং উল্লসিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে।

অভিযানের শুরু হল কেদারনাথ আরোহণের মধ্যে দিয়ে, এবার লক্ষ্য তার প্রতিবেশী সতোপন্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয় সতোপন্থ অভিযান সফল হলেও আমি পেটের গণ্ডগোলের জন্যে দল থেকে বাদ পড়েছিলাম। এবার আমরা তিব্বত সীমান্তে এসে বলবালা শীর্ষের দিকে অভিযান চালালাম। এখানে মিসেস লোহনার সমেত সকলেই সফল হলাম। শেষ চেষ্টা কালিন্দী। কালিন্দীর শীর্ষে শুধু পাথর, বরফ নেই। হিমালয়ের কোনও পর্বতশীর্ষ সাধারণত এমন বরফবিহীন হয় না। এমন দৃশ্য অনেক পরে আমি সুইজারল্যান্ডে গিয়ে দেখেছিলাম। এবারের অভিযানে এমন [illegible]টি পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করা হল যেগুলি আগে অবিজিত ছিল, আর এটাই এই অভিযানের উল্লেখযোগ্য বিষয়।

গাড়োয়ালের উত্তরাঞ্চলে এই প্রথম এসেছি। বদ্রীনাথ গঙ্গোত্রী এবং আরও অনেক ছোটখাট জায়গা দেখা হয়ে গেল। এবারের অভিযানে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল মিঃ সুটার প্রতিদিনই আমাদের জন্যে কিছু না কিছু শিকারের ব্যবস্থা করতেন—মাংসের অভাব হত না। অথচ বছর খানেক আগে [illegible] অভিযানে মাংস খাওয়া তো দূরের কথা প্রায় দিনই অভুক্ত থাকতে হয়েছে।

[illegible] ছাড়া [illegible] কোনও বিপদ হয়নি। কিন্তু সমস্যা এল অন্য দিক থেকে। ১৯৪৭ সাল কদিন আগে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। দেশটা দুটো ভাগে ভাগ হল— ভারতবর্ষ আর পাকিস্তান। হিন্দু মুসলমানে জাতি দাঙ্গা [illegible]— এমন অবস্থায় অভিযান শেষে আমরা মুসৌরী এসে পৌঁছলাম। সমস্ত দোকান পাট বন্ধ, গোটা শহরটা সৈন্যবাহিনীর দখলে। কার্ফুর জন্যে রাস্তায় বের হওয়া যাচ্ছে না, গাড়িঘোড়ার দেখা নেই, দেখে মনে হচ্ছে কোনও দিনই বোধহয় এখান থেকে বের হতে পারব না। অবশেষে বহু প্রচেষ্টার পর সৈন্যদের সহায়তায় সুইসদলের দিল্লী যাবার ব্যবস্থা হল। একটা ভ্যান গাড়িতে চেপে তারা রওনা দিল আর আমরা প্রায় কুড়ি জন শেরপা আরও দুসপ্তাহ সেখানে আটকে থাকলাম। চিত্রল থেকে ফেরবার সময়েও আমার এমন অবস্থা হয়েছিল কিন্তু এবারে পকেটে যেটুকু টাকা ছিল তার সবটাই প্রায় খরচ হয়ে গেল। অবশেষে পকেটে মাত্র পনের টাকা সম্বল করে পুলিশের বড় কর্তার সঙ্গে দেখা করবার প্রয়াসে তাঁর দপ্তরে হাজির হলাম। আর্দালি প্রথমে ঢুকতেই দেবে না, অবশেষে শেষ সম্বল পকেটের টাকাটা তার হাতে গুঁজে দিলাম এবার সে নিজেই সাহেবের সঙ্গে দেখা করবার ব্যবস্থা করে দিল। তার সঙ্গে দেখা করে বললাম, "আমরা একটা অভিযান থেকে ফিরছি।" এইটুকু শুনেই তিনি রেগে উঠলেন ভাবলেন আমরা

বোধহয় কোনও রাজনৈতিক বিষয়ে কথা বলছি। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমদের জেলে পাঠাতে উদ্যত হলেন। অনেক কষ্টে তাঁকে ঠাণ্ডা করলাম। সব শুনে তিনি একটা ট্রাকে করে আমাদের দেরাদুন পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। দেরাদুন এসে বৃষ্টির মধ্যে পড়ে আমরা নাস্তানাবুদ। প্রবল বর্ষণে রাস্তা ঘাট সব নষ্ট হয়ে গেছে। সত্বর এখান থেকে বের হওয়া যাবে এমন কোনও সম্ভাবনা নেই। তবু ভরসা যে এখানেই ডুন স্কুল, আর সি. গিবসনকে পাওয়া গেল। যে কটা দিন আমরা দেরাদুনে ছিলাম তিনিই আমাদের সব দায়িত্বভার নিলেন। অতঃপর তাঁরই সহায়তায় আমাদের ঘরে ফেরার ব্যবস্থা হল। কিন্তু রেল ও পুলিশের লোকজনের হাতে যা হেনস্তা হতে হল তা অবর্ণনীয়। সব মানুষেরই কিছু পছন্দ এবং অপছন্দের ব্যাপার থাকে, আমারও আছে। পুলিশ এবং রেলের লোকজন আমার কাছে চিরকালই অপছন্দের।

অবশেষে আরও একটা অভিযান সমাপ্ত হল। ওয়াংদির দূর্ঘটনা, ফেরার কষ্ট সবই ছিল আর ছিল মনে রাখার মত কিছু সুখস্মৃতি। আমি এই প্রথম সুইসদের সঙ্গে অভিযানে গেলাম। তাদের ব্যবহার অতি মধুর। তারা সাহেব এবং চাকুরীদাতা এমন কোনও উন্নাসিকতা তো ছিলই না পরন্তু তারা বন্ধুর মত আচরণ করত, এরপর থেকে তাদের সঙ্গে আমার চিরকালীন একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে যা আজও অব্যাহত। ঐ অভিযানে আরও একটা মজার ব্যাপাব ঘটেছিল যা এর ছ'বছর বাদে ১৯৫৩ সালে আমি যখন সুইজারল্যান্ড গিয়েছিলাম তখন আমাকে কিছুটা বিব্রত করেছিল আর সুইস বন্ধুবা কৌতুক অনুভব করেছিল।

সেই কথাটাই বলি। আমি সুইস বিমানবন্দরে পা রাখার সাথে সাথে পুরনো বন্ধুদের দেখা পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। আমার জানা ফ্রেঞ্চ আর জার্মান ভাষা উজাড় করে আলিঙ্গন করলাম—"কেমন আছেন আপনারা? কি খুশিই যে হয়েছি আপনাদের দেখা পেয়ে—মিঃ রস, মিঃ ডিটার্ট, মিঃ গ্রাভেল, মিঃ সুটার, মিসেস লোনার বলেই থতমত খেয়ে শুধরে নিলাম, না, না, মিসেস সুটাব ." আমার কথায় সকলেই প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন। হাঁ, ঐ অভিযানেই ওঁদের প্রণয় এবং এখন তো দেখতেই পাচ্ছি তাঁরা পরস্পরকে বিবাহ করেছেন।

আমার প্রিয় সুইস বন্ধুরা সুখে থাকুক।

পবিত্র লাসা যাত্রা

১৯৪৮ সাল আমার জীবনে এমন একটা বছর যা অন্য যে কোনও বছরের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। এই বছরে কোনও অভিযান এমন কি পাহাড়ে যাবার মত কোনও ঘটনা ঘটেনি। এর বদলে ন'মাস ধরে তিব্বতের লাসা এবং অন্যান্য স্থানে ভ্রমণ করলাম। পশ্চিমের লোকেদের কাছে লাসা এক নিষিদ্ধ স্থান কিন্তু যে কোনও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর পক্ষে এক পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এভারেস্ট আরোহণের জন্যে যে লড়াই তা চিরকালই আমার কাছে এক মধুর স্মৃতি আর এই পবিত্র তীর্থ দর্শন সেও কিছু কম সুখকর নয়।

সুইসদের সঙ্গে অভিযান সাঙ্গ করে ঘরে ফিরেছি—নিঃসম্বল। কোথাও কোনও কাজ নেই। দেশে এক অনিশ্চিত অবস্থা। অভিযানের জন্যে কেউ ডাকে না। এই ভাবে শরৎ পার হয়ে শীত এসে গেল। স্ত্রী আং লামু আজও লোকের বাড়ি আয়ার কাজ করে। মেয়ে পেম পেম আর নিমা বড় হচ্ছে, ওদের খাওয়াপরার সমস্যা রয়েছে, দারিদ্রের কষাঘাতে আমি জর্জরিত—ভাবছি কি করব! শেষকালে কি টাইগার ব্যাজটা বেচে দেব? এরই মধ্যে শাশুড়ীর দেহ অবসান হল। বিগত দুটি বছর তিনি রোগশয্যায় কাটিয়েছেন। মৃত্যুর আগে লেপের তলা থেকে শীর্ণ হাতটা বার করে আমায় আশীর্বাদ করলেন, "তেনজিং, তুমি আমার খুব যত্ন করেছ; তোমার তুলনা হয় না। তোমার কষ্টের অবসান হোক। করুণাময় গৌতমবুদ্ধ তোমায় করুণা করুন।" এরপর থেকে আমার নিদারুণ দারিদ্রের অবসান শুরু হল।

বসন্তকালে খবর পেলাম যে দার্জিলিং-এ একজন মজার লোক আসছেন, নাম- প্রফেসর জুসিপি তুচ্চি (Giuseppe Tucci), ইতালির লোক। প্রাচ্য বিদ্যায় অসাধারণ পণ্ডিত। এর আগে সাতবার তিব্বতে গিয়েছেন। এবারেও এসেছেন একই উদ্দেশ্যে। তিনি কার্মা পালের অফিসে যোগাযোগ করলেন পথপ্রদর্শক আর মালবাহকের জন্যে। আমি তাড়াতাড়ি কার্মা পালের অফিসে গেলাম যদি একটা কাজ পাওয়া যায়। কিন্তু আমি পৌঁছবার আগেই তিনি লোকজন জোগাড় করে রওনা হয়ে গেছেন। আমি দারুণ হতাশ হলাম। কয়েক দিনের মধ্যে প্রফেসার তুচ্চি খবর পাঠালেন যে তিনি ঠিক যে ধরনের পথ পদর্শক চেয়েছিলেন লোকটি সে কাজের যোগ্য নয়। এক্ষুনি একজন উপযুক্ত লোক পাঠানো হোক। তিনি এমন ধরনের লোক চেয়েছিলেন যে মোটামুটি ভাবে তিব্বতী, নেপালী, হিন্দুস্থানী এবং ইংরেজী ভাষা জানে। দার্জিলিং-এ আমিই একমাত্র ভাষাগুলি অল্পবিস্তর বলতে আর বুঝতে পারি। পরদিন সকালে কার্মা পাল আমাকে তাঁর অফিসে ডেকে পাঠালেন। এবং ঐদিন আমি গাংটকের পথে তুচ্চির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

প্রথম দর্শনেই বুঝলাম তিনি এক অদ্ভুত মানুষ। নিজের কাজ ছাড়া তিনি কিছুই বোঝেন না আর অভীষ্টের সাধনায় সদাই ধ্যানমগ্ন। জীবনে যত পর্বতপ্রেমী দেখেছি তারা মোটামুটি ভাবে শান্ত স্বভাবের হয়। কিন্তু এ লোকটা প্রচণ্ড রাগী আর একটুতেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। পান থেকে চুন খসবার উপায় নেই। গাংটকে পৌঁছে দেখি তিনিই যে শুধু শেরপাদের সম্বন্ধে বিরক্ত হয়ে আছেন তাই নয় শেরপারাও তাঁর সম্বন্ধে খুবই বিরক্ত। তারাও ফিরতে পারলে বাঁচে। আমি যেতে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। বিভিন্ন

ভাষায় অনর্গল প্রশ্ন বং বং চং চং .... বাপরে! যেন বোম ফাটছে। তারপর হঠাৎই থেমে গিয়ে বললেন, ঠিক আছে তোমাকে কোনওরকমে চালিয়ে নেওয়া যাবে। আমি রাজী হয়েছি শুনে অন্যান্য শেরপারা ভাবল নির্ঘাৎ আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আর আমিও সেই একই কথা ভাবছি, আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু মানুষটাকে আমার দারুণ ভাল লেগে গেছে। এমন লোক আমি জীবনে দেখিনি। দলে প্রফেসার তুচ্চি ছাড়া আরও দুজন ইতালীয় রয়েছে। এ ছাড়া একজন শেরপা যে রাঁধুনীর কাজ করবে একজন মোঙ্গলীয় লামা, তিনি দার্জিলিং থেকে নিজের কাজে লাসা যাচ্ছেন আর আমি ছাড়াও কিছু মালবাহক রয়েছে। সবকিছু গুছিয়ে আমরা গাংটক থেকে উত্তরে হাঁটা শুরু করলাম। মালবাহকদের কিছুদিন সঙ্গে রেখে ছেড়ে দেওয়া হত এবং পথে আবার সংগ্রহ করা হত। সিকিম সরকারের সহায়তায় একশ খচ্চর জোগাড় হয়েছিল বাড়তি মালপত্রের জন্যে। আর আমরা চলেছি ঘোড়ায়—এই হল সমগ্র ব্যবস্থা। খাবার এবং অন্য সাজসরঞ্জাম ছাড়াও তুচ্চি অনেকগুলি বাক্স নিয়েছেন মূল্যবান সংগ্রহ নিয়ে আসার জন্যে। কিছু বন্দুক আর হরেক নতুন সামগ্রী, উপহার দেবার জন্যে। প্রথম দিন থেকেই তিনি আমাকে এই সমস্ত দেখাশুনার ভার দিলেন, বললেন, "এরপর থেকে আমাকে যেন এই সমস্ত বিষয়ে একদম ভাবতে না হয়, বুঝেছ?" বাক্সের চাবি টাকা পয়সা সব কিছু আমার কাছে জমা দিয়ে তিনি ভার মুক্ত হলেন। নিজের সাধনার কাজে তিনি অত্যন্ত কড়া ধাতের লোক কিন্তু আর যাবতীয় ব্যাপারে ভোলাভালা অগোছালো। আমার প্রতি তাঁর এই বিশ্বাস এবং নির্ভরতায় আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সিকিম পাহাড়ে আমরা চলেছি ঘোড়ায় চেপে, কখনও উঁচুতে উঠছি, কখনও নামছি। ঘোড়ায় চড়া আমার কোনওদিন অভ্যেস ছিল না। মনে হচ্ছে পাছায় ফোঁড়া হয়েছে. দিনের পর দিন পিঠে বোঝা নিয়ে পাহাড়ী পথে হেঁটেও আমার এমন কষ্ট হয়নি। কোনও দিন হয়ত সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ঘোড়ার পিঠে চেপে চলেছি আবার কোনওদিন অল্প গিয়েই বিরতি। কেউ জানেনা কখন কোথায় তুচ্চি থামাতে বলবেন। কখনও বা চলতে চলতে হঠাৎই পথ বদলে কোনও শহরে বা বৌদ্ধ মঠের দিকে যেতে শুরু করলেন। কারণ তাঁর ধারণা হয়েছে এ অঞ্চলে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন আছে। আগেই জেনেছি তুচ্চি একজন পন্ডিত মানুষ, কিন্তু যেটা জানতাম না তা হল, তিব্বতের খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধে এত তথ্য তাঁর জানা আছে যে সে দেশের অধিবাসীরা তার কণামাত্র জানে কিনা সন্দেহ। কতগুলো ভাষায় তিনি কথা বলতে পারতেন তারও কোনও হিসেব নেই, অনেক সময় এমন হয়েছে যে এক ভাষায় শুরু করে তিনি অন্য ভাষায় বলছেন এবং শেষ করলেন আর একটা ভাষায় আর কোনওদিনই আমাদের মাতৃ-ভাষা ইতালীয় অথবা শেরপাতে আমরা কথা বলিনি। তাঁর কাছ থেকে প্রতিদিনই নতুন কিছু শিখছি যেমন করে শিশু পাঠশালায় গুরুমশাইয়ের কাছে শেখে। তফাৎ শুধু, এ এক চলমান পাঠশালা।

আমি জানলাম একটা বৌদ্ধ মঠ মানে পাথরের তৈরি একটা বাড়িই শুধু নয়, যেখানে ভিক্ষু ভিক্ষুণীরা বাস করে, পরন্তু এ এক অগাধ জ্ঞানের আকর। এখানে বহু দুষ্প্রাপ্য এবং মূল্যবান সব হাতে লেখা পুঁথি আছে, দেওয়ালে আছে অসামান্য শিল্পকর্মের নিদর্শন। আমরা মূলত সেই সব স্থান দর্শন করছি যা ঐতিহাসিক ভাবে খ্যাত, পণ্ডিতদের সঙ্গে সেই সব বিষয়

নিয়েই আলোচনা করছি যার গুরুত্ব আছে, আর সংগ্রহ করছি দুর্মূল্য সব নিদর্শন এবং দুষ্প্রাপ্য পুঁথি। কাঞ্চনজঙঘাকে বাঁয়ে রেখে আমার চলেছি। কাঞ্চনজঙঘা সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা আছে এমন একটা ধারণা আমার ছিল। কিন্তু এর নামের যে একটা মহান এবং গভীর অর্থ আছে তা পণ্ডিত তুচ্চির কাছ থেকে জানতে পেরে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। চারটি তিব্বতী শব্দের যোগফল কাঞ্চনজঙঘা। 'কাঙ্গ' মানে তুষার, 'চেন' মহান, জোড় সংগ্রহশালা অথবা সঞ্চিতধন, নঙ্গা মানে পাঁচ। কাঞ্চনজঙঘার সঠিক তিব্বতী উচ্চারণ হল 'কাঙ্গ-চেন-জোড়-নঙ্গা'। আর এর পুরো মানেটা হল—পাঁচটি সঞ্চিত ধন সহ মহান পর্বত। কাঞ্চনজঙঘার পাঁচটি শীর্ষ আছে। এই পাঁচটি সঞ্চিত ধন শীর্ষের আবার আলাদা নাম আছে।

সা(লবণ), সের ডং ঈ (সোনা এবং নীলকান্তমণি), ডাম চো ধাংনর (পবিত্র পুঁথি এবং ঐশ্বর্য), মৎসন (অস্ত্রশস্ত্র) এং লো থগ্ ধাং মেন (শস্য ও ঔষধ)। কি গভীর মর্মস্পর্শী ব্যাখ্যা। এখন বুঝতে পারলাম আমাদের পর্বতমালাসমূহ শুধু তুষার এবং বরফের স্তুপ নয় এগুলির ইতিহাস আছে, এবং এরা পৌরাণিক গাথার সম্পদে সমৃদ্ধ।

কাঞ্চনজঙঘাকে পিছনে ফেলে উঁচু পাহাড় ডিঙ্গিয়ে আমরা তিব্বতে প্রবেশ করলাম। তিব্বতের যে শহরে আমরা প্রথম পদার্পণ করলাম তার নাম যাতুং। এসেই পড়লাম এক সমস্যায়। তুচ্চির বাকি দুই ইতালীয় সঙ্গীর তিববতে প্রবেশের কোনও বৈধ ছাড়পত্র নেই। অন্যদিকে ডেনম্যানের মত ঝুঁকি নেবার সাহসও তাদের নেই, আবার নেই লুকিয়ে চলার ইচ্ছেও। কাজেই তাদের ফিরতে হল। কিন্তু আমাদের প্রতি তিব্বতের মানুষের আতিথেয়তার কোনও ত্রুটি ছিল না। সিকিমের মত এখানেও এরা ভারবাহী পশুগুলি ভাড়া দিয়ে সাহায্য করল। তুচ্চির কাছে এসব অঞ্চল যথেষ্ট পরিচিত। এর আগে আমি ছ'বার তিব্বতে এসেছি, তার সবই এভারেস্ট অভিযানে রংবুকে আসা। যাতুং-এ অল্প বিশ্রাম নিয়ে আবার আমাদের চলা শুরু হল। এ অঞ্চলের সবই আমার অপরিচিত। যত এগিয়ে যাচ্ছি আমার হৃদস্পন্দন ততই বাড়ছে, আমি যেন বিশ্বাস করতে পারছি না যে সত্যি সত্যি আমি পবিত্রভূমি লাসা চলেছি।

'ওম মণি পদ্মে হুম'... ইংরেজরা বলে এটা শুনে তাদের মনে হয় কেউ যেন বলছে 'ওম মানি পেনি হুম'.....। এ মন্ত্র একজন ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধের কাছে অত্যন্ত পবিত্র, ইংরেজের সাধ্য নেই এর গভীর অর্থ অনুধাবন করে। 'সকল রত্ন রয়েছে পদ্মের মাঝে—একজন আত্মদর্শী বৌদ্ধছাড়া এর গূঢ় অর্থ উপলব্ধি করা সহজ নয়'। যেখানেই তুমি বৌদ্ধদের একত্রিত দেখবে সেখানেই এই মন্ত্র গান হয়ে ভ্রমরের গুঞ্জনের মত শ্রুত হবে। প্রার্থনা চক্রের প্রতি পাকে, শ্বেত পতাকার পদতলে একটিই গান 'ওম মণি পদ্মে হুম'। তিব্বত এক পবিত্র দেশ, আর লাসা সবর্বাপেক্ষা পবিত্র স্থান। প্রত্যেক বৌদ্ধ ধর্মলম্বীর স্বপ্ন যেন সে একবার লাসায় যেতে পারে। যেমন একজন খৃস্টানের কাছে জেরুজালেম কিম্বা একজন মুসলমানের কাছে মক্কা। আমার ধর্মভীরু পিতা এবং স্নেহময়ী মাতার একটাই সাধ ছিল, তাঁরা একবার ঐ পবিত্র তীর্থ দর্শন করবেন। তাঁদের সে সাধ কোনওদিন পূর্ণ হয়নি। তাঁদের সে সাধ পূর্ণ হবে আমার আত্ম নিবেদনের মধ্যে দিয়ে- আমরা লাসার দ্বারপ্রান্তে এসে গেছি। আমি এসেছি আমার সকল আত্মীয়স্বজনের ইচ্ছার প্রতিনিধি হয়ে। ইয়াকের দুধ থেকে জমানো শক্ত মাখনের টুকরো সঙ্গে

এসেছি, প্রতিটি মঠে শান্তির প্রদীপ জ্বালিয়ে দেব। মনে পড়ে মৃত্যুকালে আমার স্বর্গগতা শাশুড়ী আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন, তোমার সকল সাধ পূর্ণ হোক। আজ আমার এই পরম তীর্থভ্রমণ তাঁরই আশীর্বাদ—করুণাময় বুদ্ধের পদতলে আমি তাঁর জন্যে প্রার্থনা করলাম। বৌদ্ধরা মনে করে লাসা দর্শন না করলে তার জীবন ব্যর্থ, আজ আমি পরম সৌভাগ্যবান যে আমার পূর্ণজীবন লাভ হতে চলেছে, আমি ধন্য।

প্রত্যেক বৌদ্ধ মতাবলম্বীদের মত আমার ধর্মে গভীর বিশ্বাস। তাই বলে আমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন নই। আচার সর্বস্বতা কিম্বা অন্ধবিশ্বাস কোনওটাই আমার নেই। প্রেতাত্মাদের সম্বন্ধে আমার কোনও বিশ্বাস নেই। কিছুদিন আগে রটে গেল যে টুংসুং বস্তিতে এক স্ত্রীলোকের প্রেতাত্মা ঘোরাফেরা করছে, তা আমি বেরিয়ে পড়লাম প্রেতাত্মার খোঁজে, কৈ তেমন কিছু তো চোখে পড়ল না। আমাদের ধর্মে এমন বহু লোক আছে, যারা মনে করে একমাত্র বৌদ্ধধর্মই সঠিক, বাকি ধর্ম ভুলে ভরা। আমি অশিক্ষিত মানুষ, পণ্ডিত লামা নই। কিন্তু আমি হৃদয় থেকে অনুভব করি এই পৃথিবীর সকল ধর্ম, জাতি এবং মানুষের নিজ নিজ বিশ্বাস লালন করার অধিকার আছে। মোদ্দা কথা আমি বিশ্বাস করি ভয়ের সঙ্গে নয় ভালবাসায় ঈশ্বরের কাছে পৌঁছনো যায়। সত্য একটাই, কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে সেই সত্যের সাধনার পথগুলি ভিন্ন। লৌকিক কর্মকাণ্ড বৌদ্ধই হোক কিম্বা খৃস্টান হোক বাহ্যত অনেক সময় আড়ম্বরপূর্ণ হয়ে যায় যাতে ঈশ্বরের প্রতি আসল ভালবাসাটাই যায় কমে। আমাদের অনেক লামাই পণ্ডিত এবং ভক্তিমান। আবার অনেককে দেখলে অবাক লাগে, মানুষকে শিক্ষা দেওয়া দূরের কথা একপাল ইয়াক প্রতিপালন করার যোগ্যতা তাদের নেই। এরা লামা হয়েছে ঈশ্বরের জন্যে নয়, পরন্তু অল্প কাজ করে অনেক আরামে থাকবে বলে।

আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে এই অযোগ্য লামাদের নিয়ে একটা শ্লেষাত্মক হাসির গল্প প্রচলিত আছে। দু'জন লামা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াত এবং ভণ্ডামি করে তাদের ধান্ধা গুছিয়ে নিত। এইভাবে একবার তারা এক গ্রামের একটা বাড়িতে গেল কিছু পাবার আশায়। সেই বাড়ির গৃহকর্ত্রী তখন উনুনে হালুয়া বানাচ্ছে। দরজার সামনে এসে অভিবাদন করে তারা প্রার্থনা চক্র ঘোরাল, যে কোনও কারণেই হোক গৃহকর্ত্রী সেই সময় উঠে বাড়ির মধ্যে গেল, এই সুযোগে একজন লামা ঘরে ঢুকে ফুটন্ত কড়াই থেকে খানিকটা হালুয়া তুলে নিল আর ঠিক সেই সময় কর্ত্রী ফিরে এল। এবার সেই চোর লামা কি করবে বুঝতে না পেরে মাথার সূচাল টুপির মধ্যে হালুয়াটুকু ভরে তাড়াতাড়ি মাথায় পরে নিল। এবার কেটে পড়ার ধান্ধা। মহিলাটি কিন্তু লক্ষ্য করেননি যে তাঁর ফুটন্ত কড়াই থেকে বেশ কিছুটা হালুয়া উধাও। সংসারের কল্যাণের জন্যে তিনি ভক্তিভরে লামাদের অনুরোধ করলেন কিছু প্রার্থনা করার জন্যে। লামারা প্রার্থনা শুরু করল, সবই ঠিক চলছে এমন সময় দ্বিতীয় লামা দেখে প্রথম জনের টুপির ফাঁক দিয়ে হালুয়া গড়িয়ে আসছে। এখন কি করে প্রথম জনকে সতর্ক করা যায় এই মতলবে সে ওঁ মণি পদ্মে হুম বলার ঢঙ্গে বলতে থাকে "গুনমণি—ঐ হালুয়া দেখা যায়.. পদ্মে হুম... লুকিয়ে পড়।" কিন্তু প্রথম জন এসব কিছুই বুঝতে পারছে না সে শুধু বাঁদরের মত লাফাচ্ছে। আর বলছে ... "ওম মণি পদ্মে হুম...।" এবার দ্বিতীয় জন মরিয়া হয়ে চিৎকার করে আর বলে... "ওম মণি পদ্মে হুম... হালুয়া! ঐ যে হালুয়া গড়াচ্ছে....।" প্রথম জনের

অবস্থা তখন ভয়ঙ্কর। তার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে। গরমের জ্বালায় সে চিৎকার করে ওঠে, "ধ্যেৎ তেরি! সব শুকরছানা বেরিয়ে এলেও আমি পরোয়া করিনা। আমার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে।" এই হল গল্প। কাজেই আমি ঐ সব লামাদের সেবার জন্যে অথবা তাদের টুপির মধ্যে লুকিয়ে রাখার জন্যে হালুয়া তৈরি করার পক্ষপাতি নই।

যেমন আমি এভারেস্ট শীর্ষে আরোহণের পর অনেকে অনুরোধ করেছিল যে যদি দার্জিলিং-এর কাছে একটা মঠে কিছু অর্থ দান করি। আমি মনে করেছিলাম ঐ ভাবে কিছু লোকের সুবিধে করে দেওয়ার চেয়ে ঐ টাকায় আমি দার্জিলিং-এ একটা অতিথিশালা বানিয়ে দেব। গরিব মানুষেরা যেখানে এসে বিশ্রাম নিতে পারবে। আমি বরাবর বলেছি যে আমি একজন ধর্মভীরু মানুষ এবং আমি আমার সততা ভর ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী চলি। লোক দেখাবার জন্যে আমার ধর্মাচরণ নয়। আজ আমার এই যে তিব্বত পরিক্রমা এ শুধু নিজের শান্তির জন্যে নয়। আমি আমার পিতামাতার জন্যে পূজো করছি, শ্বাশুড়ী মাতার জন্যে প্রার্থনা করছি, আমার এই পরিক্রমা আমার সকল আত্মীয়ের জন্যেই। ওম মণি পদ্মে হুম... ওম মণি পদ্মে হুম... সকল ঐশ্বর্য ঐ পদ্মের মধ্যেই লুকিয়ে আছে...। আমরা সরাসরি 'চোরটেন' বা বৌদ্ধ স্তূপগুলি পার হবার সময় রীতি অনুযায়ী তার মণিময় দেওয়ালগুলির বাঁ দিক দিয়ে অতিক্রম করছি, চোরটেনগুলি মৃত আত্মাদের রক্ষা করে তাই আমাদের বিশ্বাস। হাওয়ায় উড়তে থাকা প্রার্থনা পতাকা দেখলে তার নিচে দিয়ে যাচ্ছি আর প্রার্থনা চক্র থাকলে হাত দিয়ে ঘুরিয়ে দিচ্ছি, দূরে পর্বতগাত্রে বৌদ্ধমঠগুলি দেখতে দেখতে যাচ্ছি... অবশেষে আমরা লাসায় চলেছি, আমার আত্মার শান্তি, প্রাণের আরাম সকল চাওয়ার পরম পাওয়া লাসা...।

এই পরিভ্রমণ আর পথ চলায় কুড়ি দিন পার হয়ে গেছে। আমরা পথ চলছি অতিদ্রুত। পথ চলায় প্রফেসার তুচ্চির কোনও ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই। কিন্তু বৌদ্ধমঠ দেখলেই তিনি থেমে পড়েন। যা তিনি খোঁজেন তা হল প্রাচীন পুঁথি এবং শিল্পকর্ম। সাধারণ ভ্রমণার্থীর মত বাজারে সস্তা জিনিস দেখায় বা কেনায় তাঁর আগ্রহ নেই। তিনি নিশ্চিত রূপে জানেন এখানে তিনি কি খুঁজতে এসেছেন। লামারাও তাঁর অনুসন্ধিৎসা দেখে বিস্মিত হন। তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। এমন এমন বিষয়ে তিনি কথা বলেন, এমন জিনিসের সন্ধান করেন যা তাঁদেরও জ্ঞানের অতীত। গভীর রাত পর্যন্ত তিনি তাঁর তাঁবুর মধ্যে আলো জ্বেলে পড়াশুনো করেন এবং বিভিন্ন পুঁথি থেকে টীকা টিপ্পনি লিখে নেন। সেই সময় কেউ তাঁকে বিরক্ত করলে ভয়ঙ্কর রেগে যেতেন। এমনও হয়েছে যে গভীর রাত্রে তিনি লাফিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে ঘোষণা করতেন, আমার কাজ শেষ। এবার রওনা হবার জন্যে সবাই প্রস্তুত হও। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উঠে পড়তে হত এবং রওনা হবার প্রস্তুতি শুরু করতাম। অবশেষে একদিন সেই ধূলি ধূসর চলা শেষ হল; শেষ হল ইয়াকের দুলকি চাল, বৌদ্ধ মঠের সারি, দুই পাহাড়ের মাঝখানে মালভূমি—সেখানে পবিত্র শহর লাসা, আমরা পৌঁছে গেলাম।

চওড়া চওড়া রাস্তা, বাজার, লোকজনের ভিড়, গাদাগাদি করে ভারবাহী পশুদের মাল বওয়া এবং সবার ওপরে পাহাড়ের মাথায় পবিত্র পোতালা প্রাসাদ। এখানেই দলাই লামা থাকেন। পাহাড়ের ওপরে কিছুক্ষণ থেমে আমরা পোতালা প্রাসাদটিকে দর্শন করলাম, তারপর শহরের দিকে এগিয়ে গেলাম।

প্রফেসার তুচ্চি অতীতে এখানে এসেছেন, সবাই তাঁকে চেনে, যথেষ্ট খাতির করে। সরকারী, বে-সরকারী বহু মানুষ তাঁকে স্বাগত জানাল এবং থাকার জন্যে আমাদের একটা সুন্দর বাংলো দেওয়া হল। তাঁর আগমন বার্তা পেয়ে শহরের বাইরে থেকেও কেউ কেউ এসেছেন পায়ে হেঁটে অথবা ঘোড়ায় চেপে তাঁকে দেখার জন্যে। এমন দৃশ্য আমি আগে দেখিনি। প্রফেসার তুচ্চিকে যথাযথ অভিবাদন জানিয়ে এবং কুশল বিনিময়ের পর তারা আমার দিকে মনোযোগ দিল। তাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে যে আমি কোথাকার লোক। আমাকে তিব্বতীদের মত দেখতে, কিন্তু পোশাক আশাক কথাবার্তা সম্পূর্ণ ভিনদেশী। এদিকে আমি তাদের ভাষায় কথা বলছি দেখে তারা যারপরনাই বিস্মিত হল। এরপর যখন শুনল আমি শেরপা এবং পর্বতারোহণে দক্ষতা আছে তখন নানা প্রশ্ন করতে শুরু করল। একদিন সরকারী কর্মচারীদের দেওয়া সংবর্ধনা সভায় আমি সুইসদের সঙ্গে গাড়োয়াল পর্বত অভিযানের ছবি দেখালাম। এভারেস্ট সম্বন্ধেই তাদের আগ্রহ বেশি। চোমোলোংমা ছাড়া অন্য কোনও পর্বত থাকতে পারে এটা তাদের ধারণা নেই। তারা আমাকে বারবার জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা তুমি কি মনে কর এর মাথায় কেউ উঠতে পারবে?

—"চেষ্টা করলে মানুষের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।" আমি বলি।

—"কিন্তু তুমি তো জান, কত দেবতা আর অপদেবতার আবাসস্থল ঐ পর্বত। তোমার কি এর মাথায় উঠতে ভয় করবে না?" তারা শঙ্কিত হয়।

—"মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না। রাস্তায় চলতে গিয়েও তো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাহলে কেন পাহাড়ে উঠতে আমি ভয় পাব?" আমার নিঃশঙ্ক উত্তর।

লাসায় সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা হল দলাই লামার দর্শন পাওয়া। একবার নয়, দু-দুবার। তাঁর মুখোমুখী হবার আগে পোতালা প্রাসাদের বহু ঘর এবং বারান্দা পার হতে হল এবং তারপর তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম। তখন তিনি মাত্র পনেরো বছরের এক বালক। কিন্তু গাম্ভীর্য এবং মর্যাদায় উদ্ভাসিত তাঁর মুখ। তাঁর মুখের দিকে সরাসরি তাকানো সম্ভব নয়, নতজানু হয়ে বসে পড়তে হয়। প্রফেসর তুচ্চি তাঁর পুরনো বন্ধু, তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট হৃদ্যতা রয়েছে।

দলাই লামা বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে বহুক্ষণ প্রফেসার তুচ্চির সঙ্গে আলোচনা করলেন। আমার সৌভাগ্য যে আমি সেখানে উপস্থিত থেকে তাঁদের আলোচনা শুনতে পেয়েছিলাম। আলোচনার শেষে তিনি আমাদের আশীর্বাদ করলেন। পোতালা থেকে ফেরার সময় পরম তৃপ্তিতে আমার হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেল। এই সবকিছুই ঘটল আমার পিতামাতার আশীর্বাদে।

খুব কম লোকেরই বিশেষ করে পাশ্চাত্যের লোকেদের দলাইলামা সম্বন্ধে কোনও ধারণা আছে। কোন তিব্বতী তাদের ধর্মের প্রধানকে এই নামে ডাকে না। তারা ধর্মের প্রধানকে গিয়ালওয়া রিমপোচে বলে। গিয়ালওয়া মানে যিনি সব কিছু জয় করেছেন অর্থাৎ প্রভু, অন্যভাবে এর মানে হল 'প্রভু, বুদ্ধ' রিমপোচে মানে একজন পবিত্র আত্মা। অনেক সময় উচ্চমার্গের লামাদের রিমপোচে উপাধি দেওয়া হয়, কিন্তু গিয়ালওয়া একমাত্র ধর্মের প্রধানকেই বলা হয়। দলাই লামা হলেন গিয়ালওয়া রিমপোচে। তিব্বতের অধিবাসীদের কাছে দলাইলামা বলে কোনও প্রভু নেই।

লাসাতে আমরা দুজন চমকপ্রদ বিদেশীর দেখা পেলাম। একজন হাইন রিক হারার অন্যজন

পিটার আউফস্নাইটার। ১৯৩৯ সালে জার্মান নাঙ্গা পর্বত অভিযানের দুজন সদস্য। বিশ্বযুদ্ধ শুরুর গোড়ার দিকে তাঁরা ভারতবর্ষে ধরা পড়েন এবং বৃটিশরা তাদের রাজবন্দী করে রাখে। বহু চেষ্টা করে তাঁরা পালাতে সক্ষম হন এবং বহু দুর্গম পথ পার হয়ে লাসায় পৌঁছন এবং সেখানে বাস করার অনুমতি পান। তাঁদের এই কাহিনী হারার তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'সেভেন ইয়ার্স ইন টিবেট'-এ লিপিবদ্ধ করেছেন। আমাদের সঙ্গে যখন তাঁদের দেখা হয় তখন কয়েকটা বছর তাঁরা তিব্বতে কাটিয়ে দিয়েছেন। আজ তাঁরা তিব্বতকে ভালবেসে ফেলেছেন, এখানেই থেকে যেতে চান। পাশাপাশি বহির্বিশ্বের খবর জানার জন্যে তাঁদের প্রচুর আগ্রহ। পর্বতারোহণ সম্বন্ধে বহির্বিশ্বে কেমন আগ্রহ রয়েছে হারার সে সম্বন্ধে আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন। অবশেষে বিষাদমাখা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তেনজিং তুমি কত ভাগ্যবান। ইচ্ছা করলেই যে কোনও অভিযানে যেতে পার। আমি দেখ কেমন পরিস্থিতির শিকার। কোনও অপরাধ নেই অথচ রাজবন্দী হয়ে কাটাতে হচ্ছে, ইচ্ছে করলেই কোনও অভিযানে যেতে পারব না।' হঠাৎ মুখে উদ্ভাসিত হাসি ছড়িয়ে বলে ওঠেন, 'চল আমরা দু'জন এখান থেকে সোজা কোনও অভিযানে চলে যাই। কিছুক্ষণের জন্যে আমরা এমনই এক অভিযানের পরিকল্পনায় মগ্ন হয়ে গেলাম। কিন্তু খুঁটিনাটি আলোচনা করে বুঝলাম এমন অভিযানের কোনও সম্ভাবনাই নেই। এর কিছুদিন পরে আমরা লাসা ছেড়ে চলে এলাম। এর কয়েক বছর পর দার্জিলিং-এ হারারের সঙ্গে দেখা। কম্যুনিস্টরা তিব্বতে প্রবেশ কর‍্যার পর তিনি দলাই লামার সঙ্গে তিব্বত ছেড়ে চলে আসেন। দলাই লামাও তিব্বত ছেড়ে ভারতবর্ষে চলে আসার পরিকল্পনা করেন কিন্তু সীমান্ত প্রদেশ যাতুং পর্যন্ত এসে মত বদলে আবার ফিরে যান। কিন্তু হারার সোজা ভারতবর্ষে চলে আসেন। এই সাত বছর তিনি হৃদয় দিয়ে তিব্বতকে ভালবেসেছিলেন আর যখনই ভাবতেন আর কখনও তিব্বতে ফিরে যেতে পারবেন না তখন তাঁর মুখটি বড় করুণ হয়ে উঠত।

প্রফেসর তুচ্চির সঙ্গে আমি একমাস লাসায় ছিলাম, সেখান থেকে আরও সাত মাস ধরে তিব্বতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াই। তাঁর ইচ্ছা ছিল পূর্বদিকে চীনের সীমান্ত বরাবর এগিয়ে যাবেন কিন্তু তখন কম্যানিস্ট চীন তিব্বতে প্রবেশের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তুচ্চির মত দুঃসাহসী মানুষও এই সময় কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে চাননি। যে পথে তিব্বতে প্রবেশ করেছিলাম আবার সেই পথেই ফিরে এলাম। এ যাত্রায় আমার সবচেয়ে লাভ হল বৌদ্ধধর্মের পবিত্রভূমিতে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বহু কিছু দেখলাম ও জানলাম। আমি ছিলাম একজন বিদগ্ধ পণ্ডিতের সহকারী। যা দেখেছি তিনি তা আমাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

টাকা পয়সার ব্যাপারে তুচ্চি কেমন অসহায় বোধ করতেন, আলোচনা করতেও বিরক্ত বোধ করতেন! এমন হল যে ধীরে ধীরে অভিযানের আর্থিক বিষয়সমূহ পুরোপুরি আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে স্বস্তি পেলেন। মঠ থেকে অর্থের বিনিময়ে কিছু সংগ্রহ করতে হবে, তিনি চিঠি লিখে আমায় পাঠিয়ে দিলেন এবার আমি সেই সব মূল্যবান সামগ্রী, পুঁথি সংগ্রহ করে দরদাম ঠিক করে, দাম মিটিয়ে নিয়ে আসতাম। শেষকালে এমন হল যে লামারা আমাকে তুচ্চির 'নেবালা' বা ম্যানেজার বলতে শুরু করল। এই রকম কাজ করতে করতে আমরাও এমন অভিজ্ঞতা হল যে ইচ্ছে করলে তিব্বতের বৌদ্ধমঠ সম্বন্ধে আমিও একটা বই লিখতে

পারি। ধীরে ধীরে সঙ্গে আনা বাক্সগুলির প্রায় সবই বিভিন্ন মূল্যবান সংগ্রহে ভরে গেল। পাশাপাশি আমিও আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে অনেক দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী জমা করলাম। দার্জিলিং-এর বাড়িতে যে মুখোশ কিম্বা তরবারি অথবা শিরস্ত্রাণ রয়েছে তার বেশির ভাগই আমার এবারের যাত্রায় সংগ্রহ করা। এবার নিয়ে তুচ্চি অটবার তিব্বতে এলেন। আসলে তিনি খুঁজছেন দু হাজার বছরের পুরনো এক দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন পুঁথি. যেটা সংস্কৃত ভাষায় ভূর্জপত্রে লেখা। বহু বিদগ্ধ পন্ডিত বিশ্বাস করেন যে এই পুঁথি তিব্বতেই আছে . আজও যার কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। প্রফেসর তুচ্চির মতে পুঁথিটি বহু অতীতে তুর্কীস্থানে লেখা হয়েছিল যেখানে একসময় বৌদ্ধ ধর্ম প্রসার লাভ করেছিল। বেশ কয়েক বছর আগে পুঁথিটি তিব্বতে আনা হয় এবং ঘাংগারের বৌদ্ধমঠে তা রাখা আছে। হতে পারে এটা তাঁর ধারণা কিন্তু তিনি বলেন যে এ সম্বন্ধে তিনি প্রচুর গবেষণা করেছেন। ঘাংগারের মঠে এসে আমরা ঐ পুঁথির অনুসন্ধান শুরু করলাম এবং সেটা কোনও সোজা ব্যপার ছিল না। হাজার হাজার পুঁথি. গোটানো পত্র চারিদিকে বোঝাই হয়ে আছে. এদের সম্বন্ধে লামারাও কিছু জানেন না। দিনের পর দিন পার হয়ে যায় ধুলোর রাজত্বে তিনি তন্ময় হয়ে আছেন আর আমি ক্রমশ বিরক্ত হয়ে উঠছি। আমি বুঝতে পারছি যে সেটা এখানে নেই আর থাকলেও তাকে খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। তুচ্চি যখন কাজের মধ্যে ডুবে থাকেন তখন তাঁর কোনও দিকে খেয়াল থাকে না। একদিন সকালে দেখি যে উল্টো করে জামা গায়ে দিয়ে তিনি চলেছেন. এমনই ভুলো মন। কিন্তু এটা দেখে আমি উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। শেরপা মতে কেউ যদি উল্টো পোশাক গায়ে দেয় তবে তার অভিষ্ট সিদ্ধ হয়। আমি তাঁকে বললাম. দেখুন হয়ত আজ পুঁথিটা খুঁজে পাওয়া যাবে। আর ঘটলও তাই। এখন কেমন করে ব্যাপারটা ঘটল তাই বলি— পুঁথিটা প্রথম নজরে পড়ে আমার। ঐ পুঁথি সম্বন্ধে তিনি আমাকে এমন নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছিলেন যে একগাদা ধূলি ধূসর পুঁথির মধ্যে হঠাৎই সেটা আমার চোখে পড়ে। নিশ্চিন্ত হবার জন্যে যখন সেটি তাঁর হাতে তুলে দিলাম সেটা দেখে তাঁর সে কি আনন্দ! তোমরা কি কখনও কোনও সাধারণ মানুষকে সোনার খনি খুঁজে পেতে দেখেছ।

—আমি দেখিনি, তবে বুঝতে পারছি। তুচ্চির এ আনন্দ যে কোনও পার্থিব চাওয়া-পাওয়াকে ছাপিয়ে যায়....।

তুচ্চির এই অমূল্য প্রাপ্তির পাশাপাশি আমিও এক মূল্যবান জিনিস সংগ্রহ করলাম. সেটা কোনও মহামূল্য পুঁথি নয় তিব্বতী কুকুর। জীবজন্তুর প্রতি সব সময়েই আমার একটা টান আছে। লামাদের কাছে দুটো লম্বা কানওয়ালা লোমে ঢাকা কুকুর চাইলাম। তাঁরা আগ্রহের সঙ্গে আমাকে সে দুটি দান করলেন। লাসা আপসো জাতের কুকুর· দুটোর মধ্যে একটার নাম রাখলাম ঘাংগার অপরটির তাসাং। তারাও আমার সঙ্গে দার্জিলিং এল।

তাসাংকে আমার বন্ধু আং থার্কেকে দিয়ে দিলাম। ঘাংগার এখন আমার স্ত্রীর পায়ে পায়ে ঘুর ঘুর করে। এ সংসারেরই একজন। অন্য একটা লাসা আপসোর সঙ্গে জোড় খাটিয়ে ঘাংগারের অনেকগুলো বাচ্চা হয়েছে। আজ টুংসুং বস্তিতে যত এই জাতের কুকুর আছে এরা সবাই হয় ঘাংগারের ছেলেমেয়ে না হয় নাতি নাতনি।

এদিকে ঐ দুষ্প্রাপ্য পুঁথির জন্যে লামারা প্রফেসার তুচ্চির কাছ থেকে কোনও অর্থ নিতে চাইল না। যদিও তিনি বার বার তাঁদের অন্তত পাঁচশ টাকা নেবার জন্যে অনুরোধ করলেন। তাঁদের একটাই কথা যে এ পুঁথি তাঁদের কোনও কাজই লাগছে না আর বিদ্যা বস্তুটি বিক্রয়ের জন্যে নয়। যদি পুঁথিটি কারও কোনও কাজে লাগে তবে তাই লাগুক। শুধু অনুরোধ ইটালিতে ফিরে কাজ মিটে যাবার পর তিনি যেন অনুগ্রহ করে পুঁথিটি ফেরত পাঠান। চলে আসার সময় তুচ্চি প্রায় জোর করে মঠে পাঁচশ টাকা চাঁদা দিয়ে এলেন।

বহু দিন তিব্বতে থাকা হল। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, এবার ঘরে ফেরার পালা। আমাদের বাক্সগুলি দুর্মূল্য পুঁথি এবং মূল্যবান সামগ্রীতে পূর্ণ। আমরা দক্ষিণ দিকে হাঁটা শুরু করে সিকিমের গিরিবর্ত্ম পার হয়ে ভারতে প্রবেশ করলাম। শুধু একটা কথাই জানা ছিল না যে এটাই আমার শেষ তিব্বতে আসা। কারণ এর পরেই কম্যুনিস্টরা তিব্বতের অধিকার গ্রহণ করল। এখন থেকে নিষিদ্ধ দেশ তিব্বত বাকি দুনিয়ার কাছে চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। আজ একজন শেরপা হিসেবে আমার মাতৃভূমি শোলো খুম্বু থেকে গিরিবর্ত্ম পার হয়ে যদি তিব্বতে যেতে চাই তবে অবশ্যই লুকিয়ে যেতে হবে। আর যদি ধরা পড়ি তবে কি হবে জানি না। যাই হোক, আমার সঙ্গে ঘাংগার রয়েছে সে আমাকে সেই সব দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়। আমার সঙ্গে বহু উপহার আর মূল্যবান সামগ্রী রয়েছে যা আমাকে লাসার স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয়। সঙ্গে পোতালার সুখস্মৃতি, মহান দলাই লামার আশীর্ব্বাদ। স্মৃতিতে অম্লান সেই সব মঠ ও তীর্থ, আমার ভালবাসার এবং বিশ্বাসের পূণ্যস্মৃতি। আকাশে ঐ প্রার্থনা পতাকা শান্তির বাণী ছড়ায়। প্রার্থনা চক্রের সাথে সাথে কানে ভেসে আসে—ওম মণি পদ্মে হুম্... ওম মণি পদ্মে হুম...।

আমার স্বদেশ ও দেশবাসী

কোথায় আমার সত্যিকারের স্বদেশ? আমার আত্মার আত্মীয়তা তিব্বতের সঙ্গে। কিন্তু আজ আমি এক পর্যটক মাত্র, কখনও গিয়েছি সেখানে। পর্বত চূড়ায় আমার হৃদয় বাঁধা কিন্তু ঘর বানিয়ে সেখানে থাকা যাবে না অথবা আত্মীয়দের নিয়ে বাস করা যাবেনা। শোলো খুম্বুতে আমি এক দিন বাস করতাম এখন আর সেখানে থাকি না। আমার স্বজাতীয়দের অনেকেই এখনও রয়েছে সেখানে। কেউ কেউ রংবুকে রয়েছে, কেউ রয়েছে নেপালে এবং অল্প সংখ্যক ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে গেছে। তবে দার্জিলিং এখন নতুন প্রজন্মের শেরপাদের আসল স্বদেশ। আমি বহু বছর সেখানে বাস করছি, পুরনো জীবন ধারণ পদ্ধতি বদলে গেছে আমাদের, আধুনিক জীবনের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি। লাসা অথবা এভারেস্ট, গাড়োয়াল কিম্বা চিত্রল, দিল্লি অথবা লন্ডন সব জায়গা থেকেই শেরপারা এখন 'ঘরে' ফিরে আসে এই দার্জিলিং-এ। বহু বছর আগে থেকেই শেরপারা দার্জিলিং আসতে শুরু করে। এসেছিল তারা কাজের খোঁজে। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে (মনে রাখতে হবে বইটি লেখা হয়েছিল ১৯৫৪ সালে। কাজেই সাল তারিখ এবং সময়ের হিসাব রাখতে হবে ঐ ১৯৫৪ কে মূল সময় ধরে—অনুবাদক) ডঃ কেলাস অথবা জেনারেল ব্রুশ তাদের হিমালয় অভিযানে প্রথম শেরপাদের মালবাহক হিসাবে ব্যবহার করেন। আর তখন থেকেই এটা প্রচলিত হয় যে দার্জিলিং-এর শেরপারা পর্বতারোহণে দক্ষ। কুড়ি এবং ত্রিশের দশকে শেরপারা দলে দলে দার্জিলিং চলে আসে এবং সেই সময়ের এভারেস্ট অভিযানগুলিতে ব্যাপক হারে অংশগ্রহণ করে। শেষকালে এমন হল যে একটা পর্বত অভিযানে তাঁবু, দড়ি, খাবার দাবার এবং পর্বতারোহী যেমন অপরিহার্য অঙ্গ, তেমনি শেরপাও অপরিহার্য হয়ে পড়ল। শেরপা ছাড়া কোনও অভিযানের কথা ভাবাটাই অসম্ভব হয়ে পড়ল। যদিও সব শেরপাই পর্বত অভিযানে অংশ গ্রহণ করেনি, তবু অনেকেই তা করেছিল এবং তাদের অধিকাংশেরই দক্ষতা এত বেশি ছিল যে এটা প্রচলিত হয়ে গেল শেরপা মাত্রেই পর্বতারোহী।

আমরা পাহাড় থেকে এসেছি, আবার পাহাড়েই ফিরে যাচ্ছি। তবে এই ফিরে যাওয়া সম্পূর্ণ অন্য ব্যপার। শোলো খুম্বুতে আমরা চাষ করি, ইয়াক চরাই, কিন্তু পর্বত অভিযানে আমাদের কাজ সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। শোলো খুম্বুতে আমরা চাষাভূষো আর দার্জিলিং-এ শহরের লোক। এখন নতুন কাজ জুটেছে চা বাগানে, ছেলে মেয়েরা সেখানে কাজ করতে যায়। যুদ্ধের আগে আমি নিজেও কয়েক মাস চা বাগানে কাজ করেছি। তবে শক্ত সমর্থ যুবকেরা বেশির ভাগই পর্বতারোহণে অংশ গ্রহণ করে। বছরের অর্ধেক সময় পর্বতারোহণে মালবাহকের কাজ জোটে বাকি সময় তারা দার্জিলিং-এ মাল বয় নয় তো পর্যটকদের গাইডের কাজ করে। এভারেস্ট আরোহণের পর আমার জীবন আমূল বদলে গেছে। কিন্তু বাকিদের অনেকেরই জীবনধারা তেমনই আছে।

শেরপাদের জীবনযাত্রা বদলাতে শুরু করেছে। যেদিন থেকে আমরা বাসভূমি শোলো খুম্বু ছেড়ে দেশান্তরী হয়েছি তখন থেকেই গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে থাকার চেষ্টা করছি এবং বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়েও আমরা নিজেদের গোষ্ঠীকেই পছন্দ করি। দার্জিলিং এর টুংসুং এবং ভুটিয়া

এই দুই বস্তিতেই শেরপারা বেশি সংখ্যায় বাস করে, অবশ্য সেখানে তিব্বতী ও সিকিমীও আছে তবে তাঁদের সংখ্যা নগণ্য। গোটা জীবনে আমরা অনেক কিছুই যৌথভাবে ব্যবহার করি। একটা বাড়িতে লম্বা অনেকগুলো ঘর, সেখানে দুটি অথবা তিনটি সংসার। রান্নাঘর এবং স্নানের ঘর হয়ত একটাই। অতি সম্প্রতি টুংসুংএ বৈদ্যুতিক বাতি এসেছে, তবু আজও অনেকের ঘরে আলো নেই।

জাতি হিসাবে আমরা খুবই দরিদ্র তবু আমরা খুবই সরল, আমাদের চাহিদা কম, তাই জীবনে উদ্বেগ কি জিনিস তা আমরা জানি না। শোলো খুম্বুতে যখন থাকি তখন নেপালী মুদ্রা ব্যবহার করি কিন্তু দার্জিলিং-এ ভারতীয় মুদ্রার চল বেশি। কোনও অভিযান শেষে আমরা ভারতীয় টাকায় পারিশ্রমিক নিয়ে থাকি কারণ ভারতীয় মুদ্রার দাম বেশি। আমরা এই দার্জিলিং-এর শেরপারা তবু যা হোক কিছু উপার্জন করি কিন্তু যারা দেশে রয়েছে তাদের অবস্থা বড়ই করুণ। তাই যদি কখনও কয়েকটা টাকা বেশি রোজগার করতে পারি তবে যারা আজ দেশে রয়ে গেছে সেই সব আত্মীয়দের পাঠাবার চেষ্টা করি। দূর্ভাগ্যক্রমে সঞ্চয় তো দূরের কথা, বেশির ভাগ সময় নিজেরাই ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ি। তবে এখানে গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে থাকার ফলে আমাদের সুবিধা হয়েছে যে অভাবের দিনে একে অপরকে সাহায্য করি, প্রয়োজনে টাকা ধার পাই , আবার যখন কিছু উপার্জন হয় শোধ করে দিই। ১৯৫৩ সালে এভারেস্ট অভিযানের আগে আমি নিজে এই ধরনের এক বড় ঋনের জালে জড়িয়ে গিয়েছিলাম। সেদিন যদি সফল পর্বতারোহী হিসেবে আমার হাতে উপহারের কিছু টাকা পয়সা না আসত তবে হয়ত ঋণ শোধ করতে কয়েক বছর লেগে যেত।

পুরনো আচরণবিধি এবং সংস্কার এখন আর আমাদের মধ্যে প্রচলিত নেই, যেটুকু আছে তাও বদলাতে শুরু করেছে। যারা এখনও পুরনো গ্রামীণ ভাবধারা আঁকড়ে রেখেছে তাদের আমরা বিশেষ পছন্দ করি না, পরন্তু শহরের আধুনিক ভাবধারার সঙ্গে দিব্যি মানিয়ে নিচ্ছি। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আজও পুরনো রীতি মেনে চলতেই ভালবাসি। যেমন বংশের ছোট ছেলে এবং ছোট মেয়ের জন্যে টাকা পয়সার ভাগটা বেশি দেওয়া, বংশগত উপাধি ব্যবহার করা এবং জন্মের তৃতীয় দিনে সন্তানের নামকরণ করা ইত্যাদি প্রথা আজও মেনে চলা হয়। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এগুলোরও পরিবর্তন হয়।

শেরপাদের নামকরণ নিয়ে বাইরের লোকেদের মধ্যে কিছু বিভ্রান্তি আছে। তারা বলে বিভিন্ন লোকের নামের মধ্যে এত মিল যে অনেক সময় নাম শুনে বিভিন্ন মানুষকে আলাদা করা মুশকিল হয়। আমার কিন্তু এমন মনে হয় না। বরঞ্চ মনে হয় অন্য অনেক জাতির মানুষের নামের সাদৃশ্য হেতু লোক চেনা মুশকিল হয়। যেমন মনে কর ইংরেজদের স্মিথ্ কিম্বা শিখেদের সিং। যে কারণে নাম দেখে শেরপাদের সনাক্ত করতে অসুবিধা হয় তা হল পরিবারের সকলের নামের শেষ এক নয়, আলাদা আলাদা। এছাড়া নামের বানান দেখে সঠিক উচ্চারণ করতে অনেকেরই ভুল হয়—শেরপাদের নিজস্ব কোনও বর্ণমালা নেই অন্য ভাষার বর্ণমালায় নাম লিখলে উচ্চারণ ভুল হওয়ারই তো কথা। শোলো খুম্বুতে নামটা উচ্চারিত হয় বিশেষ ধরনের আওয়াজের মাধ্যমে যা সঠিকভাবে একজনের নামকেই প্রকাশ করে। আর তাই নিয়ে এখানে এত বিভ্রান্তি। কোনও সরল ব্যাপারকে অহেতুক জটিল করে

ভোলাটাই বোধহয় আধুনিক জগতের রীতি। আমার নাম নিয়েও পাশ্চাত্যের লোকেরা এক অদ্ভুত জটিলতা সৃষ্টি করেছে। তারা আমার স্ত্রীর সঠিক নাম— যে নামে তাকে সবাই এখানে চেনে অর্থাৎ আং লামু না বলে বলে মিসেস্ তেনজিং। এটা একেবারেই অবাস্তব. শেরপা সংস্কৃতিতে এমন চলে না। শেরপাদের প্রত্যেকের আলাদা নাম, এবং তার বিশেষ অর্থ আছে। শেরপানী মানেই তাকে স্বামীর নামের শেষটুকু নিতে হয় না। আধুনিক জগতের এই ইচ্ছাকৃত ভুলটা মানতে আমরা বাধ্য নই। এদিকে আমার দুই মেয়ে পেম পেম এবং নিমা দার্জিলিং-এর এক ইংরেজী স্কুলে পড়ে, ভর্তি করার সময় তাদের নাম লিখলাম পেম পেম এবং নিমা। না. এটা চলবে না. বাপের নামের শেষ অংশটুকু তাদের নামের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে। আরে! যা হবার নয় তাই করতে হবে?

কেন. তাদের বাবার নাম তো আলাদা করে দেওয়া আছে। কর্তৃপক্ষ নাছোড়. আধুনিক জগতের এটাই নাকি নিয়ম। সুতরাং একজন শেরাপার জন্যে যা অসম্ভব আধুনিক স্কুলে পড়ার জন্যে সেটাই করতে হচ্ছে। এখন আমার মেয়েদের নামের সঙ্গে আমার দ্বিতীয় নামটা, যেটা মোটেই কোনও পরিবারিক নাম নয়, বসাতে হয়। তাই হাজার দ্বিধাদ্বন্দেও আমার স্ত্রী নিজেকে আং লামু না বলে বলেন মিসেস নোরগে, কারণ তিনি যে আমারই স্ত্রী এটাই বুঝতে নাকি তোমাদের অসুবিধে হয়।

প্রত্যেক শেরপা নামের একটা বিশেষ মানে আছে। আমার ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে 'ঈশ্বরে বিশ্বাসী ভাগ্যবান এবং ঐশ্বর্যশালী'। যে কোনও ছেলে বা মেয়েকে 'আং' বলা যায়। আং মানে প্রিয় বা স্নেহধন্য। লামু মানে দেবী। 'ফু' এর আসল উচ্চারণ 'ভু' মানে পুত্র। নিমা মানে সূর্য, নরবু মানে রত্ন তেমনি নামগিয়াল হচ্ছে বিজয়ী, এছাড়া দিন এবং মাসের সঙ্গে মিলিয়েও নামকরণ হয়। দাওয়া—সোমবার. পাশাং—শুক্রবার পেম্বা—শনিবার। এরপর আসছে বংশগত পরিচয় যেমন আমাদের 'ঘাংলা'। বংশগত পরিচয়ের ব্যাপারটা আসে কোনও জায়গা থেকে তারা এসেছে বা থাকত অথবা তাদের পরম্পরা গত ইতিহাস থেকে। সেই ভাবে আসছে মুরমি, শিরে. রুকপা. মেনডাভা. থাকটুপা।

অভিযানে এসে সাহেবরা বলে আমাদের মুখের এত মিল যে নাম ধরে লোক চেনা মুশকিল। এই নিয়ে তারা মাঝে মাঝে কৌতুক করে। আমাদেরও ঐ একই সমস্যা হয় যখন একমুখ গোঁফ দাড়ি নিয়ে তারা আমাদের সামনে আসে। যদিও দাড়ি কামানো যায় তবু অভিযানে এসে সেটা রাখতেই ওরা বেশি পছন্দ করে। আমরা মোঙ্গলদের বংশজাত, আমাদের দাড়ি খুব পাতলা. গোঁফের বাহার তৈরি করতে হলে কয়েকমাস লেগে যায়। শোলো খুম্বুতে নারী পুরুষ সকলের বিনুনী করা চুল, কানের লতিতে ফুটো. তাতে গোলাকার দুল ঝোলে. কিন্তু দার্জিলিং-এ এসে এসবই চুকিয়ে ফেলে প্রায় সকলেই। আমি আজকাল বড় চুল রাখি না. আগে রাখতাম। কানের ফুটো রেখে গেছে দুল পরি না। শেরপাদের চুল কালো. চোখের তারা কালো. গায়ের রং তামাটে এবং অনেকটা মোঙ্গলদের মত মুখের চেহারা। তবে চীনা এবং তিব্বতীদের মোঙ্গলয়েড চেহারার সঙ্গে আমাদের হুবহু মিল নেই। পাহাড়ের উঁচু গ্রামে আমাদের জাতির লোকেদের বেঁটে চেহারা, শক্তপোক্ত এবং বলিষ্ঠ। পাহাড়ে আমরা যে অমানুষিক পরিশ্রম করি এবং বোঝা বয়ে নিয়ে যাই সে তুলনায় আমাদের চেহারা দেখতে

ক্ষীণ লাগে। আমার উচ্চতা পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি ওজন একশো ষোল পাউণ্ড, রোগা বলা চলে। দার্জিলিং এর শেরপা মেয়েরা এখনও সেই পুরনো ধরনের পোষাক পরে। তবে ছেলেদের পোশাক পরিচ্ছদের পরিবর্তন হয়েছে। পাশ্চাত্য ধারার পোশাকে তারা নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে।

শেরপারা পাহাড়ে চড়ায় যে দক্ষতা অর্জন করেছে তার জন্যে পাহাড়ের প্রতি ভালবাসা এবং শক্তপোক্ত চেহারাটাই সব নয়. খাদ্যাভাসও এর জন্যে অনেকটা দায়ী। হিন্দু, মুসলিম কিম্বা সংস্কারাচ্ছন্ন বৌদ্ধ প্রত্যেকের ধর্মই তার খাদ্যাভ্যাসে বাধা নিষেধ আরোপ করেছে। তাই সব কিছু খাবার অভ্যাস তাদের নেই। অথচ পাহাড়ের অন্দরে সব রকম খাবার পাওয়া সম্ভব নয়। একজন শেরপা সবরকম খাবারে অভ্যস্ত। টাটকা, টিনজাত, শুকনো। যে কোনও খাবার সে তৃপ্তি করে খায়। অবশ্য আমাদেরও পছন্দের খাদ্যাভাস আছে। দেশে থাকতে আমরা বেশি করে জল দিয়ে আলু এবং পরিমাণ মত সব্জিকে ফুটিয়ে তার সঙ্গে মাংস মিশিয়ে খেতে ভালবাসি। দার্জিলিং এসে ভাত খাওয়া বাড়িয়েছি, মশলা দেওয়া খাবারও খাই। মো-মো আমাদের প্রিয় খাদ্য। ময়দার মধ্যে মাংসর পুর দিয়ে সেদ্ধ করে মো-মো হয়। প্রফেসর তুচ্চি বলেছিলেন ইতালীয় রাভিয়লির সঙ্গে এর মিল আছে।

আমাদের প্রিয় পানীয় চা, সারাদিনে কতবার চা পান করি তার হিসেব নেই। চায়ে ইয়াকের দুধ থেকে তৈরি মাখন মিশেয়ে পান করতে খুব ভাল লাগে। দার্জিলিং-এ সাহেবী কায়দায় চায়ে দুধ চিনি মিশিয়েই পান করি। ঝাঁঝালো এবং কড়া ধাঁচের পানীয় হল ছাং, বাড়িতেই তৈরি হয়। এটা ভাত বা বার্লি থেকে তৈরি একধরনের মদ। সব সময়েই এটা পান করিনা, কিম্বা একা একাও পান করি না। বাঁশের তৈরি চোঙ্গায় ঘন ছাং রেখে তাতে একটু একটু করে গরম জল মেশাই তারপর কয়েকজন মিলে ঐ পাত্র থেকে স্ট্র এর সাহায্যে টান মারি। জল কমে গেলে আবার ঢালি এই ভাবে বহুক্ষণ চলে, সঙ্গে প্রচুর গল্প, হাসি, গান সবাই মেতে থাকি। সবাই মিলে গল্প করতে বসলে চা অথবা ছাং পানীয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যে সব অতিথি চা অথবা ছাং পান করতে চায় না আমরা মনে করি তারা যথেষ্ট নম্র নয়। হিন্দু অথবা মুসলিম, যারা পান একেবারেই করে না, তারা আমাদের এই খোলামেলা পান করার ব্যপারটা অপছন্দ করতে পারে। যারা পান করে তাঁদের চেয়ে আমরা যে খুব বেশি পান করি তা নয়, হয়ত কমও নয়। আমি ছাং খুবই পছন্দ করি তবে বিদেশী মদও ভাল লাগে। সিগারেটে আসক্তি আছে আর সব চেয়ে বড় নেশা অভিযানে যাওয়া।

অভিযানকালে আমি ধূমপান করিনা এবং মদ ছুঁই না। ধর্মীয় কারণে যারা মদ্য পান এবং ধূমপান করেনা তাদের সঙ্গে থাকলে আমি এগুলি বর্জন করি। শেরপাদের ভ্রমণে একটা সহজাত প্রবৃত্তি আছে। তারা বন্ধু বৎসল। প্রথম দেখলে মনে হয় তারা বোধহয় খুবই লাজুক কিন্তু নতুন নতুন মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করতে আমাদের ভাল লাগে। তাস অথবা চাকতি দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষার খেলা আমাদের প্রিয়। আমার স্বজাতীয়দের মজা করার যে প্রবণতা তা আমার কাছেও যথেষ্ট ভীতিপ্রদ, যেমন কারোর অজান্তে তার বোঝাটা ভারি করার জন্যে পাথর ভরে দেওয়া। আমি কিছুতেই বুঝতে পারিনা একজনকে এমন অহেতুক কষ্ট দেবার মধ্যে মজাটা কোথায়? দৌড় ঝাঁপের খেলা সব জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে কিন্তু

আমরা এটা শিখে উঠতে পারিনি। তার কারণ বোধ হয় পাহাড়ি পথে সারা দিন হাড় ভাঙা খাটুনির পরে পরিশ্রমের খেলা খেলতে আমাদের ভাল লাগে না। তবে ঘোড়ায় চড়তে আমাদের মজা লাগে। কদিন হল আমি একটা ঘোড়া কিনে দার্জিলিং-এর রেসকোর্সে সেটাতে চেপে দৌড় করছি । বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলে খুব শিগ্গি আমি শেরপা আগা খাঁ হয়ে যাব। গার্হস্থ্য জীবনের বহু দায়দায়িত্ব আমরা মেয়েদের সাথে সমান ভাবে ভাগ করে নেই । স্ত্রী স্বাধীনতার ব্যাপারে এশিয়ার বহু জাতি অপেক্ষা আমরা অনেক এগিয়ে আছি। বাড়িতে গৃহকর্ত্রীর কথা সবাইকে মানতে হবে। কিন্তু তাই বলে তারা শুধু সংসারেই বন্দী থাকে না। তারা জীবনের অন্য ক্ষেত্রেও পুরুষদের সঙ্গে দায়দায়িত্ব ভাগ করে নেয়। অনেক পর্বত অভিযানে মেয়েরাও ছেলেদের মত মালবাহকের কাজ করে। একজন শেরপানী কে দেখতে ছোট্ট খাট্ট রোগাটে, কিন্তু সে প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী। তারা নিজ ওজনের দুই তৃতীয়াংশ ভারী মাল বহন করতে পারে। আমাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা প্রচলিত আছে । কোনও স্ত্রী বা স্বামী যদি বিবাহ বিচ্ছেদ চায় তবে নির্ধারিত কিছু অর্থের বিনিময়ে সে তা করতে পারে। আদিতে আমরা তিব্বতের অধিবাসী ছিলাম, সেখানে অনেক ভাইয়ের একটাই স্ত্রী প্রথা প্রচলিত ছিল। জমির মালিকানা অনেক ভাগে ভাগ হওয়া থেকে বাঁচবার জন্যেই এই প্রথা । কিন্তু শোলো খুম্বুতে এই প্রথা প্রায় অচল আর দার্জিলিং-এ এই প্রথা অবলুপ্ত। যৌন ব্যাপারে শেরপারা স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়। আমরা মনে করি এটা ব্যাক্তির নিজস্ব ব্যাপার। শেরপা জীবনে বর্তমানে লক্ষনীয় বিষয় হল তারা শিশুদের শিক্ষার বিষয়ে মনোযোগী হয়েছে, কয়েক বছর আগে যা কল্পনাও করা যেত না। শিক্ষার ব্যাপারটা এখনও বৌদ্ধ মঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, অল্প যা কিছু জ্ঞান তা লাভ করার জন্যে শিশুদের মঠে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সিকিম এবং তিব্বতিদের জন্যে দার্জিলিং-এও মঠ রয়েছে কিন্তু শেরপাদের কোনও মঠ নেই । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পরে অনেক শেরপা শিশুকে নেপালীদের স্কুলে পাঠানো হচ্ছে। ১৯৫১ সালে দার্জিলিং-এ শেরপা শিশুদের জন্যে একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়েছে। আমার জীবনে সবচেয়ে দুঃখের ব্যপার হল শৈশবে আমি কোনও স্কুলে যাবার সুযোগ পাইনি। আমি একজন অশিক্ষিত মানুষ তাই আমি চাই না আমার সন্তানদের জীবনে এমন কোনও দুঃখজনক ঘটনা ঘটুক । আমার দু কন্যা পেম পেম এবং নিমাকে বাল্যকালে নেপালী স্কুলে পড়িয়েছি, এখন তাদের ক্যাথলিক লরেটো স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি। এটা আইরিশ সন্ন্যাসিনীদের দ্বারা পরিচালিত স্কুল। ঐ স্কুলে তাদের পড়তে পাঠিয়েছি মানে এই নয় যে ওরা ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত হবে। ওখানে পড়লে ওরা সুন্দর ইংরেজী বলতে এবং লিখতে পারবে, বহু মানুষের সঙ্গে মিশবে এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবে। আধুনিক শিক্ষায় সবাই যে ভাল হচ্ছে তা নয়, অনেক কিছুই ঘটছে যা হওয়া উচিত নয়। আমি লক্ষ্য করছি বহু তরুণ শেরপা আমাদের জীবনের প্রথা এবং রিদভিদ ভুলে যাচ্ছে। খুব কম সময়েই তারা নিজেদের মাতৃভাষায় কথা বলে। এমন অনেক ধ্যাণধারণা তাদের গড়ে উঠেছে যে, আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি এসব তারা স্কুল থেকে শেখেনি। সিনেমা দেখার যে ব্যাপক চলন শুরু হয়েছে এ হচ্ছে তারই কুফল। একটা আদিম পুরনো জীবন থেকে, ভাবনা চিন্তার জগৎ থেকে একটা জাতি যখন পরিবর্তনের জগতে প্রবেশ করে তখন এমন অনেক

মূল্য দিতে হয়। যতই কষ্টই হোক তবু আমার বিচারে এই ধরনের পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে। পুরনো আদিম ভাবনা চিন্তার জগৎ অপেক্ষা আধুনিকতার স্বাদ অনেক মূল্যবান। বৌদ্ধধর্মের প্রতি আমার বিশ্বাসের কথা আমি আগেই বলেছি। শেরপা জাতি ধর্মপ্রাণ তবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন নয়, ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা তাদের আছে। কিন্তু তারা আচার সর্বস্ব নয়। যেহেতু দার্জিলিং-এ শেরপাদের নিজস্ব কোনও মঠ নেই তাই প্রত্যেকেই আমরা আমাদের বাড়িতে ঘরের কোণে একটা প্রার্থনা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করে রাখি। এই ছোট্ট জায়গাটিতে বুদ্ধের মূর্তি, প্রার্থনা চক্র এবং এ ছাড়া আরও টুকিটাকি জিনিস, যা আমাদের ধর্মাচরণের জন্যে প্রয়োজন, সেগুলি সাজিয়ে রাখি। আমি নিজেকে যথেষ্ট ভাগ্যবান মনে করি কারণ আমার বাড়িতে একটা পুরো ঘরকে আমি প্রার্থনা গৃহ হিসাবে ব্যবহার করতে পারি। সেই ঘরে তিব্বত থেকে নিয়ে আসা সমস্ত পবিত্র স্মারকগুলি সাজিয়ে রেখেছি। আমার শ্যালক লামা ওয়াংলা দিনের বেশ কিছুটা সময় সেই ঘরে প্রার্থনায় রত থাকে। আমার বাড়ির উঠোনে অনেকগুলি বাঁশ পুঁতে তার থেকে কাঞ্চনজঙঘার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা পতাকা উড়িয়ে দিয়েছি। বেশির ভাগ মানুষের মতই আমাদের জীবন জন্ম মৃত্যু বিবাহকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। মৃতদেহ জ্বালিয়ে দেওয়াই আমাদের রীতি তবে শিশুর মৃত্যু হলে তাকে সমাধি দেওয়া হয়। এ ছাড়া ব্যতিক্রম তো আছেই । যদি আমাদের মধ্যে কেউ পর্বত অভিযানে গিয়ে বরফের রাজত্বে প্রাণ হারায় তবে তাকে সমাহিত করা হয়। আর যদি তা করার সুযোগ না পাওয়া যায় তবে প্রকৃতি তার ব্যবস্থা করে।

জরুরী প্রয়োজনে কাজে লাগাবার জন্যে টুংসুং বস্তিতে আমাদের একটা ছোট প্রার্থনাগৃহ আছে। যে কেউ সেটা ব্যবহার করতে পাবে। সে গৃহে কেবলমাত্র একটাই বড় মাপের প্রার্থনা চক্র আছে, উচ্চতায় সেটা একজন মানুষের দ্বিগুণ। সেই চক্রের সঙ্গে একটা দড়ি এমনভাবে বাঁধা আছে যে দড়ি ধরে টান দিলে তার থেকে একটা গম্ভীর ধাতব শব্দ পাওয়া যায়। সে শব্দ শুনে মনে হয় যেন আওয়াজ উঠছে... ওম মণি পদ্মে হুম.... ওম মণি পদ্মে হুম....। এই শব্দ, এই ঘূর্ণন শুধুমাত্র মৃত আত্মা অথবা সদ্যজাত মানবশিশুর শান্তির জন্যেই নয়, পরন্তু সকল জীবিত প্রাণীর জন্যেই—আর আমাদের জন্যে, যারা ধীরে ধীরে এই জীবন চক্রকে অতিক্রম করছি।

শেরপাদের জীবন তিনটে ভাগে বিভক্ত। প্রথমে তার ধর্মবিশ্বাসের দিক, তারপর সাংসারিক মানুষ হিসেবে তার কর্তব্য এবং পরিশেষে কর্ম জীবন। অতীতে কৃষিকাজ এবং পশুপালন ছিল আমাদের প্রধান জীবিকা। শোলো খুম্বুতে আজ সেই অবস্থাই আছে। দার্জিলিং-এ অবস্থা পাল্টেছে, এখন এখানে আমদের মধ্যে বেশ কিছু ধনী লোক দেখতে পাওয়া যায়, অনেকে ব্যবসায় যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছে। আমাদের জীবনধারা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি নিকট ভবিষ্যতে আমাদের মধ্যে অনেকেই ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হবে। লেখাপড়া জানা পণ্ডিত লোকও বিস্তর পাওয়া যাবে। কিন্তু সমগ্র বিশ্বে আজ শেরপারা যে কারণে খ্যাতি অর্জন করেছে তা তাদের পর্বতারোহণে সহজাত দক্ষতার জন্যেই। আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে বহু দিন এই পরিচয়টাই শেরপাদেব সত্যকাব পরিচয় হয়ে থাকবে। আমার প্রার্থনা শেরপারা পবর্তপ্রাণ জাতি হিসেবেই বেঁচে থাকুক। এই হিমালয় আমাদের যা দিয়েছে আর আমরা

হিমালয়কে যা ফিরিয়ে দিয়েছি তা মহামূল্যবান, কখনওই হারিয়ে যাবার নয়।

একজন শেরপা বালক যখন চোখ তুলে উঁচুতে তাকায় তখন তার সামনে দিগন্ত বিস্তৃত তুষার শুভ্র পাহাড়ের চূড়া, মাথা নামিয়ে দেখে পায়ের কাছে নামানো রয়েছে একটি ভারি বোঝা। ক্ষণিকের জন্যে সে বিশ্রাম নেয়, তারপর সেই ভারি বোঝাটা পিঠে তুলে নিয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করে। এই জীবনে সে কি বিরক্ত? বোঝা কি তাকে ব্যতিব্যস্ত করে? সে কি পিঠ থেকে বোঝাটা ঝেড়ে ফেলে দিতে চায়? কিম্বা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্বস্তি পেতে চায়? না, এর কোনওটাই নয়। বোঝা নিয়ে হাঁটায় সে একটা ছন্দ খুঁজে পায়, চড়াই পথে উঠতে ঘামে ভেজা শরীরে পিঠের বোঝাটা কখন জানি তার জীবনের অঙ্গ হয়ে গেছে। আমার জীবনটাও এর বাইরে নয়। জীবনের অনেকগুলো বছর হিমালয়ের পথে, কখনও ঘরের কাজে, কখনও পর্বত অভিযানে, আমিও এইভাবে মাল বয়েছি। এমনই চলেছে যতদিন পর্যন্ত না সর্দার হতে পেরেছি।

বহু মানুষ বুঝতে পারে না একটা পর্বত অভিযানে শেরপার কি ভূমিকা। আল্পসে একজন গাইড হল অভিজ্ঞ পর্বতারোহী। যেখানে অভিযান হবে সে এলাকাটা তার পরিচিত, কাজেই গাইড অন্যদের আরোহণে সাহায্য করে। কিন্তু হিমালয়ের বেশিটাই অজানা এবং দুর্গম। এছাড়া হিমালয়ের আবহাওয়ার গতি প্রকৃতি দ্রুত পরিবর্তনশীল। শেরপারা কিন্তু অভিজ্ঞ পর্বতারোহী নয় আর পর্বতারোহণের অল্পস্বল্প কলাকৌশল জানা থাকলেও সেটা খুব একটা প্রয়োজনীয় বিষয় নয় কারণ যাঁরা তাদের সঙ্গে নিয়ে যায় তাঁরা অত্যন্ত দক্ষ পর্বতারোহী। হিমালয় অভিযানের একেবারে প্রথম দিকে শেরপাদের নেওয়া হত মালবাহক হিসেবে — আমাদের দেশের ভাষায় কুলির কাজ। কুলি নামটা এশিয়বাসীরা পছন্দ করে না। কুলি এবং ক্রীতদাস এ দুটোই তাদের কাছে সমর্থক। কিন্তু পর্বতারোহণে শেরপাদের কুলি বলা হয় না। সে সব ক্ষেত্রে শেরপা এই নামটাই মালবহনের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ অর্থ বহন করে। অর্থাৎ উচ্চ হিমালয়ে ভারি মাল নিয়ে যাবার ক্ষমতা একমাত্র শেরপাদেরই আছে, অন্য কারও পক্ষে এটা সম্ভব নয়। তাই স্থানীয় কুলিরা মূল শিবির পর্যন্ত মাল এনে ফিরে যায়, কিন্তু অভিযানের শেষ পর্যন্ত শেরপাদের থাকতে হয়।

তুষার ঝড়, বরফের কঠিন শীতল স্পর্শ, দারুণ ঠান্ডা, শ্বাস কষ্ট, কঠিন খাড়া দেওয়াল এসব আমাদের কাছে তুচ্ছ। ক্ষুধার্ত তুষার ফাটলকে আমরা ভয় পাইনা। অনেক উঁচুতে যেখানে যে কোনও সাধারণ মানুষের পক্ষে শ্বাস নেওয়াটাই দুর্বিসহ ব্যাপার সেখানেও আমরা মাল পৌঁছে দিই। এই শতকে হিমালয়ে যতগুলো বড়মাপের অভিযান হয়েছে তার প্রত্যেকটাতেই পাকিস্তানের কয়েকটি অভিযান বাদ দিলে, শেরপারা সবচেয়ে উঁচু শিবির পর্যন্ত মাল পৌঁছে দিয়েছে, এমনকি বহুক্ষেত্রে সাহেবদের সঙ্গে শীর্ষ পর্যন্ত চলে গেছে।

বহু বছর ধরে পর্বত অভিযানে অংশ গ্রহণ করার ফলে শেরপারা এখন পাহাড়ে চড়ার অনেক কলাকৌশল আয়ত্ত করেছে। বরফের মধ্যে রাস্তা খোঁজা, বরফের দেওয়ালে ধাপ কাটা, দড়ির ব্যবহার, তাঁবু লাগাবার জায়গা ঠিক করা, এমন বহু বিষয়ে আজ তারা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। শুধু তাই নয় অভিযাত্রী সদস্যদের ভালমন্দ দেখাশুনা করাটা আমরা আমাদের কর্তব্য মনে করি। ঠান্ডায় বরফের রাজত্বে তাদের জন্যে খাবার বানাই, চা তৈরি করি,

আরোহণের সরঞ্জামের তত্ত্বাবধান করি। এই কাজ করতে আমরা বাধ্য নই, কিন্তু এগুলো করতে ভাল লাগে, এখানে সম্পর্কটা প্রভুভৃত্যের নয় বরঞ্চ সহযাত্রীর। এইসব গুণের জন্যেই ধীরে ধীরে আমাদের সম্মান বৃদ্ধি হয়েছে। সাহেবরা নিদারুণ ঠাণ্ডা আর কষ্টের মাধ্যেও আমাদের এইভাবে পরিশ্রম করতে দেখে আমাদের শ্রদ্ধা করতে শিখেছে, পুরস্কার হিসেবে আমাদের পারিশ্রমিক বাড়িয়ে দিয়েছে। বরফের রাজত্বে বীরের মত লড়াই করতে দেখে 'টাইগার' সম্মানে ভূষিত করেছে। স্বীকৃতি কে না চায়? উপযুক্ত কাজের জন্যে যোগ্য সম্মান সবাই আশা করে। কিন্তু এই মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে আমাদের যে খুব একটা কষ্ট করতে হয়েছে তা নয়, সহজাত গুণ থেকেই আমাদের এই শক্তি এসেছে। পরিশ্রম করলে কষ্ট করতে পারলে আমাদের ভাল লাগে, না হলে কেমন একঘেয়ে মনে হয়।

শেরপা জীবনের প্রতি হিমালয়ান ক্লাবের একটা বিশেষ অবদান আছে। হিমালয়ান ক্লাবের সদস্যরা বেশিরভাগই ইংরেজ, কয়েকজন দেশীয় এবং অন্যদেশের লোকও আছে। এই ক্লাব নিজে কোনও অভিযান সংগঠিত করে না, কিন্তু যারা করতে চায় তাদের নানাবিধ সাহায্য করে। হিমালয়ান ক্লাবের একজন স্থানীয় সেক্রেটারী দার্জিলিং-এ রয়েছেন। যখন কোনও অভিযাত্রীদল শেরপাদের সম্বন্ধে খোঁজখবর নেয়, তখন তিনি আমাদের ডেকে পাঠিয়ে বিভিন্ন দলের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন। অবশ্য অনেক সময় কোনও কোনও দল তাদের পরিচিত শেরপাকে সরাসরি চিঠি দেয় এবং তার মাধ্যমে শেরপা সংগ্রহ করে। কার্মা পাল এর মত বেসরকারি সংস্থাও আছে যারা বিদেশী দলগুলিকে শেরপার ব্যবস্থা করে দেয়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যোগাযোগটা হয় হিমালয়ান ক্লাবের মাধ্যমে। শোলো খুম্বু থেকে দার্জিলিং আসার পর আমি যখন প্রথম এভারেস্ট অভিযানে সুযোগ পাবার চেষ্টা করছি তখন হিমালয়ান ক্লাবের সেক্রেটারী ছিলেন মিঃ কিড্। পরে সেক্রেটারী হন মিঃ লুডউইগ ক্রেনেক, তিনিই প্রথম শেরপাদের নামের তালিকা সম্বলিত এক রেকর্ড তৈরি করলেন। ইদানিং সেক্রেটারী হয়েছেন মিসেস জিল হেন্ডারসন, চা বাগানের একজন ব্রিটিশ মালিকের স্ত্রী। বিশ্বযুদ্ধের পরে যে সমস্ত অভিযান হয়েছে তার অনেকগুলিতে তিনি প্রচুর সাহায্য করেছেন। যদিও হিমালয়ান ক্লাব অতীতে শেরপাদের প্রচুর সাহায্য করছে তবু পাশাপাশি অর্থকরী বিষয়ে অনেক অসন্তোষও জমা হয়েছে। তাই আমরা নিজেরাই একটা সংগঠন তৈরি করতে সক্রিয় হয়ে উঠেছি। বিশের দশকে শেরপা বুদ্ধিস্ট এ্যাসোসিয়েশন নামে এই ধরনের একটা সংস্থা গড়ে ওঠে, যেটা মূলত ধর্মীয় বিষয়ে আবদ্ধ ছিল। ত্রিশের দশকে এবং বিশ্বযুদ্ধের সময় এই সংস্থা বিশেষ কিছু করতে পারেনি। পরে সংস্থা থেকে বুদ্ধিস্ট কথাটা ছেঁটে দিয়েছি এবং ইদানিং কিছু কিছু কাজ কর্ম হচ্ছে। পাহাড়ে যাবার বিষয় ছাড়াও সংস্থাটি আমাদের গোষ্ঠীর সামাজিক, আর্থিক এবং আরও নানা বিষয়ে সহযোগিতা করে। ইদানিং সমিতির কাজের পরিধি অনেক বেড়েছে—কোনও সংসারের উপার্জনশীল ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়লে, যতদিন পর্যন্ত না সেই ব্যক্তি সুস্থ হয়ে কাজে যোগ দিচ্ছে ততদিন তার সংসারকে সমিতির তরফ থেকে কিছু অর্থ-সাহায্য দেওয়া হয়। এছাড়া কেউ মারা গেলে তার সৎকারের জন্যে কুড়ি টাকা দেওয়া হয়। সংস্থাটি এখন অভিযানে শেরপা জোগান দেবার কাজও করছে। হিমালায়ন ক্লাব থেকে যে মজুরী ধার্য করা হয় আমাদের মনে হয়েছে সেটা যথেষ্ট কম তাই আমরা চাইছি আর একটু বেশি মজুরীর

ব্যবস্থা হোক। এছাড়া অভিযানে দুর্ঘটনা থেকে কেউ পঙ্গু হয়ে গেলে কিম্বা মারা গেলে তার সংসারের জন্যে ভাল অঙ্কের ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা চালু করেছি। এখন সমিতির মোট বিরাশি জন সদস্য এবং আমি সভাপতি। আমার মনে হয় ভবিষ্যতে এই শেরপা এ্যাসোসিয়েশন আমাদের গোষ্ঠীর জন্যে আরও অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারবে।

অন্য যে কোনও সাধারণ মানুষের মত আমাদেরও কিছু কিছু বাস্তব সমস্যা আছে। সংসার প্রতিপালন, সন্তান সন্ততির ভবিষ্যৎ চিন্তা, ঋণগ্রস্থ হলে তার থেকে মুক্তির ভাবনা এবং সর্বোপরি বৃদ্ধ বয়সে নির্ভরতার ভাবনা আমাদেরও ভাবতে হয়। তবু আমরা যে ধরনের কাজ করি তা শুধুই অন্ন চিন্তা থেকে আসেনি এটা এসেছে আমাদের হৃদয়ের তাগিদে। এটা নিশ্চয় বলার অপেক্ষা রাখেনা যে পর্বতারাহণের স্বার্থে শেরপারা কি করেছে? কিন্তু এটা তো স্বীকৃত হওয়া উচিত যে পর্বতারোহণ করতে গিয়ে শেরপারা যে স্বার্থত্যাগ করেছে তা কোনও সাধারণ মানুষের পেটের তাগিদ থেকে আসে না। সেইসব মহান অভিযানগুলির কথা একবার স্মরণ কর যা আজও শেরপাদের আত্মত্যাগের গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে আছে। উনিশ শতকের গোড়া থেকেই শেরপারা প্রথম পর্বত অভিযানে যায়। ১৯২০ সালে এভারেস্ট অভিযান। প্রথম এভারেস্ট অভিযানেই তারা ছাবিবশ হাজার ফুট উচ্চতায় মাল পৌঁছে দেয়, এর আগে মানুষ কোনও মতে চবিবশ হাজার ফুট পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিল। পর্বতারোহণের সময় সাহেবরা শেরপাদের সঙ্গে নিত মাল বইবার জন্য। অন্য কোনও কাজের জন্যে তারা মজুরী দেয় না। কিন্তু ত্রিশের দশকে সাহেবরা দু'দুবার বাধ্য হয়েছে শীর্ষারোহণের জন্যে শেরপাদের সঙ্গে নিতে। আর সে দুটো পর্বত তখনকার দিনে সর্বোচ্চ যা প্রথম আরোহণ করা হল। এর প্রথমটা হল জনসং যেখানে টাইগার লিওয়া এবং সিনাবো আরোহণ করে। দ্বিতীয় কামেট, এতেও টাইগার লিওয়া আরোহণ করে। এবারের আরোহণে লিওয়াকে চরম মূল্য দিতে হয় যখন সে ঠান্ডায় জমে যাওয়া পা দুটো নিয়ে শীর্ষের দিকে এগিয়ে যায়, ফিরে এসে তার পায়ের সব কটি আঙ্গুল তুষারক্ষতের জন্যে বাদ দিতে হয়। সেই শুরু, তারপর থেকে শেরপারা সাহেবদের সঙ্গে বড় মাপের অভিযানে গিয়ে সমান তালে পর্বতারোহণ করেছে। কে-২, কাঞ্চনজঙ্ঘা, নাঙ্গা পর্বত, নন্দা দেবী, অন্নপূর্ণা, এ ছাড়া আরও কত নাম করব। এর প্রত্যেকটার বহু উঁচুতে শিবির স্থাপন করতে শেরপাদের সাহায্য অপরিহার্য হয়েছে। ১৯৩৯ সালে পাশাং দাওয়া লামা আমেরিকান ফ্রিটস্ ওয়েসনারের সঙ্গে পৃথিবীর দ্বিতীয় পর্বতশীর্ষের মাত্র সাতশো পঞ্চাশ ফুট নিচে পর্যন্ত পৌঁছে গেল। এর ঠিক পনের বছর পর ১৯৫৪ সালে এক অস্ট্রিয়ান দলের সঙ্গে সপ্তম বাছাই পর্বত চো ওয়ু শীর্ষে আরোহণ করে। ১৯৫৩ সালের এভারেস্ট অভিযানে সতের জন শেরপা সাউথ কল পর্যন্ত মাল পৌঁছে দেয়। এবং আমি ছাড়া আরও একজন ঐ অভিযানে ছাবিবশ হাজার ফুটের বেশি উঠেছিল।

সেই সব শেরপাদের কথা আজ বড় বেশি করে মনে পড়ে অভিযানে গিয়ে যারা আর কোনও দিন ফিরে আসে নি। আমাদের গোষ্ঠীর কত মানুষ যে এমনি করে চলে গিয়েছে তার সঠিক হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়, শুধু এইটুকু বলা যায় পৃথিবীর সমস্ত মানবগোষ্ঠীর যত মানুষ পাহাড়ে শহীদ হয়েছে শুধু শেরপা বীরদের সংখ্যা তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি। ১৯২২-এর এভারেস্ট অভিযানে সাতজন মারা গেল। ১৯৩৪ এবং ১৯৩৭ এই দুবারের নাঙ্গা পর্বত

অভিযানে পনেরটি শেরপা জীবন আহুতি দিতে হয়েছে, এছাড়া কত অভিযানে তুষারঝড়, হিমানী সম্প্রপাত আর কঠিন ঠাণ্ডার কামড় কতজন শেরপাকে কেড়ে নিয়েছে কে জানে? যে মৃত্যু ঘটেছে তার অনেকগুলোই দুর্ঘটনার জন্যে; কিন্তু এমন অনেকগুলো ঘটনাও আছে যা বীরত্ব এবং আত্মত্যাগের উদাহরণ হয়ে থাকবে। শেরপারা তাদের বীর সাথী গেলেকে কোনওদিন ভুলতে পারবে না। উইলি মার্কের সঙ্গে গেলে নাঙ্গা পর্বতে হারিয়ে গেছে, তেমনি কে-২তে হারিয়ে যাওয়া পাশাং কিকুলিকে ভোলা যাবে না। তিরিশের দশকে কিকুলি আমাদের মধ্যে একজন প্রখ্যাত পর্বতারোহী ছিলেন। ১৯৩৯ সালে আমেরিকান কে-২ অভিযানে কিকুলি শেরপা সর্দার ছিলেন। ঐ অভিযানে পাশাং দাওয়া লামা এবং ওয়েসনার সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিলেন, কিন্তু আসল বিপদ দেখা দিল ফেরার পথে। ডুডলে উলফ্ বলে একজন অভিযাত্রী বরফের রাজত্বে ওপরের শিবিরে অসুস্থ হয়ে পড়ল। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত সকলেই প্রায় মূল শিবিরে নেমে এসেছে। বাধ্য হয়ে তাকে ওপরের শিবিরে রেখে আসা হয়েছে, এমনকি সাহেবদেরও তাকে নামিয়ে আনার ক্ষমতা ছিল না। আবহাওয়া ক্রমশ খারাপ হচ্ছে কিন্তু কিকুলি সিদ্ধান্ত নিল যে ভাবেই হোক ডুডলেকে নামিয়ে আনবে। শেরিংকে সঙ্গে নিয়ে ঐ খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে একদিনে সাত হাজার ফুট ফুটে উঠে গেল, ছ'নম্বর শিবিরে। পরের দিন আরও দুজন শেরপা যারা ছ'নম্বর শিবিরে অপেক্ষা করছিল তাদের নিয়ে সাত নম্বর শিবির যেখানে অসুস্থ ডুডলে রয়েছে সেখানে পৌঁছে গেল। তারা দেখল ডুডলে তখনও বেঁচে আছে কিন্তু নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। রাত হয়ে আসছে , সাত নম্বর শিবিরে আলাদা কোনও তাঁবু নেই, বাধ্য হয়ে তারা সে রাতের মত ছ'নম্বরে নেমে এল। পরের দিন আবহাওয়া আরও খারাপ কিন্তু কিকুলি প্রতিজ্ঞা করেছে যে ভাবেই হোক ডুডলেকে নামিয়ে আনবে। সঙ্গে আরও দুজন শেরপাকে নিয়ে সে সাতনম্বর শিবিরের উদ্দেশ্যে রওনা হল। কিকুলি আর তার দুই সঙ্গী যে পথ দিয়ে উঠে গেল আর কোনও দিন সে পথে তাদের ফিরতে দেখা যায়নি। চতুর্থজন ছ'নম্বরে শিবিরে অপেক্ষা করে অবশেষে সেই প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে ফিরে এল মূল শিবিরে। একা, একদম একা, ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, অবসন্ন, পরাজিত।

মনে পড়ে যায়—আমার বারে বারে মনে পড়ে যায় এইসব বীরত্বগাথা। সেই সব আত্মত্যাগের, বীরত্বের কাহিনী শুনে তুমি এখনও কি বলবে শেরপারা শুধুমাত্র অর্থের জন্য এই কাজ বেছে নিয়েছে? না, কখনওই নয়—এ তাদের প্রাণের তাগিদ, হৃদয়ের আহ্বান, হিমালয়কে তারা ভালবেসেছে। স্মরণ করি সেই সব বীর শেরপাদের যাদের মধ্যে জন্মে আমি ধন্য—শেরপা হয়ে জন্মে আমার জন্ম সার্থক হয়ে গেছে।

পরিক্রমা

যদিও আমি লেখাপড়া জানিনা তবু বছরের পর বছর আমার নামে যত চিঠি এসেছে এবং আমি নিজে যত চিঠি লিখেছি তার কোনও হিসেব নেই। ইউরোপ থেকে চিঠি আসে, চিঠি লেখে ভারতের লোক। কেউ জানতে চায় আমি তাদের সঙ্গে অভিযানে যেতে পারব কিনা, কেউ কোনও অভিযান থেকে ফিরে তার ভবিষ্যতের অভিযান পরিকল্পনার কথা জানিয়ে চিঠি দেয়, আবার কেউবা শুধুই বন্ধুত্বের খাতিরে চিঠি লেখে। এই সব চিঠি কাকেও দিয়ে পড়িয়ে নিতে হয়, তারপর উত্তর লেখানোর পালা। সম্ভব হলে সেই ভাষাতেই উত্তরটা লিখিয়ে নিই নয়ত ইংরেজীতে লিখিয়ে পাঠাই, অনুবাদের দায়িত্ব পাঠকের। কালি কলমের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই অথচ এরই মাধ্যমে আমার জীবনে অনেক বড় বড় অভিযানের সূচনা হয়েছে। ১৯৪৮ সালের শীতকালে আমার পুরনো বন্ধু বন্দর পুচ্ছ (Monkey Tail) খ্যাত ডুন স্কুলের মিঃ গিবসন আমার নাম সুপারিশ করলেন ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর 'অপারেশন রিসার্চ' বিভাগের কাছে যাতে তাদের কাজের সুবিধের জন্যে তারা আমাকে নিয়োগ করে। একথা তিনি আমাকেও জানিয়ে দিলেন। ফলে সৈন্যবাহিনীর বিশেষ প্রশিক্ষক হিসেবে আমি সেই বছর উত্তর-পশ্চিম হিমালয়ে সৈন্যদের পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণের কাজে ব্যস্ত থাকলাম। পরের বছরেও ঐ একই কাজের জন্যে আমাকে আবার হিমালয়ে যেতে হল। পর্বতারোহণ, রান্না করা, পর্বতারোহণের সরঞ্জামের যত্ন নেওয়া, তাঁবু লাগানো, এ ছাড়া শারীরিক সহনশীলতা আয়ত্ত করার কৌশল শিক্ষা এই সবই ছিল শিক্ষাদানের বিষয়। কাজটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছিল। প্রথম বছর কুলু এবং দ্বিতীয় বছর কাশ্মীরে এটা করা হয়েছিল। এই সময়েই আমি প্রচুর স্কী করার সুযোগ পেয়েছিলাম।

১৯৪৯ সালের বসন্তকালে একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেল। এইসময় ফ্রাঙ্ক স্মাইথ দার্জিলিং এলেন। তিনি এমনই এক ব্যক্তিত্ব যাঁকে সমস্ত অভিযাত্রীরাই মান্য করে এবং আমিও তাঁর সাথে এভারেস্ট অভিযানে যাবার সৌভাগ্য লাভ করেছি। কোনও অভিযানের উদ্দেশ্যে নয়, এবারে তিনি এসেছেন হিমালয়ের এবং কিছু পাহাড়ী ফুলের ছবি তুলতে। কথা ছিল আমিও তাঁর সঙ্গে যাব।

অল্প সময়ের মধ্যেই বোঝা গেল ইনি আর সেই আগের মানুষটা নন, এবং ব্যাপারটা শুধু বয়েস বাড়ার নয়। একদিন তিনি দার্জিলিং-এর সুপরিচিত শিল্পী তাঁরই পরিচিত বন্ধু মিঃ সাইন এর স্টুডিও দেখতে গেলেন। স্টুডিও দেখে ফেরার সময় অতিথিদের জন্যে নির্দিষ্ট খাতায় সই করতে গিয়ে হাতে পেনটা নিয়ে তিনি খাতার কাছে ঝুঁকে কয়েক সেকেন্ড থমকে গেলেন। তারপর ম্লান হেসে বললেন, 'যাচ্চলে! নিজের নামটাই মনে করতে পারছিলাম না।' তারপর ধীরে ধীরে নিজের নাম সই করলেন। এরপর তারিখ বসাতে গিয়ে প্রথমে লিখলেন অক্টোবর, সেটা কেটে কি যেন ভেবে লিখলেন ডিসেম্বর.. । দুটোর কোনটাই নয় মাসটা ছিল মে। এর দু তিন দিন পরে দুজনে চৌরাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে তাঁর একটা অস্বাভাবিক আচরণ দেখে আমি কেমন হতচকিত হয়ে গেলাম। আমরা নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি হঠাৎ

তাঁর কণ্ঠস্বর আমূল বদলে গেল। তিনি বললেন, "তেনজিং আমার আইস এ্যাক্সটা দাও।" আমি ভাবলাম তিনি ঠাট্টা করছেন, পরিবর্তে আমিও একটা মজার কথা বললাম। এতে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হলেন এবং জেদ ধরলেন যে আইস এ্যাক্স তাঁকে দিতেই হবে। তাঁর ভাবখানা হচ্ছে যে আমরা উচ্চ হিমালয়ে পর্বতারোহণ রত। বুঝলাম মারাত্মক একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হল। এর পর আবার যখন তাঁকে দেখতে গেলাম তিনি আমাকে চিনতে পারলেন না। কেমন এক অর্থহীন ঘোলাটে চেখে তাকিয়ে রইলেন, আর কঠিন কোনও পর্বত আরোহণ সম্পর্কে কাকে যেন সতর্ক নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন। ডাক্তাররা বলাবলি করলেন যে মস্তিষ্ক এবং শিরদাঁড়ায় এক কঠিন পীড়ায় তিনি আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁকে দ্রুত ইংলণ্ডে ফেরত পাঠানো হল। কিন্তু সেখানেও কিছু করা গেল না, কদিন পরেই তিনি মারা গেলেন। এমন এক বড় মাপের পর্বতারোহীর এই অকাল প্রয়াণে বড়ই কষ্ট পেলাম।

বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অস্থিরতা কমেছে, আবার নতুন করে অভিযানের তোড়জোড় শুরু হল। পুরনো বন্ধু রেনি ডিটার্ট একটা বড়সড় সুইস দল নিয়ে দার্জিলিং এসে হাজির। এবারে তাঁরা নেপালের দিক থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা আরোহণের চেষ্টা করবেন। আমাকে দলে পেতে আগ্রহী। আমারও খুব ইচ্ছে ছিল এই সুইস দলটির সঙ্গী হতে। কিন্তু আগেই আমি এইচ. ডব্লিউ. টিলম্যানকে কথা দিয়েছি তাঁর সঙ্গে যাব। তিনিও যাবেন নেপালে। টিলম্যানকে আমি ১৯৩৮ এর এভারেস্ট অভিযানের সময় থেকে চিনি, তিনি একজন নামকরা পর্বতারোহী আর আমাদের বন্ধুত্বও পুরনো। টিলম্যান এসেছেন খবর পেয়ে আমি আরও চারজন শেরপাকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। সাক্ষাতের পর আমরা দুজনেই ফ্রাঙ্ক স্মাইথের স্মৃতিচারণ করলাম আর আমাদের উভয়েরই অভিন্ন হৃদয় বন্ধুর করুণ পরিণতিতে নতুন করে বেদনা অনুভব করলাম। টিলম্যানের সঙ্গে আরও দুজন ইংরেজ অভিযাত্রী রয়েছেন। আমরা ট্রেনে চেপে রক্সৌল এলাম, এবারে আমাদের লক্ষ্য নেপালের গভীরে। রক্সৌল থেকে লরীতে নেপালের ভীমপেদিতে এসে নামলাম। এরপর না আছে গাড়িঘোড়া না আ[illegible] রাস্তা। সরু পায়ে চলা পথ দিয়ে আমরা চলেছি আর অভিযানের মালপত্র রোপওয়েতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১৯৩৪ সালে শোলো খুম্বু থেকে পালিয়ে [illegible]পালের মধ্যে দিয়ে দার্জিলিং এসেছিলাম, আবাব এই এতদিন পরে নেপালের মাটিতে হাঁটছি ভাবতেই মনে এক অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে। সাহেবদের কাছেও ব্যাপারটা কম বিস্ময়কর নয়। কোন্ সেই আদিম কাল থেকে নেপাল তার দরজা বিদেশীদের জন্যে বন্ধ করে রেখেছে, কখনও কখনও মনে হয়েছে এ ব্যাপারে সে তিব্বতকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। তবে কম্যুনিস্টরা তিব্বতে প্রবেশ করার পর থেকে নেপাল একটু একটু করে বাইরের জগতের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করেছে। নেপাল বিদেশীদের জন্যে দরজা খুলে দেবার পর টিলম্যানের দলই প্রথম নেপালে প্রবেশ করল। আমার নাগরিকত্ব নিয়েও ঝামেলা আছে। যদিও আমি এখন একজন ভারতীয় তবু একদিন নেপালের অধিবাসী ছিলাম সেই অর্থে আবার নেপালীও বটে। কিন্তু নেপালীরা কি আমাকে নেপালী ভাববে?

নেপালের অধিকাংশ অংশ থেকে শোলো খুম্বু মোটামুটি বিচ্ছিন্ন। অন্যত্র কি ঘটছে না ঘটছে তার কোনও খবরই শোলো খুম্বুতে পৌঁছয় না, ওখানে একটা নিজস্ব নিয়ম এবং নিজস্ব জীবনধারা রয়েছে। ফলে রাজনৈতিকভাবে আমরা যে দেশের অংশ সে দেশটা সম্পর্কে খুবই কম জানতাম। আমার পরবর্তী জীবনে আমি অনেক জিনিস জেনেছি, জেনেছি অনেক ঘটনার পেছনের কারণসমূহকে, আগে যেগুলো শুধু মেনেই নিতে হত। যেমন নেপাল নিজেকে বহুদিন ধরে বাকি দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল, কারণ রাণাদের বংশ এখনকার রাজবংশকে ক্ষমতাচ্যুত করে একশো বছর ধরে নেপালে শাসন করছিল। রাণাদের মনে সব সময়েই ভয় ছিল যে বাইরের জীবনের প্রভাবে নেপালের লোক রাণাদের বিরোধী হয়ে উঠবে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এসে এমন দমবন্ধ করা অবস্থা চলতে পারে না। দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধে নেপাল থেকে বহু গোর্খা সৈন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গিয়েছে যুদ্ধের কারণে। এখন তারা ঘরে ফিরছে বাইরের দুনিয়া থেকে আলোকপ্রাপ্ত হয়ে। এছাড়া দেশের লোকও এই দমবন্ধ করা অবস্থার অবসান চায়, এমন ব্যবস্থা তাদের একেবারেই না পসন্দ। ভারতের তরফ থেকেও রাণাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। বিশ্বযুদ্ধও শেষ হয়েছে। এই সুযোগে বর্তমান রাজারা ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে নিল। তাঁরা যথেষ্ট উদার তাই ধীরে ধীরে নেপালের দরজা সকলের জন্যে খুলে দিল।

ভীমপেদির রুক্ষ পথ ধরে আমরা গিবিশিরার মাথায় উঠলাম। সেখান থেকে সবুজ উপত্যকা ঘেরা নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু দেখা গেল। ধীরে ধীরে কাঠমান্ডুতে নেমে এলাম। সেই কোনও ছোট বেলায় তের বছর বয়সে আমি শেষবারের মত এখান থেকে পালিয়েছিলাম, তারপর এই আমার প্রত্যাবর্তন। অনেক নতুন জিনিস চোখে পড়ল যা আগে ছিল না। নতুন নতুন বাড়ি, ইলেকট্রিক লাইন, টেলিফোন এমনকি কয়েকটা মোটর গাড়িও চোখে পড়ল। তবে বেশির ভাগটাই আজও পুরনো আমলের মত আছে। সেই আঁকাবাঁকা রাস্তাঘাট, বাজারের ভিড়, বৌদ্ধ আর হিন্দু মন্দির, সুন্দর দেওয়াল চিত্র, আর ভাস্কর্য। শহরের প্রান্তে সেই সবুজ ধানক্ষেত এবং দূর দিগন্তে সুউচ্চ হিমালয়। ঠিক এক বছর আগে আমি লাসায় যা দেখেছিলাম কাঠমাণ্ডুর সঙ্গে তার অদ্ভুত মিল আছে। আমার মনে হয় পৃথিবীতে এই দুই দেশের দুই রাজধানীই বোধহয় পাশ্চাত্যের সকল ছোঁয়া বাঁচিয়ে তাদের সংস্কৃতি বজায় রেখেছে। তফাৎ শুধু লাসা নির্জন শান্ত, সেখানে সকলেই তিব্বতী এবং বৌদ্ধ। আর কাঠমাণ্ডুকে দেখলে মনে হয় প্রাচ্যের সকল সংস্কৃতির মিলন ক্ষেত্র।

প্রফেসর তুচ্চির মত টিলম্যানের অভিযানেও পর্বতারোহণের কোনও পরিকল্পনা ছিল না। প্রফেসার তুচ্চি প্রাচীন পুথি উদ্ধার এবং সংস্কৃতির মূলে পৌঁছতে চেয়েছিলেন, আর টিলম্যান এসেছেন নতুন স্থান অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে। আমি ভেবেছিলাম কাঠমান্ডু থেকে শোলো খুম্বু হয়ে এভারেস্টের পথে যাওয়া হবে কিন্তু তা না করে উল্টোমুখে পশ্চিম হিমালয়ের লাংডাং বা লাংটাং এর দিকে প্রবেশ করলাম। কয়েকদিন একটানা ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে চললাম। পথে গ্রাম, পুরনো দুর্গ, প্যাগোডা ইত্যাদি কত কিই চোখে পড়ল। অনেকেই ভাবে নেপালের সামগ্রিক ঐতিহ্যে তিব্বতের ছোঁয়া আছে। কিন্তু সেটা ঠিক নয়, যুগ যুগ ধরে নেপাল তার

একটা নিজস্ব ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে। ক্রমশ আমরা আরও গভীরে প্রবেশ করছি, পর্বতারোহণ করতে না এসেও বেশ পাহাড় চড়তে হচ্ছে। আমাদের উত্তরে মধ্য পশ্চিম নেপালের সুউচ্চ পর্বতশ্রেণীর মধ্যে অন্নপূর্ণা, ধৌলাগিরি, মানাসলু এবং আরও অনেক শৃঙ্গ চোখে পড়ল, যেগুলো আগে দেখিনি।

এবারের হিমালয় পরিক্রমায় টিলম্যান মূলত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কাজে ব্যস্ত আছেন। তিনি নিজে ভৌগোলিক অনুসন্ধান করছেন, অন্য দুই বন্ধুর একজন ফুল সম্বন্ধে, অন্যজন খনিজ বস্তু সম্বন্ধে তথ্য তালাশে ব্যাপৃত। আমাদের এই নিরলস অভিযান তিন মাস ব্যাপী স্থায়ী হল। অনুসন্ধানের কাজে গভীর জঙ্গল থেকে সুউচ্চ পর্বত, হিমবাহ থেকে তুষার ক্ষেত্র এইভাবে পর্বতের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে চষে বেড়াচ্ছি। কখনও কখনও এমন সব দুর্গম স্থানে গিয়েছি যেখানে এর আগে মানুষের পায়ের চিহ্ন পর্যন্ত পড়েনি। এর মধ্যে একদিন আমরা একটা তুষার ক্ষেত্র পার হচ্ছি, এমন সময় জীবনে প্রথম স্নো ব্লাইন্ডনেস্ বা তুষার অন্ধত্বে আক্রান্ত হলাম। আমার সঙ্গে যে ঘন রঙ্গীন রোদ চশমা ছিল সেটা কদিন আগে হারিয়ে গেছে, ফলে আমি বাধ্য হয়ে খালি চোখে চলেছি। এমন সময় চোখে জ্বলুনি শুরু হল। প্রথমে চোখ রগড়ে ঠিক করার চেষ্টা করলাম তাতে কোনও রকম সুবিধা না হওয়াতে চোখে জলের ঝাপটা দিলাম। মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করে হাঁটার চেষ্টা করছি কিন্তু কিছুতেই জ্বালা কমছে না। সঙ্গীরা আমাকে সাহায্য করার আপ্রাণ চেষ্টা করল কিন্তু ফল হচ্ছে না। এমন একটা সময় এল যে জ্বালা সহ্য করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। মনে হচ্ছে চোখ দুটো খুলে চলে আসবে, মাঝেমাঝে মনে হচ্ছে কে যেন চোখের মধ্যে সার্চলাইটের আলো ফেলছে। এরকম অবস্থা চলেছিল যতদিন আমরা তুষার ক্ষেত্রে ছিলাম। ভাগ্য ভাল যে তুষার অন্ধত্ব ব্যাপারটা বেশিদিন স্থায়ী হয় না। কিন্তু তারপর থেকে রোদচশমা বা সানগ্লাসের ব্যাপারে আমি সতর্ক হয়ে গেছি। এখন থেকে অভিযানে গেলে সবসময়ে দুটো চশমা সঙ্গে রাখতে ভুলি না।

যখন আমরা জঙ্গলে প্রবেশ করতাম, তখন ঘন অরণ্যে প্রায়ই রাস্তা হারিয়ে ফেলতাম। কখনও সহজেই রাস্তা খুঁজে পেতাম আবার কখনও মনে হত যে আর বোধহয় কোনওদিন এই জঙ্গল থেকে মুক্তি পাব না। এ দিন হল কি, আমি, টিলম্যান এবং দাওয়া নামগিয়া বাকি সদস্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জঙ্গলে হারিয়ে গেলাম। দলের কাউকে খুঁজে পাওয়া দূরের কথা, জন-মানবের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। অবশেষে হাল ছেড়ে রাতের আশ্রয়ের সন্ধান করার কথা ভাবছি এমন সময় দূরে কিছু আওয়াজ পেলাম। আওয়াজ লক্ষ্য করে ওপরে এসে ঐ এলাকার স্থানীয় উপজাতি লিম্বাস গোষ্ঠীর একজন গ্রামবাসীর দেখা পেলাম। আমি এবং দাওয়া তার সঙ্গে কথা বলে তাদের গ্রাম পর্যন্ত আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে রাজি করালাম এবং তাকে পাঁচটা টাকা দিলাম। এমন সময় টিলম্যান সেখানে এসে উপস্থিত হল। চুলদাড়ি সমেত টিলম্যানকে এতই কদাকার দেখাতে লাগত যে শেরপারা পর্যন্ত ঠাট্টা করে তাকে বালু বা ভল্লুক বলে ডাকত। তার ভ্রু দুটো এতই ঘন এবং ঝুলন্ত যে বরফের রাজত্বে যখন চুল এবং গোঁফের সঙ্গে তার ভ্রুতে তুষার জমে যেত তখন সে দুটোকে দেখে বরফের রীজ্ বা ঝালরের মত মনে হত। এই জঙ্গলে একমাথা চুল, বড় বড় দাড়ি গোঁফ, সাথে ঐ বিখ্যাত

ভ্রূজোড়া, আর তার সঙ্গে গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত জামার বোতাম খোলা সেখান থেকে বুকের ঘন চুল দেখা যাচ্ছে, কিরে বাবা? পাহাড়ের অনেক অধিবাসীর মত লিম্বারাও মোটামুটি লোমহীন। এই লোকটা সম্ভবত, সম্ভবত কেন নিশ্চয় টিলম্যানের মত মনুষ্য আকৃতির জীব জীবনে দেখেনি, কাজেই ঐ একবার দর্শনেই তার আত্মা খাঁচা ছাড়া হবার জোগাড়। আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই মুখ থেকে 'বাপরে' গোছের একটা আর্তনাদ ছেড়ে মুহূর্তের মধ্যে লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেল। আমাদের গ্রামে ফেরার আশা, সেই সঙ্গে পাঁচটা টাকা গায়েব।

অবশেষে সন্ধ্যে নামলে আমরা একটা গাছের তলায় আস্তানা নিলাম। কাছেই কোথাও জল পড়ার আওয়াজ পেয়ে অনুসন্ধানের আশায় এগিয়ে যেতেই টিলম্যান বাধা দিয়ে বললেন, হতে পারে ঐ জল পান করার জন্যে ওখানে বন্য জন্তু আসে। আর এদিকের জঙ্গলে যথেষ্ট বাঘ ভাল্লুক আছে, রাতের অন্ধকারে তাদের মুখোমুখি হওয়া ঠিক নয়। ভোরের আলো ফুটলে জলপানের জন্যে যখন সেখানে গেলাম তখন দেখলাম তিনিই ঠিক। জলার আশপাশে নরম কাদায় বন্যজন্তুর অজস্র পায়ের দাগ। শেষ অব্দি অবশ্য বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তবে এবারের অভিযানে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ঘটনা এতবার ঘটেছে যে ঠিকঠাক সংখ্যাটা মনে করে বলা সম্ভব নয়। জঙ্গলে পথ তৈরি করতে কুকরী দিয়ে শুধু ঝোপঝাড় কেটে এগিয়ে গেছি। বরফের খাড়া দেওয়ালে উঠতে আইস এ্যাক্স দিয়ে কত শত ধাপ কাটতে হয়েছে, বিপজ্জনক রাস্তায় দড়ি খাটিয়ে সতর্ক হয়ে পথ চলেছি—আর পথের অনুপুঙ্খ বর্ণনায় টিলম্যানের নোটবই ভরে গেছে। আমাদের পিঠের ভারি বোঝা আরও ভারি হয়েছে সংগ্রহ করা নানা প্রয়োজনীয় জিনিসে। আর আমরা যখনই কোনও লিম্বাস গ্রামে (এ অঞ্চলে বেশির ভাগ গ্রামই লিম্বাসদের) পৌঁছেছি, তারা টিলম্যানকে দেখে হয় ভয়ে পালিয়েছে, নয়ত কুতূহলী হয়ে তার চারদিকে ভিড় জমিয়েছে যেন ভিন গ্রহের কোনও জীব। তাই যখনই কোনও প্রয়োজনে গ্রামে যাবার দরকার হয়েছে তখন আমরা শেরপারা এগিয়ে যেতাম। এরপর কাজ হাসিল হবার পর টিলম্যান আত্মপ্রকাশ করত।

এ যাত্রায় আমরা যে সব অঞ্চল দিয়ে গিয়েছি সেখানকার মানুষ কিম্বা জঙ্গলের প্রাণী কেউই আমাদের অসুবিধের কারণ হয়নি কিন্তু, পশ্চিম নেপালের কুখ্যাত জোঁক আমাদের কাছে বিভীষিকা হয়ে দেখা দিল। নীচু স্যাঁতসেঁতে জলাভূমির সর্বত্র জোঁকের ছড়াছড়ি, জলার ধারে কাদামাটি, ভিজে ঘাসের জমি এমনকি গাছে পাতার মধ্যে জোঁক যখন তখন টুপটাপ খসে পড়ে। জোঁকের কামড়ে বিষ নেই, যন্ত্রণাও নেই। জোঁক ধরলে কোনও অনুভূতি থাকে না। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত শরীরের মধ্যে খুঁজে দেখা হচ্ছে অথবা পোশাক পরিবর্তন করা হচ্ছে, ততক্ষণ জোঁক ধরেছে কিনা বোঝার উপায় নেই। প্রথম অবস্থায় জোঁক এত সরু থাকে যে জুতোর ফিতে বাঁধার গর্ত দিয়ে ঢুকে পড়ে। তারপর চামড়ার মধ্যে বসে রক্ত চোষা শুরু করে, রক্ত চুষে বেলুনের মত ফুলে ওঠে এবং এত জোরে মাংসের মধ্যে কামড়ে থাকে যে টানাটানি করে খোলা যায় না। হয় আগুনে ছেঁকা দিতে হবে নয়ত ধারালো ছুরি দিয়ে চেঁচে তুলতে হবে। নুন জোঁকের যম, সারা গায়ে নুন মাখতে পারলে জোঁক ধরে না, কিম্বা যদি

কেরোসিন মাখা যায় তাহলেও জোঁক ধরে না, তবে কোরোসিনের যা গন্ধ তার চেয়ে জোঁকের কামড় খাওয়া ভাল। কাজেই বেশির ভাগ সময় জোঁক ধরলে কুকরী দিয়ে তাকে চেঁছে ফেলাটা আমার নিয়মিত কাজ দাঁড়িয়ে গেল। জঙ্গলে আমার এটাই প্রথম অভিযান আর জঙ্গল সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হল।

এবার ডাক পেলাম পুরনো বন্ধু 'ডুন স্কুল পর্বত—বন্দর পুঞ্ছ' খ্যাত মিঃ গিবসনের কাছ থেকে। শীতকালে চিঠি লিখে কথাবার্তা ঠিক হল, আর ১৯৫০ এর বসন্ত কালে আমরা আবার সেই পরিচিত পুরনো পথ ধরে বন্দরপুঞ্ছের দিকে চলেছি। আনকোরা তিনজন পর্বতারোহীকে এবারে দলভুক্ত করা হয়েছে। রয়েছেন মেজর জেনারেল উইলিয়ামস্, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান, রয় গ্রিনউড়, সৈন্যবাহিনীর সার্জেন্ট ইনস্ট্রাক্টর এবং ডুন স্কুলের তরুণ প্রশিক্ষক গুরুদয়াল সিং। আমাদের দুটো নিয়ে মোট সাতবার বন্দরপুঞ্ছ আরোহণের জন্যে বিভিন্ন ভাবে অভিযান চালানো হয়েছে। ১৯৪৬ সালে গিবসন এবং আমি শেষবার চেষ্টা করেছি তারপর আবার আমরাই চলেছি বন্দরপুঞ্ছ অভিযানে। এটা নিয়ে আমাদের তৃতীয় প্রচেষ্টা। অভিযানের প্রথম দিকে গিবসন একদিন স্বগোতক্তি করলেন, "এবারে আমরা কিছুতেই ফিরছি না।" আমারও অবশ্য ঐ একই মত। এভারেস্ট আমার কাছে অত্যন্ত পরিচিত এক পর্বতশীর্ষের নাম, আর তারপরই যার নাম করতে হয় তা এই বন্দরপুঞ্ছ। এবারে সত্যিকারের একটা আরোহণের সুযোগ আসতে পারে জেনে আমি মনে মনে আনন্দ পেলাম।

গাড়োয়াল হিমালয়ের উপত্যকা, নদীর ধার, আবার কখনও বা উঁচু পাহাড়ে পথ করে চলেছি আমরা। আজ থেকে তের বছর আগে আমরা প্রথম এ পথে এসেছিলাম। দ্বিতীয়বার এসেছি সেও চারবছর হয়ে গেল এবং তৃতীয়বার আমরা উভয়েই মূল শিবির স্থাপন করলাম আগের দুবারেব জায়গায়। ১৯৪৬ সালের রাস্তা ধরেই পরের শিবিরগুলো স্থাপন করছি তবে রাস্তার চেহারা অনেক বদলে গেছে। যেখানে বরফের কোনও কার্নিস ছিল না এখন তা হয়েছে, এছাড়া ভয়ঙ্কর সব বরফের দেওয়াল থেকে সবসময়েই হিমানী সম্প্রপাতের আশঙ্কা রয়েছে। ভরসা একটাই যে আবহাওয়া শান্ত যা হিমালয়ে যে কোনও অভিযানে অত্যন্ত মূল্যবান বিষয়। আঠার হাজার ফুট উঁচুতে আমরা তৃতীয় শিবির স্থাপন করলাম, শীর্ষের কাছাকাছি এসে গেছি। জেনারেল উইলিয়ামসের বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে অথচ তিনি সুন্দরভাবে এই পর্যন্ত এগিয়ে এসেছেন, সদস্য হিসেবে তিনি অতি চমৎকার মানুষ। দলের সাফল্যের জন্যে যে কোনও ত্যাগ স্বীকারে সদাই প্রস্তুত। আমাকে বারবার বলছেন, আমার জন্যে তুমি চিন্তা ক'র না তেনজিং, আমি ঠিক আছি। তুমি বরঞ্চ দলের তরুণদের দিকে নজর দাও যাতে ওরা সফল হয়। শীর্ষারোহণ করার কোনও মোহ আমার নেই। আমরা নিশ্চিত যে তৃতীয় শিবির থেকে আমরা সবাই অনায়াসে শীর্ষে পৌঁছে যাব। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গুরুদয়াল সিং উচ্চতাজনিত অসুস্থতায় আক্রান্ত হল। তার যা অবস্থা দাঁড়ালো যে তাকে এখনই নিচে নামিয়ে দিতে হবে। দলনেতা হিসাবে গিবসন সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। শীর্ষারোহণের আশা ত্যাগ করে তিনি গুরুদয়ালকে সঙ্গে নিয়ে নিচে নামা শুরু করলেন। আমরা ঠিক করলাম পরের দিন খুব সকালে জেনারেল

উইলিয়ামস্ এবং কয়েকজন শেরপাকে তিন নম্বর শিবিরে সাহায্যকারী দল হিসেবে রেখে গ্রিনউড এবং শেরপা কিন চোক শেরিংকে নিয়ে আমি আরোহণের চেষ্টা করব। সুন্দর পরিচ্ছন্ন আবহাওয়ার মধ্যে দিয়ে আমরা উঠে আসছি। কয়েক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে, একটা উঁচু জায়গায় পৌঁছে দেখি সামনে উঠে যাবার মত ঢাল অদৃশ্য হয়েছে। এবার এগিয়ে গেলে নিচে নামতে হবে। পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম, তাহলে কি আমরা শীর্ষে পৌঁছে গেছি? এতদিন পর তাহলে সত্যি সত্যিই কুড়ি হাজার সাতশো কুড়ি ফুট উঁচু বাঁদরের লেজটা ধরা গেল! কিছুক্ষণ শীর্ষে অবস্থান করে আমাদের ফেরা শুরু হল। শিবিরে ফিরে মিঃ গিবসনের সঙ্গে দেখা। তিনি গুরুদয়ালকে মূল শিবিরে পৌঁছে দিয়ে আবার ফিরে এসেছেন।

দারুণ সাফল্য! বহুদিন পর আমাদের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। দলনেতা গিবসন সেদিনের উৎসবকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে বন্দরপুঞ্ছের নামে উৎসর্গ করলেন। পরদিন দলনেতা, উইলিয়ামস্ এবং কয়েকজন শেরপার দ্বিতীয় দল খুব সকালে শীর্ষারোহণের উদ্দেশ্যে রওনা হল। কিন্তু বিধি বাম, সেদিন আবহাওয়া হঠাৎই খারাপ হয়ে গেল, ঝড়ের সাথে তুষারপাতে চারীদিক অন্ধকার হয়ে এল, তাঁরা ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। পরের দিন যদিও আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের খাবার ফুরিয়ে গেছে, বাধ্য হয়ে ফিরতে হল। মিঃ গিবসনের জন্যে মনে কষ্ট পেলাম, সাফল্যের দোরগোড়ায় এসেও স্বেচ্ছায় তা ত্যাগ করলেন একজন সহযাত্রীকে সাহায্য করার জন্যে। সেই সময় তিনি মনে করেছিলেন যে তিনিই একমাত্র উপযুক্ত মানুষ যে কিনা অসুস্থ সহযাত্রীকে নিরাপদে মূল শিবিরে পৌঁছে দিতে পারেন। দলনেতার উপযুক্ত সিদ্ধান্তই বটে! তিনি আরোহণ করতে পারলেন না কিন্তু তার জন্যে তাঁর বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই। পরন্তু দলের সামগ্রিক সাফল্যে এক তৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে পড়ল তাঁর মুখে। এরই নাম পর্বতারোহণ! আর এই হল একজন প্রকৃত পর্বতারোহীর চরিত্র। তাঁর মত একজন সঙ্গীর সঙ্গে পর্বতারোহণে যেতে পেরেছি বলে আমি গর্বিত।

বন্দরপুঞ্ছ থেকে ফেরার পথে আমরা ডোডিতাল বলে একটা মনোরম হ্রদের ধারে এসে বিশ্রাম করছি। সেখানে এমন একটা ঘটনা ঘটল যা সহজে ভোলার নয়। ঘাসের জমিতে চিৎ হয়ে শুয়ে আছি, মুখটা রোদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে টুপিটা মুখে চাপা দিয়েছি। কখন ঘুমিয়ে গেছি এমন সময় আধো জাগরণে মনে হল আমাব টুপিটা কেমন যেন ভারি হয়ে মুখের উপর চেপে বসেছে। ব্যাপারটা কি বোঝার জন্যে টুপির উপর হাত দিয়ে ঠাণ্ডা পিচ্ছিল একটা স্পর্শ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা বুঝে গেছি—মুখে একটা আওয়াজ করে টুপিটা সমেত বস্তুটা যতদূরে সম্ভব ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। আমার চিৎকারে অন্যান্য বন্ধু শেরপারা জেগে উঠেছে। দেখি একটা সাপ ধীরে ধীরে আমার টুপি থেকে নেমে যাচ্ছে। সেটা হয়ত রোদ পোহাবার জন্যেই আমার টুপির গরমে চেপে বসেছিল। অন্য শেরপাদের হাতে তার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটল। এই হত্যাকাণ্ড দেখে স্থানীয় কুলিরা দুঃখ প্রকাশ করল। গাড়োয়ালী প্রবাদ অনুযায়ী কারও মাথায় যদি সাপ ওঠে সে নির্ঘাৎ রাজা হবে! যাই হোক সেটা তাদের ভাবনা। আমি একজন সাধারণ মানুষ, রাজমুকুটের মর্ম বোঝা আমার কর্ম নয়। কিন্তু টুপিটা হাতছাড়া করলে আমার চলবে না।

নাঙ্গা পর্বত

হিমালয়ের পশ্চিমে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত এভারেস্ট আর দার্জিলিং থেকে হাজার মাইল পূর্বে আর এক উলঙ্গ পর্বত মৃত্যু তার বিপদের শিরোপা মাথায় পরে উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, তাঁর নাম নাঙ্গা পর্বত—যে একাই সব কটি বিখ্যাত পর্বতেব তুলনায় অনেক বেশি পর্বতারোহীর জীবনের মূল্য বুঝে নিয়েছে। ১৯৫৩ সলে এভারেস্ট সফল অভিযানের ঠিক পাঁচ সপ্তাহ বাদে হার্মান বুল অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের সঙ্গে একা নাঙ্গা পর্বত আরোহণ করেন। তিনি জার্মান-অস্ট্রিয়ান যুগ্মদলের সদস্য ছিলেন।

১৯৫০ সালে আমি যখন নাঙ্গা পর্বত অভিযানে যাই তখনও পর্যন্ত সে অপরাজিত। এর আগে মোট ছবার অভিযান সংগঠিত হয়েছে এবং প্রত্যেকটার পরিণতি হয়েছে অত্যন্ত করুণ। তখন থেকে সবাই ধরে নিয়েছিল এখানে বোধ হয় আরোহণ করা বোধহয় সম্ভব নয়। বহু পূর্বে ১৮৯৫ সালে বিখ্যাত ইংরেজ পর্বতারোহী মিঃ এ এফ মামেবী নাঙ্গা পর্বত অভিযান করেন। এটাই ছিল তাঁব হিমালয়ে প্রথম এবং শেষ অভিযান। দুজন বৃটিশ অভিযাত্রী, দুজন গোর্খা এবং কয়েকজন স্থানীয় পোর্টাব সমেত তিনি মূল শিবির স্থাপন করেন। প্রথমে খুব সুন্দরভাবে তাঁরা বাইশ হাজাব ফুট পর্যন্ত আরোহণ করলেন পরে দুজন গোর্খা সহ তুষারাচ্ছাদিত একটি গিরিবর্ত্ম পার হবার জন্যে তিনি বওনা হন—কিন্তু সেটাই শেষ. তারপব তাঁদের আর দেখা যায়নি। অনুমান, হিমানী সম্প্রপাতে দুই সঙ্গী সহ তিনি বরফেব নিচে চাপা পড়ে গেছেন।

তারপব সাঁইত্রিশ বছর লেগেছে দ্বিতীয়বাব অভিযান সংগঠিত হতে। ১৯৩২ সলে একটা জার্মান-আমেরিকান যৌথ দল দ্বিতীয়বাবে নাঙ্গা পর্বত অভিযানে গিয়ে অন্য একটি পথে তেইশ হাজার ফুট পর্যন্ত উঠতে সক্ষম হল। তারা যে পথে গিয়েছিল পরবর্তী সময়ে সবকটি দল সেই পথেই চেষ্টা করেছে। ঝড় এবং প্রচুর তুষার পাতের দরুণ তারা নেমে আসতে বাধ্য হলেও স্বস্তি একটাই যে এই অভিযানে কোনও প্রাণহানি ঘটেনি।

এরপর ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৭ জার্মানদেব পালা। এই দুই অভিযানে হিমালয়ের সর্বকালের সব কটা দুর্ঘটনার কাহিনীকে স্তব্ধ করে দিয়ে ঘটে গেল মর্মান্তিক সব দুর্ঘটনা। ১৯৩৪ এর আগে শেরপারা নাঙ্গা পর্বত অভিযানে অংশগ্রহণ করেনি। আর এই দুটো অভিযানেই তাদের পনেব জনকে প্রাণ দিতে হল। ১৯৩৪-এর প্রাণঘাতী অভিযানের দুঃখজনক পরিণতির প্রধান কারণ হল এক সপ্তাহব্যাপী এক ভয়ঙ্কর ঝড়। এই প্রসঙ্গে শেরপা গেলে বা গিয়েলির কথা মনে পড়ে (যার কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি); ইচ্ছে করলে সে বাঁচতে পারত কিন্তু দলনেতা উইলি মার্ককে একা রেখে নেমে আসার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল এইরকম একটা জিদ নিয়ে সে হিমালয়ের চিরতুষারের রাজত্বে রয়ে গেল। এর চার বছর বাদে তাদের দুজনের দেহ একটা তীক্ষ্ণ শৈলশিরায় অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এবং ঐ একই ঝড়ের মাঝে তিনজন জার্মান এবং পাঁচজন শেবপা নেমে আসার জন্যে অন্তিম লড়াই চালিয়ে হেরে যায়। ১৯৩৮-এর অভিযানের সময় তাদেব মধ্যে একজন শেবপা পিঞ্জু নববুকে মৃত অবস্থায়

পাওয়া যায় একটা বরফের দেওয়ালের গায়ে। দড়িতে ঝুলছে মাথা নিচের দিকে, সে নেমে আসতে চেষ্টা করছিল।

১৯৩৭ এর অভিযানে সাতজন জার্মান এবং নজন শেরপা প্রাণ দিল। এবারের ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে কেউ কিছু বুঝে ওঠবার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল। নাঙ্গার পূর্ব শৈলশিরার ঠিক নিচে চার নম্বর শিবির। এক গভীর রাতে এরা সবাই যখন তাঁবুর নিশ্চিন্ত আরামে শুয়ে আছে তখনই অকস্মাৎ এক বিশাল আকারের অ্যাভালেন্স অর্থাৎ হিমানী সম্প্রপাতের ধাক্কায় সবার সমাধি হয়ে গেল। বাইরে আসার জন্যে কেউ কোনও রকম সুযোগ পায়নি। গ্রীষ্মকালে এক উদ্ধারকারী দল গিয়েছিল তাদের খোঁজে। তারা দেখেছিল, তাঁবুর মধ্যে স্লিপিং ব্যাগে পরম নিশ্চিন্তে যেন তারা ঘুমিয়ে আছে। দুজন জার্মান বাদে সকলের দেহই পাওয়া গিয়েছিল। এবং জার্মানদের দেহ কবর দেবার জন্যে নামিয়ে আনা হয়। কিন্তু উদ্ধারকারী দলের শেরপা সর্দার নরসংয়ের অনুরোধে শেরপাদের দেহগুলি ঐ অবস্থায় রেখে দেওয়া হয় যাতে তাদের ঘুমেব কোনও ব্যাঘাত না ঘটে। ১৯৩৭ এর অভিযান থেকে কেবল একজন শেরপাই বেঁচে ফিরেছিল, সে আমার পুরনো বন্ধু দাওয়া থোণ্ডুপ, দুর্ঘটনার সময় সে মূল শিবিরে ছিল।

১৯৩৮ এবং ১৯৩৯ পরপর দু'বছর জার্মানরা আবার নাঙ্গা পর্বত অভিযান করে কিন্তু আগের দু দুটো অভিযানের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার জন্যে কোনও অভিজ্ঞ শেরপা অংশগ্রহণ করেনি। এবং দুটো অভিযানই সামান্য প্রচেষ্টার পর পরিত্যক্ত হয়, বোধহয় সেই কারণেই এ দুবারে কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু এব মধ্যেই নিষ্ঠুর নাঙ্গা পর্বত ঊনত্রিশটা প্রাণ ছিনিয়ে নিয়েছে। সর্বশেষ আরও দুটো যোগ হল এই ১৯৫০ এর অভিযানে।

এর আগে আমাব এদিকে আসা হয়নি, কারণ আগ্রহের অভাব। সেভেন্থ গোর্খা রাইফেলেব কাপ্টেন জে. ডব্লিউ. থর্ণলের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল, তিনি মাঝে মাঝে আমাকে চিঠি দিতেন। আমরা দুজন ১৯৪৬ সালে জেমু হিমবাহ অভিযানে গিয়েছিলাম। তাঁর ইচ্ছে ছিল কোনওদিন একটা বড় মাপের অভিযান সংগঠিত করবেন। অবশেষে এই নাঙ্গা পর্বত অভিযান। দলে রয়েছেন এইটথ গোর্খার ডব্লিউ. এইচ. ক্রেস এবং বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার্স-এব লে. রিচার্ড মার্শ। থর্ণলেব পরিকল্পনা ছিল এক বছব ধরে কারাকোরাম রেঞ্জ, পশ্চিম তিব্বত এবং রাশিয়ার তুর্কিস্থান সীমান্ত অঞ্চলে অনুসন্ধান চালান। আমার মত একজন জাত ভবঘুরে যার রক্তে অভিযানের উন্মাদনা ছড়িয়ে আছে তার কাছে এমন সুন্দর পরিকল্পনার কোনও তুলনাই হয় না (অবশ্য এটা আমার স্ত্রী আং লামুর চিন্তা-ভাবনা আব আমিও এ বিষয়ে তাকে মোটেই ঘাঁটাই না)। ১৯৫০ এর অগাস্টে বন্দরপুঞ্ছ অভিযান থেকে ফিরেই আবার যাত্রা। সর্দার হিসেবে আমি, এ ছাড়াও দলে রয়েছে আং তেম্বা, আজিবা এবং ফু যার্কে।

কলকাতায় এসে আমরা মার্শের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম এবং ভারতের অন্যপ্রান্তে রওনা হলাম। কিন্তু পাসপোর্ট এবং ভিসা সংগ্রহ করতে প্রথমেই বাধা পেলাম। আমরা যে অঞ্চলে যাব সেটা এখন পাকিস্তানে, কোনও মতে সে বাধা অতিক্রম করে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেব রাওয়ালপিণ্ডি রওনা দিলাম। সেখানে থর্ণেল এবং ক্রেস আমাদেব জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

রাওয়ালপিন্ডি থেকে পেশোয়ার, পেশোয়ার থেকে প্লেনে খাইবার পাস অতিক্রম করে গিলগিট। এর আগে আমি এবং আমার বন্ধুরা কেউ প্লেনে চাপিনি। সেটা ছিল আমাদের কাছে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। প্লেন ছাড়ার আগে আদেশ হল বেল্ট দিয়ে চেয়ারের সঙ্গে নিজেদের বেঁধে ফেল, সে এক জড় ভরত অবস্থা! যতক্ষণ পর্যন্ত না সেটা খোলার অনুমতি পেলাম ততক্ষণ দারুণ অস্বস্তি, আর বেল্ট খোলার পর আমাদের হুড়োহুড়ি পড়ে গেল জানালা দিয়ে নিচে দেখার জন্যে। যাই হোক, খুব লম্বা রাস্তা নয়, অল্প সময়ই লেগেছিল গিলগিট পৌঁছতে।

এখান থেকে শুরু হবে আমাদের আসল অভিযান। আমরা দুটো দলে বিভক্ত হয়ে উত্তর দিকে হাঁটা শুরু করলাম। প্রথম দলে মার্শ এবং আমি সঙ্গে কুড়িজন স্থানীয় মালবাহক। আমরা আগে রওনা দিলাম এবং ঠিক হল আমাদের দশদিন পর দ্বিতীয় দল রওনা হবে। চিত্রলি ভাষাটা বলতে পারি বলে এবারের অভিযানে দলের একটা বাড়তি সুবিধে হয়েছে। তবে অসুবিধেও কম নেই। আমরা রুশ এবং আফগান সীমান্তের কাছে সীমশালের দিকে এগিয়ে চলেছি। ব্যবসায়ীর দল এই পথে যাতায়াত করত। তিব্বতের মালভূমির চেয়ে এ পথ অনেক নিস্তব্ধ। না কোনও গাছ, না একটা ঝরনার শব্দ, না কোনও জীবনের স্পন্দন। নিজেদের কেমন অসহায় মনে হচ্ছে। সীমশাল পর্যন্ত ভালই এলাম কিন্তু তারপর থেকে মার্শ এবং আমি কঠিন ডাইরিয়ায় আক্রান্ত হলাম। কয়েকদিন নাগাড়ে পায়খানা করে দারুণ দুর্বল হয়ে পড়লাম। পাকিস্তান, আফগানিস্তান, তিব্বত এবং রাশিয়ার সীমান্ত যেখানে মিশেছে এবার আমাদের লক্ষ্য সেই মিলনস্থল। এ অঞ্চল সম্পর্কে খুবই কম জানা আছে মানুষের। দুর্বল শরীরে হাঁটছি এমন সময় পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বার্তা এল, ফিরে এস। কারণ আমাদের অনুমতি দেবার পর তাদের ভয় হয়েছে যে আমরা সীমান্ত পর্যন্ত গেলে রাশিয়ার সঙ্গে পাকিস্তানের কোনও কূটনৈতিক বিবাদ হতে পারে। বাধ্য হয়ে ফিরে এলাম।

এখন একটাই রাস্তা খোলা আছে আর তা হল কারাকোরাম। এখানে বিখ্যাত পর্বতশৃঙ্গ গডউইন অস্টিন বা কে-২ র দেখা পাওয়া যাবে। এর আগে আমি ঐ অঞ্চলে যাইনি। আর তাছাড়া আমাদের দলটা এতই ছোট যে কে-২ অভিযান আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অবশেষে আমরা গিলগিট ফিরে অন্য সাহেবদের সঙ্গে দেখা করলাম।

এবার সাহেবরা ঠিক করল পাকিস্তান আর কাশ্মীরের সীমান্তে নাঙ্গা পর্বতের দিকে যাবে। অভিযান করতে গেলে এর উত্তরে দিক থেকে করাই ভাল যেটা বিতর্কিত কাশ্মীরের দিকে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার অনুমতি নেবার দরকার নেই কারণ আমরা এখন গিলগিট থেকে এই অঞ্চলে এসেছি। তবে নাঙ্গার মত বড় মাপের পর্বতে অভিযান চালাতে গেলে যে সরঞ্জাম, লোকবল, অর্থ এবং প্রস্তুতি লাগে তার কোনওটাই আমাদের নেই, কাজেই আরোহণের প্রচেষ্টার কোনও প্রশ্ন উঠে না। সাহেবরা গম্ভীরভাবে আলোচনা করতে বসল। তাদের আলোচনার ধরন দেখে মনে হল এত উৎসাহ এবং উদ্দীপনা নিয়ে শুরু করার পর অভিযান এইভাবে ব্যাহত হওয়ায় তারা মর্মাহত হয়েছে। বিশেষ করে দলনেতা থর্ণলে খুবই মুষড়ে পড়লেন। অবশেষে অনেক আলোচনার পর তাঁরা ঠিক করলেন যে অভিযান একেবারে পরিত্যাগ না করে শেষ চেষ্টা হিসাবে নাঙ্গা পর্বতে আরোহণের চেষ্টা করা হবে। আমার মনে

হল যে এটা একটু বেশি ঝুঁকি নেওয়া হচ্ছে। এছাড়া আমাদের না আছে অভিযানের অনুমতি না আছে উপযুক্ত সরঞ্জাম। তাছাড়া নাঙ্গা পর্বতের মত পর্বত অভিযানের পক্ষে দলটা যথেষ্ট ছোট। নভেম্বর মাস, শীত এসে যাচ্ছে, সর্বোপরি নাঙ্গা এর মধ্যে 'মানুষ খেকো'-র কুখ্যাতি অর্জন করেছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সাহেবরা যদি একবার কিছু করার ঠিক করে, তবে সহজে তা পরিত্যাগ করে না। থর্ণলেকে আমি বাস্তব অবস্থাটা বোঝাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তাঁর সেই বিনয়ী উত্তর, "চলই না একবার চেষ্টা করে দেখা যাক, সেরকম বুঝলে ফিরে আসা যাবে।" অতএব আমরা প্রস্তুত হয়ে রওনা দিলাম। অবশেষে নাঙ্গা পর্বতের উত্তরদিকে ফেয়ারি-টেল মিডো (Fairy-tale-Meadow), যে জায়গা থেকে জার্মানরা বরাবর অভিযান সংগঠিত করে সেখানে এসে তাঁবু গাড়লাম। এবার আমাদের সামনে শুধুই নাঙ্গা পর্বত।

জীবনে প্রথম এই বিখ্যাত কিম্বা কুখ্যাত পর্বতকে ভাল করে দেখার সুযোগ পেলাম। কিন্তু নামের সঙ্গে কোনও মিল খুঁজে পেলাম না। ভেবেছিলাম হয়ত দেখব নেড়া পাথরের কঠিন খাড়া দেওয়াল উঠে গেছে শীর্ষ পর্যন্ত, পরিবর্তে গোটা পাহাড়টায় উন্মুক্ত পাথরের চিহ্নমাত্র চোখে পড়ল না। হিমবাহ, তুষার আর বরফের ঝুলন্ত কার্নিশে গোটা পাহাড়টা ঢাকা পড়ে আছে। আমি কয়েকবার এভারেস্ট অভিযানে গিয়েছি, কাজেই ছাবিবশ হাজার ছশো যাট ফুট উচ্চতার পৃথিবীব নবম উচ্চতম পর্বত হিসেবে নাঙ্গা পর্বত আমার কাছে গুরুত্ব পাবার কথা নয়। কিন্তু বারহাজার ফুটের মূল শিবির থেকে বিশাল আর ভয়ঙ্কর আকৃতির পর্বত দেখে মনে হল এমনটি এর আগে কখনও দেখিনি। সিন্ধুনদের দিক থেকে নাঙ্গা পর্বতের সানুদেশ আর শিখরের দূরত্ব যে কোনও পর্বতের তুলনায় অধিক। এর বরফ-এর দৈত্যাকৃতি চেহারা দেখে আমার মনে হয়েছে এ এক নিষিদ্ধ পর্বত, নাঙ্গা পর্বত নাম না হয়ে এর নাম হওয়া উচিত ছিল জায়েন্ট মাউন্টেন বা দৈত্য পাহাড়। মূল শিবিরেব কাছে এক খাড়া পাথরের গায়ে ১৯৩৪ এবং ১৯৩৭ সালে যে সমস্ত অভিযাত্রীরা প্রাণ হারিয়েছে তাদের নাম খোদাই করা রয়েছে। গোটা পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে মনে হয় এ শুধুই বরফ আর তুষারের দেওয়াল নয়, বোধগম্যতার অতীত কোনও সৃষ্টি, একে পরম স্নেহে জড়িয়ে আছে সেই সব অতৃপ্ত আত্মারা যারা শুধু একবার ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছে তার হৃদয়কে, তারপর হারিয়ে গেছে।

রৌদ্রোজ্জ্বল পরিষ্কার আকাশের সীমানায় নাঙ্গা পর্বতের শরীর থেকে এক ঠান্ডা ঘন জমাট মেঘ এসে যেন সেঁধিয়ে যাচ্ছে হাড়ের মধ্যে, সমস্ত শরীরে ভয় আর মৃত্যুর এক হিমশীতল অনুভূতি ছড়িয়ে দিচ্ছে। এখন নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ—শীত এসে গেছে। স্থানীয় মালবাহকেরা মূল শিবিরে মালপত্র নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে। এখন এই শীতের নির্জন প্রান্তরে তিনজন সাহেব আর চারজন শেরপা নিয়ে আমরা মোট সাতজন।

আসল অভিযান শুরু হতে চলেছে। শেযবারের মত পাহাড়টাকে একবার মেপে নেবার চেষ্টা করলাম। অসম্ভব! এমন এক দৈত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে এত ছোট দল নিয়ে এগিয়ে যাওয়া বোধহয় উচিত হচ্ছে না। তবু আমরা এগিয়ে গেলাম। এক একজনকে অসম্ভব ভারি বোঝা টানতে হচ্ছে। প্রত্যেক রুকস্যাক বা কাঁধের ঝোলায় আশি থেকে নব্বই পাউন্ড মাল, সাহেবরাও আমাদের সঙ্গে সমান তালে মাল বইছে। বুদ্ধি করে আমাদের মতই একটা

কাপড়ের ফেত্তি দিয়ে মালটাকে কপালের সঙ্গে আটকে নিচ্ছে ফলে কাঁধের উপর চাপটা কমছে। বড় মাপের কোনও অভিযানের অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা না থাকলেও ছেলেগুলো বয়সে তরুণ, শক্ত সমর্থ আর অফুরন্ত উৎসাহের অধিকারী। এই অভিযানের সমাপ্তিটা ছিল বড়ই করুণ তবু আমার বিচারে আত্মত্যাগ, দলগত সংহতি, বন্ধুত্ব আর সাহসের এ এক স্মরণীয় ইতিহাস। প্রথম থেকেই আমাদের মধ্যে কোনও শ্রেণীগত প্রভেদ ছিল না, যেন একই নৌকার যাত্রী, কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে লড়াই করছি। আমরা শেরপারা যেমন কখনওই ভাববার অবকাশ পাইনি যে শুধুমাত্র অর্থ উপার্জন করার জন্যে আমরা এসেছি, তেমনি সাহেবরাও আমদের বন্ধু ছাড়া অন্য কিছুই ভাবত না। শীর্ষারোহণ প্রচেষ্টার পাশাপাশি দলটি অনেক বৈজ্ঞানিক কাজকর্মে মন দিয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে তাপমাত্রা নথিভুক্ত করা, তুষার এবং বরফের বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা এবং প্রতিনিয়ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ম্যাপ পর্যবেক্ষণ করা—এসবই ছিল অনুসন্ধানের বিষয়। দলটি যে শীর্ষারোহণের উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলেছে এমন কথা কিন্তু কোনও সময়েই বলত না তারা। সব সময়েই বলত চল না আর একটু এগিয়ে দেখি। এই ভাবে নরম তুষারের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে মূল শিবির ছেড়ে বেশ কিছুটা উঠে এলাম। হাওয়ার দাপট, তুষার ঝড় আর ঠান্ডার কামড়ের মধ্যে আমরা একনম্বর শিবির স্থাপন করলাম। বুঝতে পারছি এরপর আবহাওয়া ক্রমশ খারাপ হবে, আমাদের নেমে আসা উচিত। কিন্তু সাহেবদের গোঁ ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে, তারা আরও উঠতে চায়, বিশেষ করে থর্ণলে। অসম্ভব পরিশ্রম করছে, উৎসাহের বিন্দুমাত্র অভাব নেই, অমানুষিক তার দৈহিক শক্তি। জীবনে আমি এমন শক্তিশালী, স্থিরচিত্ত, উৎসাহী অভিযাত্রী দেখিনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস প্রয়োজনীয় লোকবল আর রসদের জোগান পেলে থর্ণলে নাঙ্গা পর্বত জয় করতে পারত, এমন কি একদিন এভারেস্ট জয় করাও তার পক্ষে কঠিন হত না। কিন্তু এখন আমাদের প্রয়োজনীয় রসদের বড়ই অভাব। প্রয়োজনের তুলনায় যেটা অনেক বেশি রয়েছে তা হচ্ছে উৎসাহ আর পরিশ্রম করার ক্ষমতা। সাহেবদের মনোবল এতই বেশি যে থর্ণলে যদি বলে, "আর একটু ওঠা যাক, কি বল?" সঙ্গে সঙ্গে ক্রেস আর মার্শ মাথা নেড়ে বলে, "বটেই তো! বটেই তো!" কিন্তু শেরপারা ততটা ইচ্ছুক নয়। আমি সেই মানুষ যে পেছন ফেরাকে ঘৃণা করি। কিন্তু এখানে আমি শুধুমাত্র একজন অভিযাত্রী নই শেরপা সর্দার। বুঝতে পারছি সাহেবদের সঙ্গে থাকাটা আমার খুবই প্রয়োজন কিন্তু আং তেম্বা, আজিবা এবং ফু থার্কে আর এক পাও এগিয়ে যেতে রাজী নয়। তারা বারবার আমাকে ঐ তুষার ঝড় আর অসহনীয় ঠান্ডার কথা বলছে, মনে করিয়ে দিচ্ছে সেই সব অভিযাত্রীদের কথা, যারা নাঙ্গা পর্বতের খামখেয়ালী স্বভাবের কাছে পরাজিত হয়ে শহীদ হয়েছে। শেষকালে তারা আমার সবচেয়ে কোমল জায়গাতে ঘা দিল। তারা আমার কাছে জানতে চাইল, আমরা যদি এখান থেকে না ফিরি তবে আমাদের স্ত্রী ও পুত্র কন্যাদের কি হবে? এরপর আর কথা চলে না, আমি বললাম ঠিক আছে তোমরা তিনজন মূল শিবিরে নেমে যাও আমি সাহেবদের সঙ্গে আছি। কিন্তু তারা কিছুতেই শুনবে না, আমাকে রেখে তারা নেমে যাবে না। কিন্তু আমি নিরুপায়, আমাকে রাজী করাতে না পেরে তারা কেঁদে ফেলল। আমি বিমূঢ়, এ এক কঠিন সময়! একদিকে আমার

কর্তব্য আর দায়িত্ব, অন্য দিকে ভালবাসা। কেমন করে আমি সাহেবদের ছেড়ে যাই? আর কি করেই বা সাথীদের অধিকার এবং ভালবাসাকে অবজ্ঞা করি? আমি বুঝতে পারছি এরপর চেষ্টা করা মানেই বিপদকে ডেকে আনা এবং সেদিক থেকে দেখলে আমার সঙ্গীরাই ঠিক। সাহেবদের বললাম যে এবার আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত কারণ শীত এসে গেছে, ঠাণ্ডা বাড়ছে। কিন্তু সাহেবরা এখন আরোহণের জিদ্‌ ধরেছে, তারা কিছুতেই নামবে না। অবশেষে আমি আমার শেরপা সাথীদের নিয়ে নেমে আসাই স্থির করলাম।

এখন আমরা দুটো দলে ভাগ হয়ে গেলাম। সাহেবরা রয়ে গেল এক নম্বর শিবিরে, তারা আরও ওঠার চেষ্টা করবে আর আমরা মূল শিবিরে ফিরে যাচ্ছি। পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবার আগে তারা আমার হাতে একটা নোট লিখে দিয়ে বলল যে যদি কিছু ঘটে যায় তাহলে শেরপারা দায়ী থাকবে না। মূল শিবিরে যে টাকা পয়সা আছে তারা তার থেকে আমাদের পারিশ্রমিক নিয়ে নিতে বলল। আমরাও কথা দিলাম তাদের জন্যে মূল শিবিরে দু'সপ্তাহ অপেক্ষা করব। ছদিন অপেক্ষা করার পর একদিন দেখি কেউ যেন ওপর থেকে নামছে, কাছে আসতে দেখি মার্শ। তার পা দুটো তুষারক্ষতে আক্রান্ত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে তাঁবুর মধ্যে ঢুকিয়ে নিলাম, এরপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার পায়ের ম্যাসেজ করলাম রক্ত চলাচলের জন্যে। কদিন পর মার্শ একটু সুস্থ হল।

এরপর শুরু হল থর্ণলে আর ক্রেসের পথ চেয়ে আমাদের প্রতীক্ষা। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে তারা জার্মানদের অনুসৃত পথের পূর্বদিকের গিরিশিরা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। একদিন দূরবীন চোখে লাগিয়ে দেখি তারা আঠার হাজার ফুট উঁচুতে এক জায়গায় তাঁবু লাগিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করছে। সন্ধ্যা নামলে হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডায় আমরা তাঁবুতে আশ্রয় নিলাম। মনে পড়ে সেদিন রাত্রে আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলাম। দেখলাম থর্ণলে আর ক্রেস নেমে আসছে নতুন সাজে সেজে, তাদের পেছনে আরও অনেকে আসছে, যাদের মুখ চেনা যাচ্ছে না। সেদিন আমার আর ঘুম এল না, আমার নিজের কোনও কুসংস্কার নেই, কিন্তু আমাদের লোকেরা মনে করে এমন স্বপ্ন সবসময়েই দুঃখের বার্তা বহন করে। পরের দিন যখন আবার জায়গাটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি তখন সেখানে কিছুই দেখতে পেলাম না। একটু চিন্তায় পড়ে গেলাম। ভাবলাম হয়ত রাতের অন্ধকার থাকতে ওরা তাঁবু গুটিয়ে হাঁটা শুরু করেছে। খুব মনোযোগ দিয়ে আশেপাশে খুঁজতে লাগলাম যদি প্রাণের কোনও লক্ষণ দেখা যায়, কিন্তু সারাদিন ধরে চোখে দূরবীণ লাগিয়ে বসে থেকেও কিছু দেখতে পেলাম না। অবশেষে সন্ধ্যা নামল। বুঝলাম ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে গেছে। তাদের সম্ভাব্য বিপদের কথা চিন্তা করে সেদিন রাত্রেই অমরা ঠিক করলাম যে পরদিন সকালে মার্শ, আজিবা এবং আমি যাব অনুসন্ধান করতে। আরও ঠিক হল আং তেম্বা এবং ফু থার্কে আমাদের জন্যে দুসপ্তাহ অপেক্ষা করে, আমরা না ফিরলে ফিরে যাবে। মার্শের পায়ের অবস্থা ভাল নয়, কিন্তু সে বসে থাকার মানুষ নয়। শীত এসে গেছে, পুরনো রাস্তা বরফে ঢাকা পড়ে গেছে, পিঠে ভারি বোঝা নিয়ে নরম বরফে হাঁটু ডুবিয়ে ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছি। কখনও কখনও বুক পর্যন্ত বরফে ডুবে যাচ্ছে। পিঠের বোঝা অসহ্য হলে বরফে নামিয়ে রেখে বিশ্রাম নিচ্ছি আবার উঠছি। ক্রমশ এগিয়ে

যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল। বুঝতে পারছি এই নরম তুষারের মধ্যে নিদারুণ ঠান্ডায় এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তবু কিসের টানে যেন উঠে যাচ্ছি। অবশেষে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ল। আমরা আগের এক নম্বর শিবিরের জায়গার কাছাকাছি গিয়ে সেখানে তাঁবু লাগালাম। এর আগে অমি কখনও শীতকালে অভিযানে আসিনি। এখন একটা তাঁবু লাগানোও প্রাণান্তকর ব্যাপার, এ যে কি কষ্ট তা অনুভব করার জন্যে আমি দ্বিতীয়বার আসতে রাজী নই। যদিও আমরা খুব একটা উঁচুতে আসিনি তবু এমন ঠান্ডা আমি জীবনে অনুভব করিনি। মার্শ তার থার্মোমিটার দেখাল, তাপমাত্রা শূন্যের চল্লিশ ডিগ্রি নিচে নেমে গেছে। তাঁবুর কাপড় পাঁপড়ের মত শক্ত, টানা দেবার দড়ি যেন সরু লোহার রড, হাতের সিটেন (দস্তানা) শক্ত কাঠ। তবু হাতের দস্তানা খোলার প্রশ্ন ওঠে না। একবার খুললে হাতের আঙ্গুল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে শক্ত পাথরের মত হয়ে যাবে। কোনওমতে তাঁবু লাগিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম। একটা সসপ্যানে কিছুটা বরফ নিয়ে স্টোভের আগুনে তা গলাবার চেষ্টা করলাম। বরফ গলে জল হবার পর যেইমাত্র প্যানটা নামিয়েছি সঙ্গে সঙ্গে জল জমে বরফ হয়ে গেল আর তারই চাপে প্যানটা শব্দ করে ফেটে গেল। আর একটা পাত্র নিয়ে তাতে বরফ দিয়ে স্টোভের আগুনে বসিয়ে চামচ দিয়ে ক্রমাগত নাড়তে শুরু করলাম। বহু প্রচেষ্টায় একটু চা হল।

রাত্রে শ্লিপিং ব্যাগে ঢুকে একজন প্রায় আর একজনের ঘাড়ে শুয়ে আছি যদি শরীরটা একটু গরম রাখা যায়। রাত বাড়ার সাথে সাথে ঝড়ের সে কি গোঙানি আওয়াজ! যে কোনও সময় তাঁবু সমেত আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যাবার হুমকি দিচ্ছে। দরজার কাছে যেটুকু ফাঁকা পেয়েছে সেখান দিয়ে সমানে বরফের কুচি ঢুকে আসছে, সবচেয়ে অসহ্য হল তাঁবুর নীচে বরফ ফাটার আওয়াজ। দারুণ ঠান্ডায় হিমবাহের বরফ আরও জমে যাচ্ছে, ভারসাম্য বদল হচ্ছে, বরফ এবার ফাটলকে বাড়াচ্ছে, তারই আওয়াজে আমরা চমকে উঠছি। মনে হচ্ছে যে কোনও সময় তাঁবু সমেত ঐ ফাটলে হারিয়ে যাব। আমাদের যে কি করুণ অবস্থা তা বর্ণনাতীত। ভাবছি থর্ণলে আর ক্রেসের কথা, ওরা কি এখনও বেঁচে আছে? আর যদি সত্যি বেঁচে থাকে তবে তাদের যে কি অবস্থা হচ্ছে তা ভাবতে পারছি না, মার্শ তার হাতদুটো কপালের উপর দিয়ে শুয়ে আছে, পা দুটো গুটিয়ে রেখে— যদি জমে যাওয়া থেকে বাঁচানো যায়। থমথমে ঠান্ডা গলায় আমাকে জিজ্ঞেস করে, আজকের দিনটি কি জান? উত্তর দিলাম, বলতে পারব না। —আজ বড় দিন। বলে অদ্ভুত ভাবে সে চুপ করে যায়। আমি কথা বাড়াই না।

ভোরের আলোয় বাইরে এলাম, দেখি এখনও যদি কিছু বাকি থেকে থাকে তবে তা হল 'ঠান্ডা', নিদারুণ ঠান্ডা!! নিশ্বাস বায়ু বের হওয়ার সাথে সাথে জমে গিয়ে বরফের কাঠি আমাদের নাক থেকে চিবুক হয়ে ঝুলছে। কোনও মতে চা বানাই। জুতোর ফিঁতে বেঁধে তৈরি হই। একটাই কথা এগিয়ে যেতে হবে, তবে হেঁটে এগিয়ে যাওয়ার চেয়ে সাঁতরে যাচ্ছি বলাই ভাল। এক ঘন্টার চেষ্টায় মাত্র দেড়শো ফুট যেতে পেরেছি। মার্শের অবস্থা আরও করুণ, আহত পা দুটোকে নিয়ে সে তার শারীরিক আর মানসিক যন্ত্রণার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে তবু নির্বিকার। আজীবা আর আমার অবস্থাও ভাল নয়, ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছি। অবশেষে হার মানলাম। মাথা তুলে একবার নাঙ্গাকে দেখার চেষ্টা করলাম, কঠিন বরফের দেওয়ালে

ধাক্কা খেয়ে দৃষ্টি ফিরে এল। হঠাৎ করে আমার গলা থেকে এক মর্মভেদী চিৎকার বেরিয়ে গেল...থ..র্ণ...লে! নিষ্ঠুর, কঠিন, ঠান্ডা বরফ মুহূর্তে সে শব্দ শুষে নিল। জনমানবহীন নির্জন প্রান্তরে আমরা তিনটি দুর্বল প্রাণী বোকার মত পরস্পরের দিকে তাকালাম, তারপর মাথা নামিয়ে পেছন দিকে হাঁটতে শুরু করলাম।

সেই সন্ধ্যায় টলতে টলতে আমার মূল শিবিরে ফিরে এলাম। আং তেম্বা এবং ফু থার্কে আমাদের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। গরম পানীয় আর কিছু খাবার খেয়ে একটু সুস্থ হলাম। ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে আমি আং তেম্বাকে নিয়ে রওনা হলাম। কখনও জোরে হেঁটে কখনও দৌড়ে সেদিনই গিলগিটে পৌঁছলাম। সেখানে সৈন্যবাহিনীর কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের বিপদের কথা বলাতে, তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে একজন লেফটানেন্টের অধীনে এগার জন সৈন্যকে আমাদের সঙ্গে অনুসন্ধানের কাজে রওনা করিয়ে দিলেন। পরের দিন খুব সকালে আমরা কখনও জীপে চেপে কখনও পায়ে হেঁটে মূল শিবিরের দিকে এগিয়ে চললাম। আমাদের অনুসন্ধান শুরু হল। কিন্তু এই কদিনে এত বরফ পড়ে গেছে যে আমরা এক নম্বরের উচ্চতায়ও উঠতে পারলাম না। অবশেষে অসম্ভব মনে হওয়াতে অনুসন্ধান পরিত্যক্ত হল। দুই বন্ধুকে আরও অনেক মৃত আত্মার সাথে শান্তিতে থাকতে দিয়ে আমরা গিলগিট ফিরলাম। সৈন্যবাহিনীর কমান্ডার সহৃদয়তার সঙ্গে একটা হেলিকপ্টার আয়োজন করে দিলেন আকাশ থেকে অনুসন্ধান করার জন্যে। হেলিকপ্টারে চেপে আমরা নাঙ্গা পর্বতের বরফের ঢালে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোনও চিহ্ন পেলাম না। অনেকেই মনে করল ১৯৩৭ সালে জার্মান দলের হিমানী সম্প্রপাতে যে দশা হয়েছিল আমাদের বন্ধুদের ঐ একই অবস্থা হয়েছে। আমি, মার্শ এবং আজিবা খৃষ্টমাসের সময় এক নম্বর শিবিরের তাঁবুতে রাত্রে শুয়ে যেমন সব সময়েই আশঙ্কা করছিলাম যে কোনও সময় বরফ ফেটে তাঁবু সমেত তলিয়ে যাব, আমার মনে হয় থর্ণলে এবং ক্রেশের তেমনটিই ঘটেছে।

মার্শের পায়ের অবস্থা খুবই খারাপ, কিন্তু শরীরের সমস্ত যন্ত্রণা ছাপিয়ে তার মুখ শোকে বেদনায় থমথম করছে। কি সুন্দর ভাবেই না শুরু করেছিলাম. অভিযান নিয়ে কত স্বপ্ন ছিল আমাদের। অথচ গোড়া থেকে একটার পর একটা বাধা এসে আমাদের হতাশ করেছে। অবশেষে দু'জন প্রিয় বন্ধুকে হারিয়ে ফিরে যাচ্ছি। আমরা গিলগিট থেকে প্লেনে অমৃতসর ফিরছি, কারও মুখে কোনও কথা নেই—এবার বিদায় নেবার পালা। শান্ত স্বরে মার্শ আমাকে শুধায়, “এবার কি করবে তেনজিং?” আমি কোনওরকমে একটু হাসলাম তারপর পরিবেশ একটু হালকা করাব জন্যে আমাদের আং তেম্বার দিকে তাকালাম। বেঁটে শক্ত চেহারায় তার গড়িয়ে চলার ধরনটা ঠিক হিমালয়ের ভাল্লুকের মত। তার ঐ হাঁটা দেখে আমরা বহুবার তাকে ভাল্লুক বলে রাগাবার চেষ্টা করেছি। বললাম, “ভাবছি ওর নাকের ফুটোয় দড়ি পরিয়ে পাঞ্জাবের রাস্তায় ভাল্লুক খেলা দেখিয়ে কিছু পয়সা রোজগারের ধান্দা করব।” মার্শ কষ্ট করে একটু হাসার চেষ্টা করে হাত নাড়ল।

—বিদায় বন্ধু!

পবিত্র পর্বত

শেরপাদের মধ্যে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, মেয়েদের তিরিশ ছুঁই ছুঁই আর ছেলেদের চল্লিশ ছুঁই ছুঁই বয়সটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই বয়েসটাই তাদের পক্ষে চরম কিছু ভাল অথবা মন্দ ঘটবার সময়। আমার যখন ছত্রিশ বছর বয়স তখন নাঙ্গা পর্বত অভিযানে গেলাম আর সেই অভিযানে দু'জন প্রাণ দিল। তার পরের বছর পরপর দুটো অভিযানে গিয়েছি যার স্মৃতিও আমার পক্ষে বেদনাদায়ক হয়েছে। যদিও কোনওটাতেই আমার কোনও ক্ষতি হয়নি তবু আমার জীবনে পর পর তিনটে অভিযানের দুর্ভাগ্য সেই পুরনো প্রবাদকেই মনে করিয়ে দেয়।

বিশ্বযুদ্ধের বছরগুলো থেকে শুরু করে পরবর্তী বেশ কয়েক বছর কোনও বড় মাপের অভিযান হয়নি, ফলে আমাদের উপার্জনের রাস্তা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ১৯৫০ সাল থেকে আবার নতুন করে উদ্দীপনা দেখা দিল। তখন থেকে পরপর এমন কতকগুলো খবর শোনা গেল যে তার যে কোনও একটাতে অংশ গ্রহণ করতে না পারাটা আফশোষের ব্যাপার। অথচ একই সঙ্গে অনেকগুলো অভিযানে অংশ নেওয়াও সম্ভব নয়! ১৯৫০ সালে আমি যখন বন্দরপুঞ্ছ অভিযানে গিয়েছি ঠিক সেই বছরেই ফরাসী দল সাফল্যের সঙ্গে অন্নপূর্ণা আরোহণ করল। সেই প্রথম পৃথিবীতে এরকম একটা বড় মাপের সাফল্য লাভ হল। ফরাসী অন্নপূর্ণা অভিযানে শেরপা সর্দার ছিল বন্ধু আং থার্কে। অন্নপূর্ণা অভিযানের শেষের দিকে আবহাওয়া অত্যন্ত খারাপ হয়ে যায়। অভিযাত্রীদের নিরাপদে নামিয়ে আনার জন্যে আং থার্কের শেরপাবাহিনী যে বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালিয়েছিল তা শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিল যদি আমিও সে লড়াইয়ে অংশ নিতে পারতাম।

টিলম্যান এবং তাঁর পর্বতারোহী বন্ধু ডাঃ চার্লস হাউস্টন নেপালের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ দিক থেকে এভারেস্ট অভিযান করলেন, সালটা সেই ১৯৫০ এবং নেপাল থেকে এই প্রথম এভারেস্ট অভিযান। সাজ সরঞ্জামের অভাব এবং আর্থিক সামর্থহীনতার জন্যে তাঁরা খুব বেশি কিছু করতে না পারলেও খুম্বু হিমবাহের মুখে মূল শিবির স্থাপন করে শীর্ষের কাছাকাছি পৌঁছবার সম্ভাব্য পথের সঠিক অনুসন্ধান করেছিলেন। ঐ অভিযানে অংশ নেবার আমার খুবই ইচ্ছে ছিল।

শোনা গেল ১৯৫১ সালে এরিক শিপটন একটা বড় দল নিয়ে নেপালের মধ্যে দিয়ে অর্থাৎ এভারেস্টের দক্ষিণ দিক দিয়ে অভিযানে আসছেন। তিনি শীর্ষারোহণের জন্যে যতটা না আগ্রহী তার চেয়ে বেশি আগ্রহী যতটা সম্ভব ওপর দিকে উঠে যাওয়া। আমি যতবার এভারেস্ট অভিযানে গিয়েছি পৃথিবীতে কোনও অভিযাত্রী বা শেরপা তা করেনি। এভারেস্ট অভিযানে যাওয়া যেন আমার অধিকার। এভারেস্টের যে কোনও অভিযানে আমার থাকাটা দরকার, এটা এখন আমার মনে হতে শুরু করেছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে একই সঙ্গে দুটো অভিযানে যাওয়া সম্ভব নয়। যে সময় মিঃ শিপটন আসছেন সেই সময় অন্য একটা অভিযানে অংশ নেবার জন্যে আমি হিমালায়ন ক্লাবের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি, আর সেটা হচ্ছে

ফরাসী দলের নন্দাদেবী অভিযান।

১৯৩৬ সালে অমি নন্দাদেবী স্যাংচুয়ারীতে গিয়েছি আর এবার স্যাংচুয়ারীর অন্দরে নন্দাদেবী অভিযানে যাচ্ছি। দলের সর্দার হিসেবে অন্য শেরপাদের সঙ্গে নিয়ে মধ্য বসন্তে আমি দিল্লিতে দলটির সঙ্গে মিলিত হলাম। যদিও ১৯৪৭ সালে একটা ফ্রেঞ্চ-সুইস দলের সঙ্গে অভিযান করেছি কিন্তু কেবলমাত্র ফরাসীদের নিয়ে গঠিত দলের সঙ্গে অভিযানে যাওয়া এই প্রথম। ১৯৫০ সালে অন্নপূর্ণা আরোহণে সাফল্য লাভের পর ফরাসীদের হিমালয়ের প্রতি আকর্ষণ বেড়েছে। তাদের মনোবল, দৃঢ়তা আর উৎসাহ চোখে পড়ার মত। ১৯৩৬ সালে টিলম্যান এবং ওডেলের দলের কাছে নন্দাদেবী প্রথম বিজিত হয় আর ১৯৩৯ সালে পোলান্ডের দল প্রথম নন্দাদেবী ইস্ট আরোহণ করে। কিন্তু কোনও দলই একই সঙ্গে দুটো শৃঙ্গ আরোহণ করতে পারে নি। এবারের ফরাসী দলটির ইচ্ছে প্রথমে তারা নন্দাদেবী মূল শৃঙ্গ আরোহণ করে ক্ষুরধার যে গিরিশিরা নন্দাদেবী এবং নন্দাদেবী ইস্টকে যুক্ত করেছে সেই গিরিশিরা ধরে এগিয়ে গিয়ে নন্দদেবী ইস্ট আরোহণ করবে। হিমালয়ে পর্বতারোহণের ইতিহাসে এই ধরনের দুঃসাহসী অভিযান এর আগে হয়নি, এই অভিনব প্রচেষ্টা যেমন কঠিন তেমনি বিপজ্জনক। দলনেতা রোগার ডুপ্লে সহ আটজন সদস্য প্রত্যেকেই লিয়ঁ শহরের বাসিন্দা। আমাকে নিয়ে মোট নজন শেরপা আর সৈন্যবাহিনীর লোক নন্দু জয়াল। জয়ানের সঙ্গে আমি '৪৬-এ বন্দরপুঞ্ছে আরোহণ করেছি।

অনেক বাধা বিপত্তি কাটিয়ে আমরা ঋষি গর্জে প্রবেশ করলাম এবং ঋষি গঙ্গার কোল ঘেঁষে ফুলে ঢাকা নন্দাদেবী স্যাংচুয়ারীতে উপস্থিত হলাম। এই সেই পবিত্র দেবীস্থান যেখানে দেবী নন্দা স্বয়ং অবস্থান করছেন। এর আগেরবার যখন এখানে এসেছিলাম তখন কোনও পর্বত অভিযানের পরিকল্পনা ছিল না। আমাদের চোখের সামনে নন্দাদেবী—বিশাল আকৃতি! এতে আরোহণ করা কি সম্ভব? কেবল নন্দাদেবী হলেও কথা ছিল, একসঙ্গে নন্দাদেবী আর নন্দাদেবী ইস্ট! নন্দাদেবীর উচ্চতা পঁচিশ হাজার ছশো যাট ফুট এবং নন্দাদেবী ইস্টের উচ্চতা চব্বিশ হাজার চারশো! আন্দাজ তেইশ হাজার ফুট উঁচুতে প্রায় দুমাইল লম্বা করাতের দাঁতের মত তীক্ষ্ণ শৈলশিরা দুটো শীর্ষবিন্দুকে যুক্ত করেছে। নন্দাদেবী মূল শীর্ষ থেকে ঐ শৈলশিরা ধরে এগিয়ে আসার ব্যাপারে কোনও ভরসাই খুজে পাচ্ছি না।

তবে ফরাসীদের উৎসাহ প্রচুর। একগুঁয়ে দলনেতা ডুপ্লের ধারণা কয়েক দিনের মধ্যেই সাফল্যের সঙ্গে কাজটা করা যাবে। এর আগে আমি যতগুলো অভিযানে অংশ নিয়েছি তার যে কোনওটার তুলনায় অনেক দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি। এই অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বেশ কয়েকটা শিবির স্থাপন করে ফেললাম কিন্তু যত তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাওয়া যাবে ভাবা হয়েছিল ততটা সম্ভব হচ্ছে না। এখন আমরা মূল শিবির থেকে নন্দদেবীর বরফের ঢালে অনেক উঁচুতে তাঁবু লাগিয়েছি। নন্দাদেবী আবোহণ করে তীক্ষ্ণ শৈলশিরা দিয়ে পূর্বদিকে নেমে পূর্বশীর্ষের দিকে এগিয়ে যাওয়া হবে—এই হল পরিকল্পনা। মাত্র দুজন থাকবে মূল অভিযানে. প্রথম জন অবশ্যই ডুপ্লে নিজে আর দ্বিতীয় জন একুশ বছরের তরুণ গিলবার্ট ভিগনেস। ভিগনেস অত্যন্ত কুশলী পর্বতারোহী যদিও নন্দাদেবীতে শৈলারোহণের কোনও

সুযোগ নেই। ডুপ্লে এবং ভিগনসের পর্বতারোহণের দক্ষতা প্রশ্নাতীত, তবু এ ধরণের ঝুঁকি নেওয়াটা আমার একটু বাড়াবাড়ি মনে হয়েছে।

তিন নম্বর শিবির থেকে ডুপ্লে আর ভিগনেস সাতজন শেরপাকে সঙ্গে নিয়ে তেইশ হাজার ছশ ফুটে চার নম্বর শিবির স্থাপন করল। সেখান থেকে শেরপাদের ফেরত পাঠিয়ে তারা শীর্ষের দিকে রওনা দিল; সময়টা ছিল জুন মাসের উনত্রিশ তারিখ। সঙ্গে একটা হাল্কা তাঁবু, পর্যাপ্ত খাবার এবং আরোহণের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, শুরু হল এক ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা। আগে থেকেই ঠিক ছিল যে লুই ডুবো, আমি এবং দলেব ডাক্তার পেন এই তিনজন পূর্ব নন্দাদেবীর মূল শিবিরে গিয়ে তাদের জন্যে অপেক্ষা করব। ওরা শীর্ষে আরোহণের চেষ্টা শুরুর আগেই আমরা লংস্টাফ কল্ (ডঃ টমাস লংস্টাফ নামে একজন বিখ্যাত বৃটিশ পর্বতারোহী এই গিরিবর্ত্ম প্রথম অতিক্রম করেন) অতিক্রম করে পূর্ব নন্দাদেবী মূল শিবিরে পৌঁছলাম। এখানে এসে আমাদের প্রথম কাজ হল চোখে দূরবীন লাগিয়ে ডুপ্লে ও ভিগনেসের গতিবিধি লক্ষ্য করা। আমরা দেখলাম বহুদূরে পাহাড়ের খাড়া দেওযালে দুটো চলন্ত বিন্দু ধীরে ধীরে নন্দাদেবী মূল শীর্ষের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, এরপর তারা একটু বাঁক নিয়ে আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেল। ঐ দিনই আমরা তাদের ফিরে আসার প্রত্যাশা করিনি কারণ কথা ছিল তারা সেদিন শৈলশিরার নিবাপদ স্থানে রাত্রিবাস (Bivouac) করবে। সন্ধ্যা নামতে তাঁবুতে ফিরলাম, পরের দিন লংস্টাফ কল অতিক্রম করে আমরা পূর্বশীর্ষের বেশ কিছুটা পর্যন্ত উঠে গেলাম তাদের দেখা পাবার আশায়। সকাল থেকে দুপুর গড়িয়ে গেল তাদের কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে, আমরা আরও খানিকটা উঠে তাদের নাম ধরে ডাকাডাকি করলাম অবশেষে সন্ধ্যা নামলে বিফল মনোরথ হয়ে শিবিরে ফিরলাম। কথা ছিল ডুপ্লে এবং ভিগনেস এপথে ফিরতে না পারলে যদি উল্টোপথে ফিরে যায় তবে আমাদের সংকেত পাঠাবে। সেদিন কোনও সংকেত পেলাম না, পরের দিনও না। আমাদের মনে আশংকার কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে, নিশ্চয় কোনও বিপদ হয়েছে। এভাবে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা যাবে না, হয় ফিরে যেতে হবে নতুবা আরও ওপরে উঠে অনুসন্ধান চালাতে হবে। যেহেতু ডঃ পেন পর্বতারোহণে দক্ষ নন তাই স্থির হল আমি আর ডুবো অনুসন্ধান চালাব আর ডঃ পেন লংস্টাফ কলের শিবির পাহারা দেবে।

একটা তাঁবু এবং কিছু খাবার দাবার নিয়ে আমরা নন্দাদেবী ইস্টের কঠিন ঢাল বেয়ে উঠতে লাগলাম, বোঝা অসম্ভব ভারি হয়েছে, মাল নিয়ে উঠতে আমরা হাঁফিয়ে উঠছি। অবশেষে আগের দিনের জায়গায় পৌঁছে একটু বিশ্রাম নিলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত না সন্ধ্যা নামে আমরা উঠেই গেলাম, অবশেষে বরফের ঢালে তাঁবু লাগিয়ে পরের দিন ভোরের অপেক্ষায় রইলাম। ভোর হতে তাঁবু গুটিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হল। বেশির ভাগ সময়েই আমরা একটা তীক্ষ্ণ শৈলশিরা ধরে উঠছি। এইভাবে তিনদিন ধরে আমরা উঠছি, মনে আশা হয়ত দেখব ডুপ্লে আর ভিগনেস নেমে আসছে উল্টো দিক থেকে। আমরা যত উঠছি বরফের ঢাল তত খাড়া আর বিপজ্জনক রকমের তীক্ষ্ণ হচ্ছে। তারই মধ্যে শুধুই আমাদের জুতোর আওয়াজ। অবশ্য এপথে আমরাই প্রথম আসছি না— আজ থেকে বার বছর আগে একটা পোলিশ দল প্রথম

নন্দাদেবী ইস্ট আরোহণ করে। আইস পিটনে বাঁধা দড়ি চোখে পড়ছে। বহুদিনের পুরনো দড়ি তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে তাই আমরা নতুন করে দড়ি খাটিয়ে নিচ্ছি। শৈলশিরা বা রীজ কোথাও কোথাও এত তীক্ষ্ণ, যে কোনও সময়ে গড়িয়ে পড়ার ভয়। মাঝে মাঝে ভাবছি এখনও গড়িয়ে না পড়ে আমরা কি করে দু পায়ে খাড়া রয়েছি! এভারেস্ট আরোহণের পর আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করা হয় আমার জীবনে সবচেয়ে কঠিন, বিপজ্জনক শীর্ষারোহণ কোনটি ? তারা হয়ত আশা করে আমি এভারেস্টের কথাই বলব। তাদের হতাশ করে আমার উত্তর হল নন্দাদেবী ইস্ট! এর মধ্যে আমরা বুঝে গেছি যাদের আমরা খুঁজছি তাদের ফিরে পাবার আর কোনও সম্ভাবনাই নেই, জীবিত অবস্থাতে তো নয়ই। তবু আমরা উঠছি, বিপজ্জ নক ঢাল থেকে যে কোনও সময় পড়ে যাবার ভয় সত্ত্বেও আমরা উঠছি। তবে আবহাওয়া চমৎকার। ৬ই জুলাই, আজ থেকে এক সপ্তাহ আগে ডুপ্লে আর ভিগনেসকে শেষ দেখা গেছে। এবার আমরা তিন নম্বর শিবির থেকে শীর্ষের দিকে উঠছি, শুধুই উঠে যাওয়া এবং যদিও জানি এ ওঠায় কোনও লাভ নেই আর আমাদের খাবারও শেষ হয়ে এসেছে। শীর্ষের কাছাকাছি রীজ বা শৈলশিরা ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে, প্রায়ই ফস্কে যাচ্ছি, প্রচণ্ড পরিশ্রম হচ্ছে, কোনও রকমে ভারসাম্য বজায় রেখে চলা। শুধু শেষ অব্দি পাহাড়ের গায়ে গড়িয়ে পড়ে যাইনি এবং ভেবে অবাক হচ্ছি যে সেটা এখনও কেন ঘটছে না! অবশেষে আমাদের সামনে নীল আকাশ উন্মুক্ত হয়ে গেল, সামনে উঠে যাবার আর কোনও ঢাল নেই। অবশেষে নন্দাদেবী ইস্টের শীর্ষে পৌঁছে গেছি, আমাদের নিয়ে এই দ্বিতীয় দল। আমার ক্ষেত্রে, এভারেস্টকে বাদ দিলে. এটাই সর্বোচ্চ শীর্ষারোহণ।

এটা একটা বিরাট জয়। পরিষ্কার আবহাওয়ায় সুবিশাল পর্বতের নিচে তিব্বতের মাল ভূমি। এমন অসাধারণ দৃশ্য খুব কমই দেখেছি। তবু মনে আনন্দ নেই আমাদের। সরু ফিতের মত লম্বা উঁচু-নিচু শৈলশিরার দিকে তাকিয়ে আছি। চোখে দূরবীণ লাগিয়ে মূল নন্দাদেবী শীর্ষ পর্যন্ত দু'মাইল লম্বা এই শৈলশিরার প্রতিটি ইঞ্চি তন্ন তন্ন করে খুঁজে কোনও প্রাণের চিহ্ন দেখতে পেলাম না। ঐ কঠিন বরফের ধারালো ফলার গায়ে কেউ কয়েক মিনিট স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না, হাঁটা তো পরের কথা। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম, বুঝলাম তারা চিরতরে হারিয়ে গেছে, এখানে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা বৃথা।

নামতে শুরু করলাম, ব্যাপারটা আরও বিপজ্জনক ! মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে অসম্ভব — এখান থেকে কোনও দিনই নামতে পারব না। যে কোনও মুহূর্তে হড়কে যাবার ভয়, আর হড়কে গেলে দেহটা শূন্যে ভাসতে ভাসতে কোথায় গিয়ে যে পড়বে কে জানে। কোনও মতে লংস্টাফ কলে ফিরলাম। আমরা যথেষ্ট পরিশ্রান্ত, তবু পরের দিনই নন্দাদেবী মূল শিবিরে ফিরলাম, বাকিরা সেখানেই রয়েছে। তারা কিন্তু আমাদের মত উদ্বিগ্ন নয়। যদিও আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ হতে একটু দেরী হয়েছে তবু তারা ভেবেছিল যে ডুপ্লে এবং ভিগনেস অপর প্রান্তে আমাদের কাছে পৌঁছে গেছে। আমাদের কাছে সবকিছু শোনার পর শিবিরে শোকের ছায়া নেমে এল। এর মধ্যে যারা সমর্থ, তারা প্রস্তুত হয়ে নন্দাদেবীর খাড়া দেওয়ালে ডুপ্লে আর ভিগনেসের পথ ধরে উঠতে শুরু করল। তাদের পক্ষে খুব বেশিদূর

ওঠা সম্ভব হল না, অবশেষে আরও কিছুদিন প্রতীক্ষা। শত দুঃখের মাঝে একটাই সান্ত্বনা যে অভিযান একেবারেই ব্যর্থ নয়, আমাদের মধ্যে অন্তত দুজন নন্দাদেবী ঈস্ট আরোহণ করতে সমর্থ হয়েছে। তবু দলের দুই সাথীকে হারানোর ব্যথা বড় বেশি কষ্ট দিল আমাদের।

কি হয়েছিল ডুপ্লে আর ভিগনেসের? এ প্রশ্ন ঘুরে ফিরে মনে আসে। মনে আছে নাঙ্গা পর্বতে হারিয়ে যাওয়া অভিযাত্রী ক্রেস আর থর্ণলের কথা। পর্বতারোহণে গিয়ে যারাই হারিয়ে যায় তাদের সকলের ক্ষেত্রে আমরা শুধু অনুমানই করতে পারি। আমার ধারণা ডুপ্লে এবং ভিগনেস নন্দাদেবীর মূল শিখর আরোহণ করেছিল, যখন তাদের শেষ দেখা গেছে তারপরে আর তেমন বাধার সম্মুখীন হবার কথা নয়। পরে তারা যখন ওই দু'মাইল লম্বা ভয়ঙ্কর শৈলশিরা ধরে এগতে থাকে তখনই বিপজ্জনক কিছু একটা ঘটে গেছে, হয়তো তারা পিছলে পড়েছে সোজা হিমবাহের বুকে। এমনি করেই দুজন হাসিখুশি আর সাহসী পর্বতারোহীর জীবনে নেমে এসেছে মৃত্যু। থর্ণলে কিম্বা ক্রেস, ডুপ্লে অথবা ভিগনেস্ এবং অন্য যারা যারা হিমালয়ের এই কঠিন আর দুর্গম চেহারাকে হাল্কা ভাবে নিয়েছে, অবহেলা করেছে, তাদেরই এমনি করে হিসেব চুকিয়ে দিতে হয়েছে।

পরপর দুটো অভিযানে চারটে মৃত্যু—যথেষ্ট হয়েছে আর নয়।

বর্ষা শেষে শরৎ এল, আমরা চলেছি দার্জিলিং-এর উত্তরে কাঞ্চনজঙ্ঘা 'অঞ্চলে। যদিও আমি আগে এ অঞ্চলে গিয়েছি তবে এবারের অভিযানও খুব বড় মাপের নয়। মাত্র একজনই সাহেব, নাম মিঃ জর্জ ফ্রে, পদমর্য্যাদায় তিনি সুইস সরকারের এ্যাসিসটেন্ট ট্রেড কমিশনার, ভারত, পাকিস্তান, এবং বর্মার দায়িত্বে আছেন। যদিও তিনি একজন দক্ষ পর্বতারোহী তবু তিনি উচ্চাকাঙ্খী ছিলেন না। শেরপা সর্দার হিসেবে রয়েছি আমি এবং সঙ্গে আরও কয়েকজন শেরপা। ব্যবস্থাদি খুব ভাল, আবহাওয়া পরিষ্কার। প্রথমে আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘার কাছে ইয়ালুং হিমবাহ অতিক্রম করলাম পরে নেপাল এবং সিকিমের মধ্যে রাতং গ্যাপ অতিক্রম করলাম। এই নিয়ে দ্বিতীয় দল রাতং গ্যাপ অভিযানে সফল হল। কাঞ্চনজঙ্ঘাকে ঘিরে আশেপাশের কতকগুলো ছোটখাট পবর্ত শীর্ষ আরোহণের পর আমরা কাং আরোহণের চেষ্টা করলাম।

কাং-এর উচ্চতা উনিশ হাজার ফুট, খুব একটা বড় মাপের অভিযান নয়, বিশেষ করে কাঞ্চনজঙ্ঘা যখন এই অঞ্চলে অধিষ্ঠান করছে। কিন্তু আমাদের আগে কেউ কাং পর্বত শীর্ষে আরোহণ করতে পারেনি। কাং শিখর দেখতে ভারি সুন্দর, আমাদের মত ছোটখাট একটা দলের পক্ষে ভাল পুরস্কার হতে পারে। একটু এগিয়ে গিয়ে মুল শিবির স্থাপন করলাম। মূল শিবিরে নিশ্চিন্ত ঘুমের মাঝে আমি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। দেখলাম এক অপরিচিতা মহিলা সকলকে খাবার দিচ্ছেন, কিন্তু আমি ক্ষুধার্ত থাকা সত্ত্বেও আমাকে দিলেন না। মনে পড়ে নাঙ্গা পর্বত অভিযানের সময়েও এমনই এক দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম, তার ফল ভাল হয়নি। পরের দিন সকালে অন্য শেরপাদের কাছে স্বপ্নের কথা বলতে অরাও কেমন মুষড়ে পড়ল। কিন্তু ফ্রে সাহেব আমাদের কথা শুনে হেসে ব্যাপারটা হাল্কা করে নিলেন।

আমরা কিন্তু ব্যাপারটা এত হাল্কা ভাবে নিতে পারলাম না। ইচ্ছে করলে তাঁর সঙ্গে যেতে অস্বীকার করতে পারতাম। কিন্তু আমার স্বভাবে এটা নেই। তবে অন্য শেরপারা আর কিছুতেই যেতে চাইল না, অবশেষে মিঃ ফ্রে, শেরপা আং দাওয়া আর আমি পরবর্তী পদক্ষেপের জন্যে তৈরি হলাম। বরফের ঢাল্ এমন কিছু বেশি না হওয়াতে আমরা পরস্পরের সঙ্গে দড়ি বেঁধে এগবার কথা ভাবিনি। বরফের ঢালে বুটের ঠোক্কর মেরে ধাপ করে দিব্যি উঠে যাচ্ছি। পায়ের তলায় শক্ত ববফ, ঢালও কমছে, এবার জুতোর নিচে ক্র্যাম্পন লাগাতে হবে। আমি ক্র্যাম্পন বাঁধলাম। জুতোর নিচে ক্র্যাম্পন বাঁধলে তার শক্ত কাঁটাগুলো বরফ কামড়ে ধরে, পিছলে পড়ে যাবার ভয় থাকেনা। কিন্তু মিঃ ফ্রে ক্র্যাম্পন বাঁধলেন না। আমি তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করলাম যে কেন তিনি ক্র্যাম্পন বাঁধ্লেন না। তাঁর সংক্ষিপ্ত উত্তর পেলাম "এটার জন্যে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।" যদিও জানতাম যে ফ্রে একজন কুশলী এবং দক্ষ পর্বতারোহী কিন্তু আজ মনে হয় সেদিন তাঁকে জুতোয় ক্র্যাম্পন বাঁধতে আরও জোর করা উচিত ছিল। আমার মনে একটু দ্বিধা ছিল একথা ভেবে যে মিঃ ফ্রে আল্পসে্ এর চেয়ে অনেক কঠিন আরোহণ করেছেন, দুরূহ বাধা অতিক্রম করেছেন, কাজেই তাঁর আত্মবিশ্বাস বেশি হওয়াই স্বাভাবিক।

যাই হোক ঢাল বেয়ে আমরা অতি স্বচ্ছন্দে উঠে যাচ্ছি। প্রথমে মিঃ ফ্রে, মাঝে আমি এবং সব শেষে দাওয়া। একের সঙ্গে অপরের পনের ফুটের মত দূরত্ব রেখে চলেছি। মনে হয় সতের হাজার ফুট পর্যন্ত উঠেছি আরও দুহাজার ফুট ওঠার বাকি আছে। ফ্রে পিছলে গেলেন। কিভাবে তা বলতে পারব না। দেখলাম আমার সামনে তিনি দিব্যি উঠছেন আর সঙ্গে সঙ্গে দেখি পিছলে নেমে আসছেন। মনে হল সরাসরি আমার ঘাড়ে পড়বেন এবং আমাকে নিয়ে গড়িয়ে যাবেন। কিন্তু না, ঠিক তা নয়--আমার খুব কাছ দিয়ে তিনি পিছলে চলে যাচ্ছেন. আমার কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা হাত বাড়িয়ে দিলাম। ততক্ষণে পতনের গতি আরও বেড়েছে , হাতে ঝটকা লাগল। একটা আঙুলে তীব্র যন্ত্রণা দিয়ে দেহটা চলে গেল। । এরপর দাওয়াও চেষ্টা. করেছিল কিন্তু ততক্ষণে গতি অনেক বেড়ে গেছে। অসহায়ের মত আমরা দেখলাম পাল্টি খেতে খেতে তিনি গড়িয়ে যাচ্ছেন যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রায় হাজার ফুট নিচে একটা সমতলে গিয়ে দেহটা আটকে যায়। আমার পর্বতারোহণ জীবনে প্রথম একজনের পতন দেখলাম। অতীতে যাদের এ ধরনের অভিজ্ঞতা আছে তাদের কাছে শুনেছি, এমন ঘটনার মুখোমুখি হবার সাথে সাথে কয়েক মুহূর্তের জন্যে সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে যায়, নড়াচড়ার ক্ষমতা একেবারে লোপ পেয়ে যায়। তারপর চেতনায় যে উপলব্ধিটা প্রথম আঘাত হানে তা হল, কে যেন বলে, 'এবার তোমার পালা।' আর আশ্চর্য! এখন আমাদেরও ঠিক একই অবস্থা হয়েছে। আমারা শক্ত হয়ে পাহাড়ের গায়ে আটকে থাকলাম, মনে হল পাহাড়ের একটা অংশ হয়ে গেছি। এত তাড়াতাড়ি দুর্ঘটনা ঘটে গেল যে আমার মনে হচ্ছে, না—এ হতেই পারে না, অসম্ভব। মনে হচ্ছে ওপর দিকে তাকালেই ফ্রেকে দেখতে পাব, আমার সামনে সামনে উঠছেন, কিন্তু তা তো সত্যি নয়। ঐ তো

দেখতে পাচ্ছি বহু নিচে সাদা বরফের মধ্যে কালো বিন্দুর মত তাঁর দেহটা পড়ে আছে। ধীরে ধীরে দাওয়ার কাছে গেলাম। । গায়ে হাত দিয়ে ধাক্কা দিলাম, সে নড়তে চায় না। মনে জোর আনতে বললাম। তারপর একটু ধাতস্থ হয়ে দুজনে নামতে শুরু করলাম। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আমরা নামছি। তখন আমাদের মনের যা অবস্থা তাতে যে কোনও সময়ে আমরাও পিছলে যেতে পারি। কিছুটা নেমে বরফের উপর কালো মত কিছু একটা পড়ে থাকতে দেখলাম। কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেখি সেটাই মিঃ ফ্রের ক্যামেরা। আরও নেমে সে জায়গায় পৌঁছলাম যেখানে তিনি পড়ে আছেন। এত উঁচু থেকে ঐ ভাবে পড়লে কারও পক্ষেই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তার দেহ তুলে নিচে আমরা শিবিরের দিকে চলেছি। কাছাকাছি আসতে অন্যরা আমাদের দেখে দৌড়ে এল সাহায্যের জন্যে। পরের দিন হিমবাহের ধারে মোরেনের পাথর স্তূপের মধ্যে তাঁকে সমাধি দিলাম। এবার আমার আঙ্গুলে যন্ত্রণা অনুভব করছি। মিঃ ফ্রেকে আটকাতে গিয়ে আমার একটা আঙুল ভেঙেছে । পর্বতারোহণ করতে গিয়ে জীবনে এই প্রথম এবং সেই শেষ আমার শরীরে আঘাত লাগল। ফিরে আসছি দার্জিলিং। চল্লিশ বছর বয়সের প্রান্তে এখন আমার জীবনে কঠিন সময়। আমার কোনও ক্ষতি হয়নি যদিও তবু, ... নাঙ্গা পর্বত , নন্দাদেবী এবং কাং... অতঃপর ? এখনও কিন্তু চল্লিশ বছর হতে দুবছর বাকি আছে আমার !!

সুইসদের সঙ্গে এভারেস্ট অভিযান

কাশ্মীর থেকে সিকিম, গাড়োয়াল থেকে নেপাল এইভাবে হিমালয়ের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছি। নাঙ্গা পর্বত, নন্দাদেবী বন্দর পুঞ্ছ অথবা কাং--অনেকগুলো অভিযানের ফসলে আমার অভিজ্ঞতার ঝোলা ভরে উঠেছে। কিন্তু ডেনম্যানের সঙ্গে দ্রুত এবং আশ্চর্য তৎপরতায় সেই যে এভারেস্ট অভিযান তারপর পাঁচবছর আমি আর এভারেস্টের দেখা পাইনি। 'টাইগার' উপাধি পাবার পরে তো চোদ্দ বছর পার হয়ে গেল। মনে হচ্ছে আবার কবে তার কাছে যাব! মাঝে মাঝে ভাবি যদি কখনও ঈশ্বর আপন খেয়ালে ওপথে যাওয়া বন্ধ করে দেন আমার তবে কি হবে? ঈশ্বর এতটা নিষ্ঠুর হতে পারেন না, আর তাই আমি আবার সুযোগ পেলাম।

এবার আমি যে এভারেস্টের কাছে ফিরে যাচ্ছি সে এক নতুন এভারেস্ট। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার সাথে এভরেস্টের উত্তর দিকের পথ বন্ধ হয়েছে, উন্মুক্ত হয়েছে দক্ষিণ দিকের পথ। একটা পর্বতে অভিযান চালাতে গিয়ে যদি পরিচিত পথ ছেড়ে উল্টো দিক থেকে আরোহণের চেষ্টা করা হয়, তবে সেটা একটা নতুন অভিযানের রূপ নেয়। তিব্বতের রংবুক হিমবাহের দিক দিয়ে বেশ কয়েকবার এভারেস্ট অভিযানে গিয়েছি, কিন্তু এবার এভারেস্ট অভিযান হবে নেপালের শোলো খুম্বু হিমবাহের দিক দিয়ে। সেখানে পৌঁছতে গেলে আমার শৈশবের গ্রামের পথ ধরেই এগিয়ে যেতে হবে। সে পথের সব কিছুই আমার কাছে দারুণ পরিচিত। কিন্তু স্বপ্নেও কি ভেবেছি যে এখান দিয়ে এভারেস্ট অভিযানে যাব? দীর্ঘ আঠার বছর বাদে আবার আমার মায়ের সঙ্গে দেখা হবে। আমার গ্রাম থামে ইয়াক চরাবার তৃনভূমিতে দাঁড়িয়ে আমি সেই পাহাড়ের দিকে চোখ মেলে দেখব যার মাথা টপকে কোনও পাখি উড়তে পারে না। দুটো অর্থেই আমি ঘরে ফিরছি।

এখন চীনের কমিউনিস্ট সরকার তিব্বতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই এখন কোনও পাশচাত্য অভিযাত্রী দলের পক্ষে সে পথে যাওয়া বন্ধ। আবার এদিকে ঠিক উল্টো ঘটনা ঘটেছে নেপালের ক্ষেত্রে। ১৯৫০ সাল থেকে নেপাল পশ্চিমের অভিযাত্রীদের জন্যে তার দরজা খুলে দিয়েছে। এইচ. ডব্লিউ. টিলম্যান এবং চার্লস হাউস্টন প্রথম বিদেশী যারা নেপালের দিক থেকে এভারেস্ট গিয়েছেন। এবং তারপরের বছর এরিক শিপটন একটা পূর্ণ মাপের অভিযান সংগঠিত করেন দক্ষিণ দিক থেকে এভারেস্ট অভিযানের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার জন্যে। কিন্তু কোনও দলই তেমন কোনও সাফল্য লাভ করেনি। টিলম্যানের সাজসরঞ্জামের যা অবস্থা ছিল তাতে আংশিক আরোহণও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। শিপটন খুম্বু হিমবাহের কাছে বিরাট তুষার ফাটলের বাধা পেয়ে ফিরে এসেছিলেন। বহু আগে ম্যালরী লোলা গিরিবর্ত্মের ওপর থেকে দক্ষিণে খুম্বু হিমবাহের চেহারা দেখে বলেছিলেন যে ঐ পথে এভারেস্ট অভিযান সম্ভব নয়। টিলম্যান স্বচক্ষে খুম্বুর বিভীষিকাময় চেহারা দেখে একই মন্তব্য করলেন।

কিন্তু এখন তিব্বতের পথ বন্ধ; কাজেই যা কিছুই চিন্তা করা যাক সবই খুম্বুর পথেই

করতে হবে। অসম্ভব বলে বসে থাকলে এভারেস্ট অভিযানের আশা ত্যাগ করতে হবে।

বৃটিশরা সর্বাধিক সংখ্যায় এভারেস্ট অভিযান সংগঠিত করায় এভারেস্ট 'ইংরেজদের পাহাড়' খ্যাতি অর্জন করেছিল। পাশ্চাত্যের অন্য দেশ বলতে আমেরিকান ডঃ হাউস্টন এবং একজন ডেনমার্কের লোক লারসন যিনি খুম্বু থেকে রংবুক পর্যন্ত এভারেস্টকে ১৯৫১ সালে অর্ধচক্রাকারে পরিভ্রমণ করেন। ব্যাস! এছাড়া আর কোনও দেশের লোক এভারেস্ট অভিযানে যায়নি; কারণ তিব্বতীরা একমাত্র ইংরেজ ছাড়া কোনও বিদেশীকে এভারেস্টে যেতে দিত না। কিন্তু নেপাল সমস্ত বিদেশীর জন্যেই তার দরজা খুলে দিল। নেপালের দিক থেকে প্রথম যে অ-ইংরেজ দলটি এভারেস্ট অভিযান সংগঠিত করল তারা সুইস।

প্রথম যেদিন সংবাদটা দার্জিলিং-এ পৌঁছল সেদিনটা আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। সুইজারল্যান্ড থেকে এক সঙ্গে দুটো চিঠি এল। প্রথমটা এল আমার কাছে, তারা জানতে চেয়েছে খুম্বু হিমবাহের দিক দিয়ে এভারেস্ট অভিযানে যেতে আমি রাজী আছি কিনা? প্রশ্নটা কেমন হল জান?—যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয়, সে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে ইচ্ছুক কিনা, অথবা ক্ষুধার্ত অবস্থায় খেতে রাজী আছে কিনা? এই রকমের দ্বিতীয় চিঠিটা এল হিমালয়ান ক্লাবের সম্পাদক মিসেস হেণ্ডারসনের কাছে। তারা মিসেস হেণ্ডারসনকে অনুরোধ করেছে যে তাদের দলের সর্দার হিসেবে পেতে তিনি যেন আমাকে রাজী করান। খুশিতে মনটা ভরে গেল। প্রথম কথা বহু বছর বাদে আমি আবার আমার প্রিয় এভারেস্টের কাছে ফিরে যাচ্ছি এবং দ্বিতীয় কথা অনেকদিন পরে প্রিয় সুইস বন্ধুদের সঙ্গে অভিযানে যাচ্ছি। চিঠি পাবার পর আমি কদিন বাড়িতে এমন সব আচরণ করলাম যে স্ত্রী আং লামু আর মেয়েরা ভাবল কোনও অপদেবতা আমার ঘাড়ে ভর করেছে। দলনেতা ডঃ উইশডুনান্ট-এর সঙ্গে কয়েক বছর আগে দার্জিলিং-এ পরিচয় হয়েছে। এচাড়া ১৯৪৭ সালে রেনি ডিটার্ট এবং আন্দ্রে রসের সঙ্গে গাড়োয়ালে গিয়েছি, বাকিদের সঙ্গে যদিও আলাপ নেই, তবে আশাকরি তারাও এদেরই মত ভাল লোক হবে। টাকা পয়সার ব্যাপারটা হিমালয়ান ক্লাব দেখাশুনা করছে আর লোকজন জোগাড় করার দায়িত্ব আমার। সুইসদের ইচ্ছে তেরজন শেরপা যাবে দার্জিলিং থেকে আর দশজন শোলো খুম্বুতে ভাড়া করা হবে। এভারেস্ট অভিযানে যাওয়ার ব্যাপারে আমার যতটা উৎসাহ অন্যদের ঠিক ততটাই নিরুৎসাহ। অবশ্য এমন হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। শিপটনের দলের সঙ্গে যেসব শেরপা এভারেস্ট অভিযানে গিয়েছিল টাকা পয়সার ব্যাপারে মোটেই ভাল ব্যবহার করা হয়নি তাদের সঙ্গে। এ ছাড়া দলের একজনের ক্যামেরা হারিয়ে যাওয়াতে চোর বদনাম শুনতে হয়েছে। প্রত্যেক অভিযানের শেষে শেরপারা বখশিষ পেয়ে থাকে কিন্তু সেবারে সেটাও তাদের দেওয়া হয়নি। তাদের বোঝালাম যে হয়ত শিপটনের দল তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেনি কিন্তু তাই বলে সুইসরা তো আর দায়ী নয়? এছাড়া তাদের আরও যুক্তি আছে, এভারেস্ট অনেক বড় মাপের অভিযান এবং বিপজ্জনকও বটে, বিশেষ করে খুম্বু হিমবাহ অতিক্রম করা অসম্ভব ব্যাপার। আং থার্কের মত বড় মাপের পর্বতারোহী যে কিনা ১৯৫১ সালে শেরপা সর্দার ছিল সে তো আমার সঙ্গে কুড়ি টাকা বাজী ধরে বসল।

সে বললে যে সুইস অভিযাত্রী দল যদি খুম্বু হিমবাহের বরফের ফাটলগুলো অতিক্রম করতে পারে তাহলেই সে আমাকে কুড়ি টাকা দেবে—এভারেস্ট অভিযান তো অনেক পরের কথা। যাই হোক কোনও মতে তেরজন দক্ষ শেরপা জোগাড় করে আমি মূল দলের সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে কাঠমাণ্ডুর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। পরিচিতরা ছাড়াও সুইস দলে আরও ছজন নতুন পর্বতারোহী এবং দুজন বিজ্ঞানী এসেছে, দলটি দেখেই বুঝতে পারলাম যে এরা শুধু ভাল পর্বতারোহী তাই নয়, মানুষ হিসেবেও ভাল। ডিটার্ট এবং রসের সঙ্গে সেই ১৯৪৭ সাল থেকে আমার পরিচয়। আর বাকিরা জেনিভার আশপাশের ফরাসী সুইস দলের বিখ্যাত পর্বতারোহী। এদের সকলকে ছাপিয়ে যিনি প্রথমেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিনি রেমন্ড ল্যাম্বার্ট। পরবর্তী জীবনে এই ল্যাম্বার্ট আমার সবচেয়ে কাছের মানুষ, প্রিয় বন্ধু এবং সহ-অভিযাত্রী ছিলেন। আমাদের সকলের সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপটি ছিল ভারি মজার।

—এই দেখ! এবারেব অভিযানে আমি সঙ্গে করে একটা ভাল্লুক এনেছি। একথা বলে ডিটার্ট তাঁকে আমাদের সঙ্গে আলাপ কবিয়ে দিলেন। আর লম্বার্টও সঙ্গে সঙ্গে একগাল হেসে আমাদের সঙ্গে করমর্দন করলেন এবং প্রথম দর্শনেই আমাদের হৃদয় জয় করলেন। প্রথমেই চোখে পড়ল তাঁর পায়ের অদ্ভুত দর্শন জুতোর দিকে। জুতো দেখে মনে হল পায়ের আঙ্গুল নেই। কৌতূহল দমন করতে না পেরে যখন এর কারণ জানতে চাইলাম তখন শুনলাম যে অনেক বছর আগে আল্‌পস-এ আরোহণ করাব সময় তিনি তুষার ঝড়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং তাতেই তাঁর পায়ে তুষার ক্ষত দেখা দেয়। পা বাঁচাতে আঙ্গুল সমেত পায়ের পাতার বেশ খানিকটা অংশ বাদ দিতে হয়েছে। অবশ্য তার জন্যে লম্বার্টের পর্বতারোহণ যে থেমে থাকেনি সে তো দেখাই যাচ্ছে।

কাঠমাণ্ডুতে আমাদের প্রচুর ব্যস্ততা। নতুন তৈরি বিমান বন্দরের খোলা মাঠে টনটন খাবার আর সাজ সরঞ্জাম নিয়ে বাঁধাছাঁদা শুরু করলাম। এগুলো নেপালী মালবাহকেরা শোলো খুম্বুর মূল শিবির পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে। মজুরী নিয়ে নেপালীদের সঙ্গে প্রথমে মন কষাকষি হল, কিন্তু অচিরেই সে সমস্যা মিটে গেল। ব্যাপারটা যে এত সহজে মিটে গেল এর জন্যে আমারও একটা ভূমিকা আছে। প্রত্যেক অভিযানে সর্দার প্রত্যেকের মজুরী থেকে একটা কমিশন পেয়ে থাকে, আমি তাদের বললাম যে আমার কোনও কমিশন লাগবে না, পুরো মজুরীটাই তোমরা পাবে আর তাতেই সব কিছুর সমাধান হয়ে গেল। বাঁধা ছাঁদা শেষ করে মার্চ মাসের ঊনত্রিশ তারিখে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট দিনেই, আমরা কাঠমাণ্ডু থেকে রওনা দিলাম। সর্দার হিসেবে আমার অন্যতম কাজ হল মালবাহকদেব বোঝা ভাগ করে দেওয়া। আমি ঠিক করলাম যে সব মালবাহক আগে যেতে চায় তারা খাবাব দাবার ও রান্নার সরঞ্জাম নিয়ে রওনা হবে, যাতে দিনের শেষে রান্নার কাজটা তাড়াতাড়ি করা যায়। এরপর রওনা হবে তাঁবু এবং ব্যক্তিগত মালপত্র আর সবশেষে যাবে পর্বতারোহণের সরঞ্জাম কারণ সেটা পর্বতারোহণ শুরু করার আগে কোনও কাজে লাগবে না।

কাঠমাণ্ডু থেকে নামচেবাজারের দূরত্ব প্রায় একশো আশি মাইল। আমাদের মোট যোল

দিন সময় লাগল সেখানে পৌঁছতে। প্রথমে পূর্বমুখে যেতে লাগলাম এবং শেষ কটা দিন উত্তর দিকে হাঁটলাম। পাহাড়ী পথে কখনও উঁচুতে আবার কখনও বা নিচে শস্যখেতের মধ্যে দিয়ে বিরামহীন হাঁটা। তিব্বতের মধ্যে দিয়ে এভারেস্টের মূল শিবির পর্যন্ত যেতে গেলে ইয়াক অথবা খচ্চরের পিঠে মাল বহন করা সম্ভব। কিন্তু নেপালের দিক থেকে রাস্তা যদিও পশুদের যাতায়াতের পক্ষে বেশ সুবিধাজনক কিন্তু প্রত্যেকটা উপত্যকায় একটা করে নদী পার হতে হয়, যেগুলোর ওপর কাঠের তক্তা পেতে সেতু বানানো আছে, এ পথে মানুষের পক্ষে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু কোনও চার পাওয়ালা প্রাণীর পক্ষে এই ঝুলন্ত এবং দোদুল্যমান সেতু পার হওয়া সম্ভব নয়। যে কোনও পাহাড়ী জাতি মালবহনের জন্যে ঘোড়া জাতীয় পশুর সাহায্য নেয় কিন্তু ব্যতিক্রম হল নেপাল। নেপালীরা কোনও পশুর সাহায্য না নিয়ে বেশির ভাগ সময় নিজেরাই পিঠে মাল বহন করে। এবং সেটার কারণ এই যে নেপালে ঘন ঘন কাঠের সরু সেতু দিয়ে নদী পারাপার করতে হয়।

দিনের পর দিন উঁচুনিচু পাহাড় ডিঙ্গিয়ে আমরা চলেছি তবু একঘেয়েমী এসে আমাদের কাহিল করতে পারেনি। প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা আমাদের অভিযান নিয়ে একে অপরের সঙ্গে আলোচনা করতাম আর এইভাবেই কখন আমরা একে অপরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠলাম। ধীরে ধীরে আমাদের সঙ্গে সুইসদের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়ে গেল। প্রাণবন্ত, কৌতুকপ্রিয় ডিটার্ট ছিলেন আরোহণ অংশের নেতা। তাঁর সদাচঞ্চল স্বভাবটির জন্যে আমরা তাঁর নাম রাখলাম খিসিগ্‌পা বা নীল মাছি। ল্যাম্বার্টকে তো প্রথমেই আমাদের সঙ্গে ভল্লুক বলে পরিচয় করে দেওয়া হয়েছিল তাই টিলম্যানের মত তাকেও আমরা 'বালু' বলে ডাকতাম। আর সেই ডাকেই তিনি বেজায় খুশি। আমরা পরস্পরের ভাষা জানিনা, যা কিছু কথাবার্তা হয় সবই আকার ইঙ্গিতে, অবশ্য পরের দিকে পরস্পরকে খুবই ভাল বুঝাতে পারতাম আমরা। আমরা যত এগিয়ে যাচ্ছি চারিদিকের পরিবেশ তত বদলে যাচ্ছে। ধানের ক্ষেতগুলি ক্রমশ পেছিয়ে পড়ছে আর তার জায়গা দখল করছে জঙ্গল। ফাঁকে ফাঁকে কোথাও আলু আবার কোথাও বা বার্লির চাষ হয়েছে। লোকজনও ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। নিম্ন নেপালের লোকজন প্রায় সকলেই হিন্দু আর এদিকে বেশির ভাগই বৌদ্ধ। এদের দেখতে নিম্ন নেপালের অধিবাসীদের মত নয়, তাদের চেহারায় মোঙ্গলীয় ছাপ সুস্পষ্ট। দিন দশেকের মাথায় আমরা শেরপাদের দেশে প্রবেশ করলাম। প্রথমে পড়ে শোলো তারপর দুধকোশী নদীর ধার ঘেঁষে খুম্বু আর নামচেবাজারের দিকে। এই দুটো অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে যতই এগিয়ে যাচ্ছি আমি ততই এক অদ্ভুত উত্তেজনা অনুভব করছি। আমি ক্রমশ আমার জন্মভূমির কাছাকাছি এসে পৌঁছলাম। যা কিছু চোখে পড়ছে সবই অমার বাল্যস্মৃতিকে মথিত করছে, আবেগে দুচোখে জল এসে যাচ্ছে, কখনও উল্লাসে চিৎকার করতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমরা পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে নামচেবাজার মিলন উৎসবের চেহারা নিয়ে নিল। শুধু আমি নয় আমার মত যে সব শেরপারা বহু দিন বিদেশে রয়েছে তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে পরিবারের লোকজন এখানে হাজির হয়েছে। আমরা নামচেবাজার পৌঁছবার অনেক আগেই শোলো খুম্বুতে আমাদের আগমনের সংবাদ প্রচার হয়ে গেছে। দুনিয়ার সব শেরপা যেন একজোট হয়েছে আমাদের অভ্যর্থনা করবার

জন্যে। আনন্দ মিলনের উৎসবে অভিযান গৌণ হয়ে গেল। আমি আসছি জেনে আমার মা পর্যন্ত গ্রাম থেকে সোজা নামচে চলে এসেছেন পায়ে হেঁটে। তাকে দেখে আমি দৌড়ে গেলাম, "আম্মা লা—মাগো! আমি এসেছি।" আমায় জড়িয়ে ধরে তিনি কেঁদে ফেললেন, আমার দুচোখের অশ্রুও বাঁধ মানে না। মায়ের সঙ্গে আমার তিন বোন এসেছে আর এসেছে ভাইপো, ভাইঝি ভাগ্নে ভাগ্নীর দল। কত কথা! সব একসঙ্গে হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসতে চায়। এ বলতে চায় তো ও থামিয়ে দিয়ে নিজে বলে—সে এক বিচিত্র দৃশ্য। আমি তাকিয়ে আছি, এদের অনেকেই আমি চলে যাবার পর জন্মেছে, কিন্তু কত আপন। সকলেই সকলের জন্যে নানা উপহার নিয়ে এসেছে, খাবার দাবার এনেছে, ছাং এনেছে৷

একটা অভিযানের উদ্দেশ্যে এসে এইভাবে বাঁধন ছাড়া আনন্দ উৎসবে গা মেলে দেওয়া উচিত নয়—মোটেই উচিত নয়। কিন্তু মজা হল ঠিক ঐ সময়ে আমরা নামচেবাজার পৌঁছবার পরের দিন নেপালী নববর্ষ এবং ঈস্টার সোমবার এক দিনে পড়েছে। কাজেই সাহেবদেরও উৎসব পালনের একটা উপলক্ষ্য এসে গেছে। ফলে সকলে একসঙ্গে নেচে গেয়ে এবং ছাং খেয়ে মাতোয়ালা হওয়া গেল।

আবেগ প্রশমিত হলে, নামচেবাজারের আশপাশটা ঘুরে দেখলাম। বহু বছর পর জন্মভূমিতে ফিরেছি কিন্তু বিশেষ কোনও পবিবর্তন চোখে পড়ল না। সবই প্রায় আগের মত আছে। একেবারেই যে পরিবর্তন কিছু হয়নি তা নয়। উল্লেখযোগ্য ভাবে যেটা চোখে পড়ল তা হল এখানে একটা পাঠশালা হয়েছে। যদিও সেটা খুবই ছোট তবুও শিশুরা পড়তে আসছে। পড়ানোর কাজটাও এমন কিছু সহজ নয়। শিক্ষক একজনই, তাও তিনি জাতিতে নেপালী। শেরপাদের নিজেদের কোনও বর্ণমালা নেই তাই নেপালী ভাষাতেই পড়তে হয়, তবু আমি খুশি। এতে আমাদের ভালই হবে। মিলন উৎসব সাঙ্গ হল এবার যাত্রা করতে হবে। নেপালী মালবাহকেরা তাদের টাকা পয়সা বুঝে নিয়ে চলে গেল। পরিকল্পনা অনুযায়ী শোলো খুম্বু থেকে আরও দশজন বাছাই শেরপা নেওয়া হল। তবে মুল শিবির অব্দি অনেকেই চলল বোঝা পিঠে করে। আর মজা হল এরা সকলেই আমাদের কারও না কারও আপনজন। এই দলে আমার ছোট বোন সোনা ডোমা আর প্রয়াত বড় ভাইয়ের মেয়ে অর্থাৎ আমার ভাইঝি ফু লেমুও এসেছে। থায়াং বোচের মঠে লামারা আমাদের জন্যে এক সংবর্ধনার আয়োজন করেছিল। সেই সংবর্ধনা সভায় আপ্যায়নের জন্যে প্রচুর পরিমাণে তিব্বতী চা পানের আয়োজন ছিল। এই সেই বিখ্যাত তিববতী চা যাতে প্রচুর পরিমাণে ইয়াকের দুধ থেকে তৈরি মাখন মেশানো হয়। এই চা সাহেবদেব কতটা ভাল লেগেছিল বলা মুশকিল কারণ আমি কখনও কোনও সাহেবকে তৃপ্তিব সঙ্গে ঐ চা পান করতে দেখিনি। কিন্তু অদ্ভুত ব্যতিক্রম দেখলাম ল্যাম্বার্টের মধ্যে। লোকটার নিশ্চয় একটা তিব্বতী পাকস্থলী আছে। সে যে শুধু নিজের অংশেব চাটুকু পান করল তাই নয়, অন্য সাহেবদের পাত্রগুলিও নিঃশেষ করে দিল। আমরা ভাবলাম পরের দিন তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমাদের সব আশঙ্কার অবসান ঘটিয়ে পরের দিন সে দিব্যি সুস্থ ছিল।

বারো হাজার ফুট উচ্চতার থায়াংবোচের মঠ থেকে আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করলাম। টিলম্যান আর হাউস্টন এবং ১৯৫১ সালে শিপটন যে পথ অনুসরণ করেছিলেন আমরা সেই পথে অগ্রসর হলাম অর্থাৎ আমাদের রাস্তা ছিল তাওচে এবং আমাডাবলাম শৃঙ্গদ্বয়কে দুপাশে রেখে দুধকোশী ছেড়ে পূর্ব দিকে এগিয়ে যাওয়া। অবশেষে খুম্বু হিমবাহের উৎসমুখে এসে পৌঁছলাম। এ পথে এভারেস্ট অল্প একটুখানি দেখা যায়, কারণ এভারেস্টের দক্ষিণ প্রতিবেশী লোৎসে এবং পশ্চিম দিকে নুপৎসের দেওয়াল তাকে চোখের আড়াল করে রেখেছে। আমার ছোটবেলায় আমি যখন ইয়াক চরাতাম তখন খুম্বু হিমবাহের নিচে পর্যন্ত চলে আসতাম। রংবুক হিমবাহের দিক থেকে আমি এভারেস্টের অনেক উঁচু পর্যন্ত উঠেছি কিন্তু এপথে এরপর থেকে সবই নতুন।

একদিন দুজন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কাজে আশপাশে ঘোরাফেরা করছিলেন। সারাদিন পরে তাঁরা ফিরে এসে জানালেন, তাঁরা রহস্যজনক সব পায়ের ছাপ দেখেছেন। এ কথা শুনে শিবিরে উত্তেজনা দেখা দিল। পরের দিন কয়েকজন মিলে প্রায় ষোলহাজার ফুট পর্যন্ত উঠে গিয়ে পায়ের যে ছাপ দেখলাম তাতে নিশ্চিত হলাম যে এগুলো ইয়েতির পায়ের ছাপ। ১৯৪৬ সালে জেমু হিমবাহের কাছে কাঞ্চনজঙ্ঘার পাদদেশে আমরা ঠিক এ রকম ছাপই দেখেছিলাম। এই ছাপগুলো তখনও পর্যন্ত এতই স্পষ্ট ছিল যে সবাই স্বীকার করল এগুলো কোনও চেনা জন্তুর পায়ের ছাপ নয়। বৈজ্ঞানিকরা খুব সতর্কতার সঙ্গে মাপ নিয়ে দেখলেন যে এগুলি লম্বায় সাড়ে এগার ইঞ্চি এবং চওড়ায় পৌনে পাঁচ ইঞ্চি, দুটো পায়ের ছাপের মধ্যেকার মাপ কুড়ি ইঞ্চি। মজা হচ্ছে ছাপগুলো হঠাৎ যেমন শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎই মিলিয়ে গেছে, অনেক অনুসন্ধান করেও ইয়েতির কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। এর বেশি আর কিছু জানাও গেল না।

এপ্রিল মাসের বাইশ তারিখে আমরা খুম্বু হিমবাহের ষোল হাজার পাঁচশো সত্তর ফুট উঁচুতে আমাদের মূল শিবির স্থাপন করলাম। এখান থেকে বেশির ভাগ স্থানীয় শেরপাই ফিরে গেল তবে উচ্চ পর্বতে কাজ করার জন্যে বেছে নেওয়া বিশ জনকে বাদ দিয়েও টুকটাক কাজের জন্যে সুইসরা তিরিশ জন শেরপাকে রেখে দিল। উত্তর দিকে সোজা গিয়ে খুম্বু হিমবাহ একটা খাড়া বরফের দেওয়ালের সামনে হুমড়ি খেয়ে আটকে গেছে। আর এই দেওয়ালের মাথাতেই লোলা গিরিবর্ত্ম (Pass)। এই গিরিবর্ত্ম তিববত এবং নেপালের মধ্যে একটা বিভাজন রেখা। ১৯৩৮ সালে আমি রংবুকের দিক থেকে লোলা গিরিবর্ত্মে উঠে নেপালের এ দিকটা দেখেছিলাম। আমাদের ডান দিকে অর্থাৎ পশ্চিম ঘেঁসে এভারেস্ট এবং নুপৎসের মধ্যে যে সরু ফাঁকটা রয়েছে সেখানে একটা বরফের দেওয়াল, আর মনে হচ্ছে তাল তাল বরফ হুমড়ি খেয়ে খুম্বু হিমবাহে আছড়ে পড়বে—এটাই ওয়েস্টার্ণ কুম (Western CWM)। এই পর্যন্ত এসেই টিলম্যান এবং হাউস্টনের দল থমকে দাঁড়িয়েছে, তারপর মাথা নেড়ে ফিরে গেছে। এরিক শিপটনরা চেষ্টা করেও ব্যর্থ।

এবার আমাদের পালা। এর মধ্যে বেশ কয়েকবার প্রতিকূল আবহাওয়ার সম্মুখীন হয়েছি

যদিও সেটা আমাদের পক্ষে খুব দুশ্চিন্তার কারণ হয়নি। মূল শিবির থেকে ধীরে ধীরে ওপর দিকে উঠে ঠিক বরফের দেওয়ালের নিচে এক নম্বর শিবির স্থাপন করলাম। এবার এখান থেকে ঐ পতনোন্মুখ বরফের ভয়াবহতাকে এড়িয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা চলতে লাগল। দলটিকে দুটি দলে ভাগ করা হল। প্রথম দলে ডিটার্ট, ল্যাম্বার্ট, আঁউবার্ট এবং ডঃ শেভ্যালী এবং অন্যদলে রস, ফ্লোরি, এ্যাসপার এবং হুপস্টেটর। তাদের কাজ হল পালা করে দড়ি খাটানো, বরফ কেটে সিঁড়ি বানানো এবং তারই পাশাপাশি সহজ রাস্তা খোঁজা। ডাঃ উইস ডুনান্ট, যিনি দলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক তিনি মূল শিবির এবং এক নম্বর শিবিরের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। ডিটার্টকে দলের আরোহণ সংক্রান্ত দলনেতা করা হয়েছিল আর সর্দার হিসেবে আমার কাজ হল সূচী অনুযায়ী পিঠে মাল চাপিয়ে ওপরের শিবিরের জন্যে শেরপাদের রওনা করিয়ে দেওয়া। আর তারা মাল পৌঁছে নিরাপদে ফিরে আসছে কিনা সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

এ যেন সেই বরফের সাদা জঙ্গলে রাস্তা খোঁজা। যে কোনও সময় বরফের স্তম্ভগুলো হুড়মুড়িয়ে ভেঙ্গে পড়তে পারে। এছাড়া পায়ের নিচে তুষারে ঢাকা মরণ ফাঁদের মত তুষার ফাটল, একটু অসতর্ক হলে মুহূর্তে তলিয়ে যেতে হবে। আগের বছর যে সমস্ত শেরপারা শিপটনের সঙ্গে ছিল তারাও ঠিক মনে করতে পারছে না যে কোন্ পথে তারা এগিয়েছিল। অথবা খুঁজে পাওয়ার মত আসলে কিছু নেই-- প্রতি মুহূর্তেই জায়গাটা পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে।

রাস্তা খুঁজে পাওয়ার জন্যে সাহেবরা আপ্রাণ চেষ্টা করছে। দুরারোহ বরফের দেওয়াল বা অনতিক্রম্য গহ্বরে বাধা পেয়ে তৃতীয় কোনও পথের সন্ধান করছে। কখনও দড়ি লাগাচ্ছে আবার কখনও বা বরফ কেটে সিঁড়ি বানাচ্ছে। আর শেরপারা পিঠে ভারি বোঝা নিয়ে সমানে তাদের অনুসরণ করছে। এরপর আর একটু উঁচুতে উঠে আমরা দ্বিতীয় শিবির স্থাপন করলাম। এখন রাস্তা আরও কঠিন, তবু আমরা পিছু পা নই। চেষ্টা চলতেই থাকল। অবশেষে ওয়েস্টার্ণ কুম-এর কাছে পৌঁছে গেলাম। সাহেবেরা বলাবলি করছে, এবার হয়ত রাস্তা পাওয়া যাবে। আর ল্যাম্বার্ট একাই দশজনের পরিশ্রম করছে, সদা প্রফুল্ল আর হাস্যময়। মাঝে মাঝে মন্তব্য করছে, আঃ দারুণ কাজ হচ্ছে!

উদ্বেগ নিয়ে আমরা ক্রমশ উঠছি এবং এবার আমরা কুম-এর প্রবেশ পথের ঠিক নিচে এমন একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হলাম যেখান থেকে শিপটনের দলকে ফিরে যেতে হয়েছে। এক অতলান্ত তুষারখাতের সামনে এসে আমরা থমকে গেলাম। এভারেস্টের গা থেকে শুরু হয়ে এই খাত লম্বালম্বি নুপৎসে পর্যন্ত চলে গেছে। এই খাত এতই গভীর যে তার নিচ পর্যন্ত দেখা যায় না, লাফিয়ে পার হবারও উপায় নেই। সুইসরা তুষার খাতের প্রতিটি ইঞ্চি তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করল যদি পার হবার রাস্তা পাওয়া যায়। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে দু'নম্বর শিবিরে ফিরে এলাম। পরের দিন তাদের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল, যদি এমন করা যায় যে একজনকে কোমরে দড়ি বেঁধে খাতের মধ্যে ঝুলিয়ে দেওয়া হল এবং সরু জায়গায় পৌঁছে সে পেণ্ডুলামের মত দুলে অপর দিকের দেওয়ালে পৌঁছে গেল। হয়ত

এই পদ্ধতিতে একটা উপায় হবে একথা ভেবে তারা এ্যাসপারকে খাতের অনেক নিচে ঝুলিয়ে দিল। পরিকল্পিত পদ্ধতিতে এ্যাসপার অপর দিকের দেওয়ালে পৌঁছল কিন্তু এমন কোনও অবলম্বন জোগাড় করতে পারল না যার সাহায্যে তাতে আটকে থাকা যায়। এমন কি সেখানে বরফ এতই কঠিন যে বরফের কুঠার বা আইস এ্যাক্স পর্যন্ত তা ভেদ করতে পারল না। অন্যদিকে, ঝুলে থাকা অবস্থায় অপর দিক থেকে যতবার অ্যাসপারের শরীরটা এদিকে ফিরে আসছে ততবারই সে কঠিন দেওয়ালে ধাক্কা খাচ্ছে। অবশেষে ফিরে আসতে হল। কিন্তু সুইসরা কিছুতেই আশা ছাড়তে চায় না। অবশেষে তুষার খাতের একটা জায়গায় প্রায় ষাট ফুট নিচে একটা দাঁড়াবার মত জায়গা পাওয়া গেল এবং সেখান থেকে অন্য দেওয়ালে পৌঁছে যাওয়া কঠিন হবে না। এবং এইখানটাতে অন্য দিকের দেওয়ালটাও খুব খাড়া নয়। কাজেই আবার এ্যাসপারকেই নামিয়ে দেওয়া হল। ফাটলের এপারে সকলেই উদ্বিগ্ন মুখে অপেক্ষা করছে যতক্ষণ না অপর দিকের দেওয়ালের মাথায় তাকে দেখা যায়। কাজটা তার পক্ষে এতই কঠিন হয়েছিল যে দেওয়ালের মাথায় উঠে সে বরফের ওপর বহুক্ষণ শুয়ে থাকল, যতক্ষণ না একটু সুস্থ হয়। যাই হোক, অবশেষে উঠে দাঁড়িয়ে সে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল। একবার যখন ফাটলের অপর দিকে যাওয়া গেছে তখন আর সমস্যা নেই।

এবার এ প্রান্ত থেকে একটা দড়ি ছুঁড়ে দেওয়া হল আর এই ভাবেই দেখতে দেখতে একটা দড়ির সেতু তৈরি হয়ে গেল। কয়েক ঘন্টা আগে যেটা ছিল অসম্ভব এখন সেখানেই লোকজন আর মালপত্র পার করার একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল। এটা একটা অসামান্য সাফল্য। এখন আমরা এতই খুশি যেন এভারেস্টের মাথায় পৌঁছে গেছি। ওয়েস্টার্ণ কুম-এ ঢোকার জন্যে আমরাই প্রথম রাস্তা তৈরি করলাম। মনে পড়ে গেল আং থার্কের বাজীর কথা, সে বলেছিল আমরা যদি এমন একটা পথ তৈরি করতে পারি তবে সে আমায় কুড়ি টাকা দেবে। ভাবতে গিয়ে আমি প্রায় আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিলাম, এইবার আং থার্কে ! তুমি আমার কাছে বাজী হেরেছ তো? কিন্তু দুঃখ একটাই টাকাটা এখনও আদায় হয়নি ।

এবার তিন নম্বর শিবির স্থাপন করার জন্যে সাহেবরা দড়ির সেতু পার হয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে লাগল আর শেরপারা পিঠে বোঝা নিয়ে তাদের অনুসরণ করল। মূল শিবির থেকে মোট আড়াই টন মত মাল তিন নম্বরে পৌঁছে দিতে এক একজন শেরপাকে ঐ বিপজ্জনক পথে প্রায় পঁয়তাল্লিশ পাউন্ড করে বোঝা এক একবারে নিয়ে যেতে হয়েছে। আমার কাজ হল ওঠা-নামা নামা-ওঠা করে মাল এবং শেরপাদের নিরাপত্তার প্রতি কঠোর নজর রাখা। সময় মত মাল পৌঁছে দিয়ে তারা অভিযানে যে সহযোগিতা করেছিল তা তুলনাহীন। এ ব্যাপারে সারকি, আজীবা এবং আমার পুরনো বন্ধু দাওয়া থোন্ডপের কাছে আমি প্রভূত সাহায্য পেয়েছি। শুধু তাই নয়, আমাদের মধ্যে যারা বয়সে তরুণ এবং অভিজ্ঞতাতেও কম তারাও শেরপাজনোচিত চরিত্রগুণে সাধ্যমত পরিশ্রম করেছে। আমাদের পরিশ্রম যে কতটা কঠিন ছিল সে কথা বোঝাবার জন্যে আমি ডিটার্টের ডায়েরী থেকে কটা

লাইন তুলে দিলাম—

১লা মে, বারো জন শেরপা আজ দু'নম্বর শিবিরে যাবে। তাদের মধ্যে ছ'জন আইলা এবং পাশাং এর সঙ্গে দু'নম্বরে থেকে যাবে। আইলা এবং পাশাং আগে থেকেই সেখানে রয়েছে। এখন সেখানে মোট আটজন থাকছে। অন্যরা আজকেই আবার এক নম্বর শিবিরে ফিরে আসবে। এক নম্বরে সারকি এবং আজীবা অপেক্ষা করছে।

২রা মে, ছ'জন শেরপা দু'নম্বর শিবিরের দিকে রওনা হচ্ছে। সারকি এবং আজীবাও এদের সঙ্গে দু'নম্বরে যাবে। দু'নম্বরে গতকাল যে মাল পৌঁছেছে তা আজ তিন নম্বরে দিয়ে আসবে বাকিরা।

৩রা মে, চারজন শেরপা দু'নম্বরে যাবে। দশজন দু'নম্বর থেকে যাবে তিন নম্বরে।

আর এরকমই চলছে দিনের পর দিন।

এখন আমরা প্রায় কুড়ি হাজার ফুট উচ্চতায় রয়েছি। সাহেবদের মধ্যে কারও কারও শ্বাস কষ্ট শুরু হয়েছে। বিশেষ করে এ্যাসপার ও রস। তুষারখাত পার হবার সময় এরা দারুণ পরিশ্রম করেছে। একদিন সন্ধ্যেবেলা সাহেবরা নিজেদের মধ্যে এই শ্বাস কষ্টের ব্যাপারেই আলোচনা করছে, একজন বলল, "এতে চিন্তার কোনও কারণ নেই। এমন উচ্চতায় অভ্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত অনেকেরই শ্বাস কষ্ট হয়। দেখনা শেরপারাও ঐ একই সমস্যায় ভুগছে।"

সাহেবদের মধ্যে একজন হঠাৎ আমার দিকে দেখিয়ে বলে উঠল, "অবশ্য একজন বাদে।"

—"ওঃ, ঐ লোকটা তো? আরে, ওর তো তিনটে ফুসফুস।"

—"ও লোকটা যতই উঁচুতে উঠবে ওকে ততই তাজা মনে হবে।"

তারা হেসে উঠল। তাই শুনে আমিও হেসে ফেললাম। তবে ঘটনা হচ্ছে, আমার সম্বন্ধে তাদের ধারণার সবটা সত্যি না হলেও শেষের কথাটা অনেকটাই সত্যি। আমি দেখেছি আমি যখন পাহাড়ে চড়তে শুরু করি তখন যত ওপরে যাই আমার পা এবং ফুসফুসের জোর ততই বেড়ে যায়। আমি জানিনা কেন আমার এমন হয়। তবে একথা নিশ্চিত যে হিমালয়ের কাছে এলে আমার মধ্যে যে শক্তির স্ফুরণ হয়, তার দর্শনে আমার মধ্যে যে ভালবাসার সৃষ্টি হয়, তাই থেকেই বোধহয় আমার পক্ষে এতসব কাণ্ড করা সম্ভব হয়। আমি যখন সন্ধ্যার ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে অথবা রাতের নির্মল বাতাসের আঘ্রাণ নিতে নিতে শ্বেত শুভ্র পর্বত শিখরের দিকে তাকাই তখন আমার মধ্যে বিদ্যুৎ তরঙ্গের মত শক্তি, বিশ্বাস এবং শান্তির এক শিহরণ খেলে যায়। তাই এখন এই হিমালয়ের খোলা আকাশের নিচে আমি দারুণ স্ফূর্তি অনুভব করছি, সবকিছু সুন্দর মনে হচ্ছে।...

ল্যাম্বার্টের দিকে তাকিয়ে হাসলাম, সব ঠিকঠাক চলছে।

আশাকরি এবার আমাদের স্বপ্ন সত্যি হবে।

এখন আমরা 'কুম' এর মধ্যে প্রবেশ করেছি। এর আগে এখানে কোনও মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি, কোনও প্রাণী এখানে বাস করে না। হয়ত মাঝে মধ্যে কোনও দল ছুট পাখি এখানে এসে এই নিঃসীম শূন্যতার মাঝে দিশেহারা হয়ে ফিরে যাবার জন্যে ডানা ছটফটায়। ওয়েস্টার্ণ

কুমের এই জায়গাটা সাড়ে চার মাইল লম্বা দু মাইল চওড়া একটা বরফের ময়দান, এর বাঁদিকে এভারেস্ট ডানদিকে নুপৎসে আর সামনে লোৎসের সাদা দেওয়াল। একটা পাহাড়ের একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালে তার খুব সামানাই দেখা যায়। যেমন এখন আমরা এভারেস্টের পায়ের কাছে এসে তার ওপরের দিকটা দেখতে পাচ্ছি না। আমরা অবশ্য জানি কোন্ পথে যেতে হবে। সম্ভাব্য পথ একটাই। প্রথমে লম্বালম্বি পাড়ি দিয়ে আমরা লোৎসের পায়ের কাছে পৌঁছব সেখান থেকে বরফের খাড়া দেওয়াল বেয়ে বাঁদিকে উঠলেই একটা স্যাডেল বা ঘোড়ার পিঠের ভাজের মত একটা জায়গায় পৌঁছব, আর এই স্যাডেলটাই সাউথ কল নামে খ্যাত। সেখান থেকে কিন্তু পরের কথা না হয় পরেই হবে। এখন তো কলে পৌঁছই।

টানা তিন সপ্তাহ ধরে আমরা ওয়েস্টার্ণ কুম থেকে চেষ্টা করলাম। সুইসরা জায়গাটার নাম দিল 'ভ্যালি অব সাইলেন্স' বা নিস্তব্ধ উপত্যকা। যদিও এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কখনও কখনও ঝড়ের গোঙ্গানি শুরু হত কিম্বা তুষার ধ্বসের শব্দে চরাচর বিদীর্ণ হয়ে যেত তবু তাও ছিল ক্ষণিকের জন্যেই। এর বাইরে শব্দ বলতে যা বোঝায় তা হল আমাদের নিজেদেরই কণ্ঠস্বর অথবা বুটের খচ্ খচ্ কিম্বা মালের বোঝা খোলার ফট্‌াফট্ শব্দ। কুমের মাঝখানে চতুর্থ শিবির। সেখান থেকে লোৎসের পায়ের নিচে পাঁচ নম্বর শিবির স্থাপন করতে আমাদের আরও কয়েক দিন লেগে গেল। আবার মাঝে মাঝে প্রচন্ড তুষার ঝড়ের সম্মুখীন হয়ে তাঁবুর মধ্যে বন্দী থাকতে হচ্ছে। তবু আমরা আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের কাজকর্ম বজায় রাখছি, এ রকম বড় অভিযানে যা অত্যন্ত জরুরী। বসন্তকালের অভিযানে সব সময় বর্ষার আবির্ভাবের আশঙ্কা থাকে, সেই কারণে প্রত্যেক দিনের কর্মসূচী ঠিকঠাক অনুসরণ করতে হবে। কারণ বর্ষা আসবার আগে শুধু আরোহণ নয়, নেমে আসার কথাটাও মাথায় রাখতে হয়।

বাইশ হাজার ছ'শ চল্লিশ ফুট উচ্চতায় পাঁচনম্বর শিবির স্থাপিত হল, এখান থেকে সাউথ কল আরও তিন হাজার ফুট। কুমের শেষ প্রান্ত থেকে বরফে ঢাকা গিরিসঙ্কট (Couloir) বেয়ে উঠে আসার পর শুরু হয়েছে পাথরের দেওয়াল, সেটা অতিক্রম করতে পারলে সাউথ কল। সুইসরা এ পথের নাম দিল এপিরণ দস্ জেনিভয়েস' বা 'জেনিভা স্পার'। ঠিক হল আমরা এ পথে সাউথ কলে ওঠার চেষ্টা করব। একেই তো বরফের মধ্যে পথ বানানো, তাতে আবার তুষার ধসের আশঙ্কা, আর এরই ফাঁকে রাস্তা তৈরির প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। সারাদিন ধরে বরফে ধাপ কেটে সিঁড়ি বানানো আর দড়ি খাটানো, এই হল সমগ্র দলটার কাজ। কখনও সুইসরা আবার কখনও শেরপারা এইভাবে একদল ক্লান্ত হলে আর একদল এসে পরবর্তী দলের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিচ্ছে। আর এরই মধ্যে কখন জানি না, আমি আর ল্যাম্বার্ট জুটি হয়ে গেছি। আমাদের কেউ যে এভাবে কাজ করতে বলেছে তা নয়, আসলে নিয়ম মাফিক কাজের মধ্যেই এটা ঘটে গেছে। আর আমাদের বোঝাপড়াও হয়েছিল ভারি সুন্দর। এরই ফাঁকে বেশ কয়েকজন অভিযাত্রী 'জেনিভা স্পারে'র পরের অংশের রাস্তা বানানোর কাজ শেষ করেছে। আমরা সাউথ কলের মাঝামাঝি দূরত্বে আমাদের মালপত্র এনে ফেললাম। এবার দলটি সাউথ কলে উঠে আসার জন্যে প্রস্তুত। প্রথমে যারা উঠবে বলে ঠিক

হল তারা হল ল্যাম্বার্ট, আউবার্ট, ফ্লোরি এবং আমি। আমাদের সঙ্গে মাল নিয়ে যাবে শেরপা পাশাং ফুটার, ফু থার্কে, দা নামগিয়াল, আজীবা, মিংগমা দোরজী এবং আং নরবু। আমার এখন দুটো দায়িত্ব, প্রথমে আমি শেরপা সর্দার। মালপত্র ঠিকঠাক আসছে কিনা সেটা যেমন দেখতে হচ্ছে পাশাপাশি শেরপাদের নিরাপত্তার ওপরও সতর্কদৃষ্টি রাখতে হচ্ছে। এবং এখন আমি একজন পর্বতারোহী সদস্য। জীবনে প্রথম আমি এতখানি সম্মান পেলাম। আমাকে প্রমাণ করতেই হবে যে আমি এ সম্মান পাবার সত্যিকারের যোগ্য।

২৪শে মে আমরা সাউথ কলের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। কিছুটা গিয়ে মন্দ আবহাওয়ার জন্যে ফিরে আসতে বাধ্য হলাম। পরের দিন আমরা অল্প বোঝা নিয়ে দ্রুত উঠতে শুরু করলাম, ইতোমধ্যে কেটে রাখা ধাপগুলো পেরিয়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঘন্টাখানেক পর আজীবা অসুস্থ হয়ে পড়াতে আমরা তাকে নিচে ফেরত পাঠালাম। তার পিঠের বোঝা আমরা বাকিরা ভাগ করে নিলাম। যেহেতু আমরা খুব বেশি দূরে যাইনি, তাই একা একা ফিরতে তার খুব একটা অসুবিধে হয়নি। আগের দিন যে উচ্চতা পর্যন্ত মাল ফেরি দেওয়া ছিল আমরা দিনের মাঝামাঝি সময়ে সেখানে এসে পৌঁছলাম। জমা করা মালের বোঝা আমরা খানিকটা ভাগ করে নিলাম। এবার তাঁবু, খাবার দাবার, জ্বালানি, সর্বোপরি অক্সিজেন সিলিণ্ডারের ভারে আমাদের পিঠের বোঝা যথেষ্ট ভারি হয়ে উঠল। আমরা অক্সিজেন সিলিন্ডার বহন করলেও ব্যবহার করছিলাম না, শিখরের কাছাকাছি ব্যবহার করার মত অক্সিজেনই ছিল আমাদের সঙ্গে।

কুম ছেড়ে আমরা আট ঘন্টা নাগাড়ে উঠে এসেছি। এখন আমাদের পেছনে পঁচিশ হাজার ছশ আশি ফুটের নুপৎসে আমাদের উচ্চতার সমান্তরালে রয়েছে। 'সাউথ কল' এখান থেকে খুব দূরে নয়। কিন্তু সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে, অসহ্য ঠান্ডা। একটু এগিয়ে আং নরবু এবং মিংগমা দোরজী ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে তাদের পিঠের বোঝা বরফের ওপর নামিয়ে দিল। একে ক্লান্তি, তায় আবার ঠান্ডা এবং তুষার ক্ষতে আক্রান্ত হবার ভয়, তারা ফিরতে চাইল। আমি তাদের বোঝালাম কিন্তু সুইসরা আমাকে বাধা দিল। তাদের যুক্তি হল যে এরা এদের সাধ্যমত পরিশ্রম করেছে কিন্তু এখন যেহেতু ফিরতে চায় তাই বাধা দেওয়া উচিত নয়। কারণ, এমন একটা পরিস্থিতিতে একজন মানুষ নিজের শক্তি সম্বন্ধে নিজেই সবচেয়ে বড় বিচারক। সেই ঠিক করবে তার পক্ষে কোনটা উচিত আর এর বিপরীত কিছু করতে গেলে বিপদ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এতে দুর্ঘটনা এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। আমি তাঁদের যুক্তিকে উপযুক্ত মনে করলাম। নরবুরা নামতে শুরু করল, আমরা বাকি যারা ছিলাম তারা ওদের মালপত্র ভাগ করে নিলাম। কিন্তু সামান্যই নিতে পারলাম, বাকিটা সেখানেই পড়ে রইল। আবার আমরা উঠতে শুরু করলাম, আর এমন সময় মনে হল আমার মুখের সামনে দিয়ে বস্তার মত কোনও বস্তু উড়ে গেল। আউবার্ট তার রুকস্যাকটা খুলেছিল ফেলে যাওয়া মাল ভরে নেবার জন্যে, কিন্তু সামান্য অসাবধানতার জন্যে সেটা ভাল করে বাঁধা হয়নি। তার স্লিপিং ব্যাগটা বাতাসে উড়ে গেল, তাকিয়ে দেখা ছাড়া আমাদের কিছুই করার ছিল না।

আরও একঘন্টা আমরা চড়াই পথে উঠে এলাম। তারপরে আবার একঘন্টা। চারদিকে অন্ধকার নামছে। যদিও কল আমাদের নাগালের মধ্যে তবু বুঝতে পারছি আজ আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বাধ্য হয়ে ঐ কঠিন বরফে ধাপ কেটে তাঁবু লাগাবার চেষ্টা করলাম। বহু পরিশ্রমের পর কোনও মতে ঐ ঢালে দুটো তাঁবু লাগাবার জায়গা হল। সুইসরা কোনও মতে একটা তাঁবুতে আশ্রয় নিল। অন্যটায় পাশাং ফুটার, ফু থার্কে, দা নামগিয়াল এবং আমি। রাত গভীর হওয়ার সাথে সাথে ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হল। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে তাঁবু শুদ্ধ আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে। দেওয়ালে তাঁবুটা আটকে রাখার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছি। কোনও মতে জল তৈরি করে একটু সুপ হল আর তাই খেয়ে সবাই শুয়ে পড়ার চেষ্টা করলাম। ছোট্ট তাঁবুতে চারজন, একজন প্রায় আর একজনের ঘাড়ের উপর শুয়ে আছি, অসহ্য ঠান্ডায় শরীর কিছুতেই গরম হতে চায় না। ঝড়ের গোঙানি, ঠান্ডার দাপট, রাত কাটতে চায় না। অবশেষে সকাল হল। মেঘমুক্ত রৌদ্রোজ্জ্বল ঝকঝকে আকাশ। তাঁবু থেকে বের হয়ে সামনে তাকালাম, আমাদের চোখের সামনে সাউথ কল। আজ অবশ্যই পৌঁছে যাব।

ল্যাম্বার্ট, ফ্লোরি, আউবার্ট এবং আমি উঠতে শুরু করলাম। ফু থার্কে আর দা নামগিয়াল নামতে লাগল, তারা আগের দিনের ফেলে আসা মাল নিয়ে আসবে। পাশাং সেখানেই অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না এরা ফিরে আসে। বেলা দশটায় আমরা প্রায় সাউথ কলে পৌঁছে গেলাম। এখন আর পাথর-বরফ ভেঙ্গে উঠতে হবে না, জায়গাটা মোটামুটি সমতল। আমরা জেনিভা স্পারের মাথায় পৌঁছে গেছি, এখান থেকে পাঁচশো ফুট নিচে সাউথ কল। এখান থেকেই আমি আবার নিচে নামতে শুরু করলাম অন্য তিনজনকে সাহায্য করার জন্যে, আর সুইসরা আমার বোঝাটা তুলে কলের দিকে হাঁটতে লাগল। ভেবেছিলাম কিছুটা নেমে বাকিদের দেখা পাব কিন্তু বাস্তবে কাউকেও না দেখে নামতে নামতে আগের রাত্রের জায়গায় পৌঁছে গেলাম। ফু থার্কে এবং দা নামগিয়াল যথারীতি বোঝা নিয়ে উঠে এসেছে কিন্তু পাশাং ফুটার তখনও তাঁবুর মধ্যে। উঁকি দিয়ে দেখি সে অস্বস্তিতে ছটফট করছে। আমাকে দেখে আর্তনাদ করে উঠল, "তেনজিং আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, আমি বোধহয় বাঁচব না।" তাকে ঐ অবস্থায় দেখে কষ্ট পেলাম, বললাম, "কে বলেছে তুমি অসুস্থ? চল, উঠে পড়, সব ঠিক হয়ে যাবে।" বহু অনুনয় করেও তাকে তাঁবুর বাইরে আনতে পারছি না। অথচ এভাবে বেশিক্ষণ চলতে দেওয়া ঠিক নয়। হিমালয়ে এই রকম একটা উচ্চতার ভয়ঙ্কর ঠান্ডায় নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকা মানে ক্রমশ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া। তাকে চাঙ্গা করার জন্যে ধাক্কা দিয়ে গুঁতো মেরে তাঁবুর বাইরে আনার জন্যে বহু চেষ্টা করলাম, কিছুতেই কিছু হয়না। আবার ওদিকে যদি বাকি মালপত্র নিয়ে সাউথ কলে পৌঁছতে না পারি তাহলে সাহেবরাও ঠান্ডায় জমে মারা পড়বে। ছোট খাট চেহারার পাশাং দার্জিলিং এ থাকার সময় তার ঘোড়া নিয়ে রেসের মাঠে দৌড়োদৌড়ি করত বলে আমরা আদর করে তাকে জকি বলে ডাকতাম, সে কথা আমার মনে পড়ে গেল। দেশের কথা, বাড়ির কথা মনে পড়িয়ে দেবার জন্যে তার

মুখের কাছে ঝুঁকে বললাম, "ওঠো! ওঠো দাঁড়াও জ্যাক। তোমাকে বাঁচতে হবে, বাড়িতে স্ত্রী পুত্রের কাছে ফিরতে হবে। এভাবে ঠাণ্ডায় জমে কিছুতেই তোমাকে মরতে দেব না।"

অবশেষে সে চোখ মেলে দেখল, তারপর উঠে বসে ধীরে ধীরে তাঁবুর বাইরে এল। আস্তে এগিয়ে গিয়ে নিজের বোঝাটা তুলে নিল, তারপর পিঠে বোঝা নিয়ে শুরু হল আমাদের সংগ্রাম। ঝুঁকে পড়ছি, বোঝার ভারে পিঠ নুয়ে আসছে, আমরা ধীরে, অতি ধীরে উঠে এলাম জেনিভা স্পারের মাথায় তারপরে সাউথ কলে নেমে এলাম। ফু থার্কে এবং দা নামগিয়ল সব শক্তি নিংড়ে দিয়েছে, পাশাং-এর মতই অবস্থা ওদের, কোনওমতে একটা তাঁবু খাটিয়ে তার মধ্যে ঢুকে গেল। কিন্তু এখনও বেশ কিছু খাবার এবং সাজ-সরঞ্জামের বোঝা নিচে রয়ে গেছে। সৌভাগ্যক্রমে আমার সম্বন্ধে প্রচলিত আমার সেই তিন নম্বর ফুসফুসটা তখনও যথেষ্ট সতেজ রয়েছে। আমি আবার নামতে শুরু করলাম। অবশেষে দু'বারের চেষ্টায় সবকিছু ঠিকঠাক পৌঁছে গেল সাউথ কলে। এখন আমাদের কাছে শিখর আরোহণের উপযুক্ত মালপত্র মজুত।

জীবনে বহু নির্জন এবং দুর্গম অঞ্চলে গিয়েছি কিন্তু সাউথকলের সঙ্গে এর কোনওটার তুলনা চলে না। এভারেস্ট আর লোৎসেকে যুক্ত করেছে পঁচিশ হাজার আটশো পঞ্চাশ ফুট উচ্চতার এই সাউথ কল। এর কোথাও এতটুকু নরম বরফের চিহ্ন নেই পরিবর্তে কঠিন পাথর এবং শক্ত বরফের আস্তরণে ঢাকা রয়েছে সদাসর্বদা, আর বিরামহীন ঝড়ের গোঙানির শব্দ সচকিত করে রেখেছে এর চারিপাশ। আমরা এখনই এমন এক উচ্চতায় পৌঁছে গেছি যে এর আগে আর কেউ এতটা উঠতে পারেনি। তবু এখান থেকে এভারেস্ট শীর্ষ বহুদূর, সামনের ঢাল শুধুই উঠে গেছে, মনে হচ্ছে যেন আর এক পর্বতশ্রেণী দিগন্তে মিশেছে। তাকিয়ে দেখি বরফের ঢাল উঠতে উঠতে এক তীক্ষ্ণ শৈলশিরায় মিশেছে, এই শৈলশিরা ধরেই এভারেস্টের শেষ সীমায় যাওয়া সহজ হবে বলে মনে হয়। তবু সমস্ত রাস্তাটা চাক্ষুস না দেখে কিছুই বোঝা যাবে না। এখান থেকে এভারেস্ট শীর্ষ দেখা যাচ্ছে না, এক বরফের ঢাল এবং দক্ষিণ শীর্ষের আড়ালে তা ঢাকা পড়ে আছে।

অবশেষে সাউথ কলে রাত্রি নামে। আমি এবং ল্যাম্বার্ট একটা তাঁবুতে, বাইরে ঝড়ের গর্জন, তাঁবুর মধ্যে কনকনে ঠান্ডা, নিজেদের গরম রাখার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছি। যদিও আজকের রাত আগের রাতটার মত তেমন দুর্বিষহ নয় তবু এও কিছু কম নয়। সকালে উঠে ভাবলাম বাকি তিনজন শেরপা বোধহয় শেষ হয়ে গেছে। না, তারা এখনও বেঁচে আছে। জকি এখনও সেই পুরনো রেকর্ড বাজিয়ে চলেছে, "আমি শেষ হয়ে গেলাম।" বাকি দুজনের অবস্থাও খুবই করুণ। সত্যিই যদি আমাদের শীর্ষে পৌঁছতে হয় তবে শৈলশিরার ওপরে আরও একটা শিবিরের প্রয়োজন হবে। ফু থার্কে এবং দা নামগিয়ালকে আর একটু উঁচুতে মাল পৌঁছে দেবার জন্যে সুইসরা অনেক অনুনয় করল। কিন্তু শত অনুরোধ এমনকি মোটা বখশিষের লোভ দেখিয়েও তাদের রাজী করানো গেল না। শুধু যে শারীরিক ভাবে তারা অক্ষম তাই নয়, তাদের মনটাও ভেঙ্গে গেছে। তারা নিজেরা একপাও যেতে রাজী নয় আর আমাকেও

অনুরোধ করতে লাগল যাতে আমি আর বেশি ঝুঁকি না নিয়ে তাদের সঙ্গে ফিরে যাই। আমার পক্ষে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। একথা তারা যখন বুঝতে পারল তখন ঠিক হল তারা ফিরে যাবে আর তিনজন সুইস এবং আমি সামনে এগিয়ে যাব। অবশেষে জকিকে মাঝখানে রেখে একটা দড়িতে তাদের বেঁধে দিলাম এবং তারা নামতে শুরু করল। সাত নম্বর শিবির স্থাপন করার জন্যে যেটুকু মাল নিয়ে যাওয়া দরকার আমরা তার কাছাকাছিও নিতে পারলাম না, যার ফল হল যে সাফল্যের আশা ক্ষীণ। তবু আমরা অসহায়, এর বেশি কিছু করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

অবশেষে আমরা রওনা দিলাম। আউবার্ট এবং ফ্লোরি একটা দড়িতে, আমি এবং ল্যাম্বার্ট অপরটাতে। ঘন্টার পর ঘন্টা খাড়া বরফের ঢাল পার হয়ে আমরা দক্ষিণ-পূর্ব শৈলশিরার কাছে পৌঁছলাম। এবার শৈলশিরা ধরে উঠে যাওয়া। আবহাওয়া পরিষ্কার। পশ্চিম দিকের সেই কুখ্যাত ঝড়ের হাত থেকে এভারেস্ট নিজেই আমাদের আড়াল করে রেখেছে। সতর্ক হয়ে রাস্তা খুঁজে ধীর পদক্ষেপে আমরা উঠছি। প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য মাল আমরা সঙ্গে আনতে পেরেছি। পুরো একদিনের খাবার, একটাই মাত্র তাঁবু আর প্রত্যেকের জন্যে একটা করে অক্সিজেন সিলিন্ডার। জীবনে এই প্রথম অক্সিজেন ব্যবহার করছি। কিন্তু বোতলের এই অক্সিজেন প্রয়োজনে আমাদের কোনও কাজে লাগছে না। যখন আমরা হাঁটছি তখন শ্বাসকষ্ট দ্বিগুণ হচ্ছে কিন্তু অক্সিজেন ব্যবহার করা যাচ্ছে না। যখন দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিচ্ছি তখন অক্সিজেন ব্যবহার করছি। ধীরে ধীরে আমরা সাতাশ হাজার ফুট অতিক্রম করলাম। এটা আমার জীবনে একটা রেকর্ড। এর আগে ১৯৩৮ সালে ছ নম্বর শিবিরে আমি আমার জীবনের সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠেছিলাম। কিন্তু এখনও তো দু'হাজার ফুট যেতে হবে। সাড়ে সাতাশ হাজার ফুট পর্যন্ত পৌঁছে আমরা ক্ষান্ত হলাম। আজ আর আমাদের পক্ষে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সাহেবরা চেয়েছিল এখানেই পিঠের মাল নামিয়ে দিয়ে সাউথ কলে ফিরে যেতে। পরের দিন অন্য শেরপাদের সাহায্যে আরও মাল নিয়ে আসা এই ছিল পরিকল্পনা। আবহাওয়া পরিষ্কার, আমি আর ল্যাম্বার্ট যথেষ্ট সমর্থ, এমন সুযোগ ছেড়ে দিতে মন চায় না। একটা সমতল জায়গা খুঁজে পেলাম, তাঁবু লাগানো যাবে। জায়গাটা দেখিয়ে ল্যাম্বার্টকে বললাম, "আজকের রাতটা এখানেই কাটিয়ে দেওয়া যাক।" আমার দিকে তাকিয়ে সে হাসল, অর্থাৎ তারও ইচ্ছে আমারই মত। পিছনের দুজন সাহেব এসে পৌঁছলে ল্যাম্বার্ট তাদের সঙ্গে পরামর্শ করল। অবশেষে ঠিক হল আমাদের এখানে রেখে তারা নেমে যাবে। পরদিন আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে আমরা এগিয়ে যাবার চেষ্টা করব।

পিঠের মাল নামিয়ে দিয়ে আউবার্ট এবং ফ্লোরি ফিরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হল। তাদের চোখে জল, হাতদুটো ধরে বলল, "সাবধানে থেক।" আমরা এখানে না থেকে তারাও তো থাকতে পারত। তারাও যথেষ্ট সুস্থ এবং সবল। কিন্তু একটাই তাঁবু, সামান্য খাবার। যাকে হোক একদলকে তো ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে। এরই নাম পর্বতারোহণ।

আমরাও চোখের জলেই তাদের বিদায় জানালাম। দাঁড়িয়ে রইলাম যতক্ষণ না তাদের

দেহগুলো বিন্দুর মত আমাদের চোখের আড়ালে চলে যায়। এবার আমরা অল্প কিছু কাজ করার চেষ্টা করলাম।

এমন একটা উচ্চতায় অল্প কাজ করলেই হাঁপিয়ে যাচ্ছি। বুকের পাঁজর হাপরের মত ওঠানামা করছে। আবার বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক। চমৎকার আবহাওয়া, অস্তমিত সূর্যের আলোকে আমরা কিছুক্ষণ তাঁবুর বাইরে বসে চারদিকের মনোমুগ্ধকর শোভা উপভোগ করলাম। আমরা বসে আছি নীরবে, কেউ কারও ভাষা বুঝি না, অবশ্য তার যে খুব একটা প্রয়োজন আছে তা নয়। বেশ কিছুক্ষণ পরে দূরের এভারেস্টের দিকে তাকিয়ে ইংরাজীতে বললাম, "তাহলে কাল তুমি এবং আমি একবার চেষ্টা করছি?" ল্যাম্বার্ট কি বুঝল জানিনা আমার দিকে তাকিয়ে শুধু মুচকি হাসল—বলল, "সা ভা বিয়েন।" অবশেষে অন্ধকার নামল, আমরা তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করলাম। আমাদের সঙ্গে স্টোভ নেই, অবশ্য তার প্রয়োজনও নেই। আমাদের ক্ষিদে পায়নি। দুটো চিজের টুকরো নিয়ে দুজনে মুখে দিলাম। সঙ্গে স্লিপিং ব্যাগ নেই, নিদারুণ ঠান্ডা, শরীর গরম রাখার জন্যে একে অন্যের হাত পা ঘষে দিচ্ছি। এই ব্যবস্থায় আমারই বেশি উপকার হল। কারণ ল্যাম্বার্টের বিশাল শরীরের অল্প অংশই আমি এক একবারে গরম করতে পারলাম। ল্যাম্বার্ট ইশারায় আমাকে জানায়, পাগুলোতে তুষার ক্ষত সম্বন্ধে সচেতন থেক, কারণ এ সম্বন্ধে তার কোনও ভয় নেই, যেহেতু তার পায়ে কোনও আঙ্গুলই নেই।

প্রতি মুহূর্তে শরীরটাকে সচল না রাখলে ঠান্ডায় জমে যাব, তাই সারা রাত শরীরের কসরত করে গেলাম। চুপ করে শুয়ে থাকলে হয়ত ঠান্ডায় জমে গিয়ে মরেই যেতাম। অবশেষে হাল্কা ধূসর আলো এসে তাঁবুর গায়ে লাগল, পৃথিবীতে ভোর হচ্ছে। তাঁবুর বাইরে মুখ বাড়ালাম, আবহাওয়া ভাল নয়। যদিও ঝড় বইছে না, তবু দক্ষিণ থেকে পশ্চিম দিকে মেঘ জমেছে—আকাশ ঘোলাটে। ধীরে ধীরে বাতাস বইতে শুরু করেছে, মুখে চোখে বরফের কুচি এসে লাগছে। ল্যাম্বার্ট শৈলশিরার দিকে ইশারা করে, আমি ঘাড় কাত করে হাসলাম। এত সহজে ছেড়ে দিচ্ছিনা, শেষ চেষ্টা করে দেখতে চাই।

অসাড় হয়ে যাওয়া আঙ্গুল দিয়ে জুতোয় ক্রাম্পন বাঁধতে প্রচুর সময় লাগল। শুরু হল উঠে যাওয়া। ঝুঁকে পড়ে ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছি আমরা। তিন পা যাই দাঁড়াই, দু পা গিয়ে থামি, এক পা গিয়েছি মনে হচ্ছে বুকটা ফেটে যাবে। তবু এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে তিন বোতল অক্সিজেন। কিন্তু অবস্থা যথাপূর্বং। অর্থাৎ এমনই যন্ত্র যে হাঁটলে কাজ করে না, থামলে চালু হয়। অবশেষে ভারমুক্ত হতে আমরা সেগুলো বরফের মাঝে নামিয়ে রাখলাম। কুড়ি পঁচিশ গজ অন্তর আমরা আমাদের জায়গা বদল করছি, কখনও আমি আগে কখনও ল্যাম্বার্ট। এইভাবে জায়গা বদল করছি কারণ একজন যখন অন্যজনকে অতিক্রম করছে তখন প্রথম জন দাঁড়িয়ে পড়ে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিচ্ছে। এক ঘন্টা কেটে গেল। তারপরে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ঘন্টাও। আরোহণ করাটা যত না কঠিন তার চেয়ে অনেক কঠিন হল ঠিক রাস্তা খুঁজে নেওয়া। পথের একদিকে খাড়া খাদ, অন্যদিকে বরফের কার্নিশ, একবার যদি ভেঙ্গে পড়ে

ভরে বরফের এক বিশাল সমুদ্রে অনন্ত যাত্রা। ক্রমশ রাস্তা আরও খাড়াই হচ্ছে, এবার আইস এ্যাক্স দিয়ে ধাপ বানাতে হচ্ছে। বরফের ধাপ বেয়ে উঠে আসাতে ল্যাম্বার্ট অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাল। যেহেতু আঙ্গুল নেই তাই অল্প কাটলেই ছোট্ট ধাপগুলোতে তার সেই অদ্ভুত দর্শন জুতোটা লাগিয়ে দিয়ে উঠে আসছে টুক টুক করে, ঠিক যেন পাহাড়ী ছাগল।

এইভাবে আরও একঘণ্টা অতিক্রান্ত হল। ঘন্টা নয় মনে হচ্ছে যেন দিন সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। আবহাওয়া আরও খারাপ হচ্ছে, ঝড়ের সঙ্গে বরফের কুচি উড়ে এসে চোখে মুখে বিঁধে যাচ্ছে। আমার মত লোকেরও নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, এত ক্লান্ত যে মাঝে মাঝে চার হাত পায়ে ওঠার চেষ্টা করছি। এক সময় ল্যাম্বার্ট পিছন ফিরে কিছু একটা বলল। ঝড়ের শব্দে শুনতে পেলাম না, সে বোধহয় বলছে, "সা ভা বিয়েন।" উত্তর দিলাম, "সা ভা বিয়েন।" সব কুছ ঠিক হ্যায়। কিন্তু একথা কি সত্যি? সত্যিই কি সব কিছু ঠিকঠাক চলছে? না, মোটেই তা নয়। তবু আমাদের দুই বন্ধুর এটাই আদত হয়ে গেছে। খুব ভাল অথবা দারুণ খারাপ অবস্থাতেও আমাদের মুখের কথা হল—সা ভা বিয়েন। সব কুছ ঠিক হ্যায়।

এই রকম উচ্চতায়, ঠান্ডায় আর অমানুষিক পরিশ্রমে মানুষ কি যে ভাবে! হঠাৎ করে আমার দার্জিলিং-এর কথা মনে পড়ে গেল, মনে পড়ে গেল স্ত্রী আং লামুর কথা, মেয়েদের কথা। আমাদের পিছনে উঠে আসছে ডিটার্টের দল। যদি আমরা না পারি তবে তারা চেষ্টা করবে। হয়ত তারা আমাদের চেয়ে ভাল ফল দেখাবে।—অসম্ভব! এটা হতে দেওয়া যায় না!—যেভাবেই হোক আমাদের পৌঁছতেই হবে। আচ্ছা, না হয় পৌঁছলাম! কিন্তু নেমে আসতে পারব তো? ম্যালরী এবং আরভিনের কথা মনে পড়ে গেল। হঠাৎই হারিয়ে গেছে তারা। হয়ত এখান থেকে, এই যে উচ্চতায় দাঁড়িয়ে আছি আমরা। না, আমার মাথা কাজ করছে না। সব কিছু কেমন হয়ে যাচ্ছে, শরীরটা যন্ত্রের মত এগিয়ে যাচ্ছে, আবার থেমে যাচ্ছে....

অবশেষে একসময় আমাদের সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল, আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। বহু কষ্টে চোখ তুলে তাকালাম, ল্যাম্বার্ট দাঁড়িয়ে গেছে, মাথা ঝাঁকাচ্ছে একটা কিছু ভাববার চেষ্টা করছে বোধহয়। আমিও কিছু একটা ভাবতে চেষ্টা করলাম। অসম্ভব! এখানে এই অবস্থায় নিশ্বাস নেওয়ার চেয়ে অনেক কঠিন কাজ হল কিছু চিন্তা করা। ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকালাম। কতটা এসেছি? এটুকু আসতে আমাদের পাঁচঘন্টা সময় লেগেছে। মাত্র ছশো পঞ্চান্ন ফুট, পরে হিসাব করে জানিয়েছিল ল্যাম্বার্ট। আরও পাঁচশো ফুট দূরে ঐ দক্ষিণ শীর্ষ। হ্যাঁ! শুধুই দক্ষিণ শীর্ষ..! এভারেস্ট? কি জানি তারপর আর কত দূরে?

আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী। আমি বিশ্বাস করি উপযুক্ত সময়ে তিনি মানুষকে পথ দেখান, নির্দেশ দেন। এই মুহূর্তে আমার এবং ল্যাম্বার্টের সব দায়িত্ব তিনি নিজের হাতে নিয়েছেন। আমরা আরও এগিয়ে যেতে পারি। হয়ত শিখরেও পৌঁছতে পারি। কিন্তু ফিরে আসা কি সম্ভব হবে? জানি না। বুঝতে পারছি এগিয়ে যাওয়া মানে মৃত্যু...। না, আর নয়। এবার থাম

তেনজিং! এখন আমরা আঠাশ হাজার দুশো পঞ্চাশ ফুট উচ্চতায় রয়েছি, এর আগে মানুষ এভারেস্টের এত কাছে আর আসতে পারেনি। তবু এটাই তো শেষ কথা নয়। আমরা সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করেছি; পারিনি। নীরবে ফিরতে শুরু করলাম। নামা, শুধু নেমে আসা... মনে হল আমরা অনন্তকাল নামছি, শুধু নামছি...।

আমার এবং ল্যাম্বার্টের দ্বারা এটুকুই সম্ভব হয়েছে। পরের দিন আউবার্ট এবং ফ্লোরিকে নিয়ে আমরা সাউথ কল থেকে নিচে ওয়েস্টার্ন কুমে নেমে এলাম। এবং দ্বিতীয় দলে চারজন সুইস ও পাঁচজন শেরপা ডিটার্টের নেতৃত্বে এগিয়ে গেল। প্রথম দিকে তারা চমৎকার ফল দেখাল, একদিনেই তারা সাউথ কলে পৌঁছে গেল। কিন্তু বাঁধ সাধল উচ্চতা, প্রায় প্রত্যেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ল। এদিকে ঝড়ের দাপট, আর ঠাণ্ডা। তারা নাস্তানাবুদ হয়ে গেল। অবশেষে তিনদিন সাউথ কলে অপেক্ষা করে তারা ফিরে আসতে বাধ্য হল। যাই হোক একটা সুন্দর প্রচেষ্টা হিসেবে এই অভিযান চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

আর এই অভিযানে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ পাওয়া ল্যাম্বার্ট, আমার মহান বন্ধু ল্যাম্বার্ট।

সুইসদের সঙ্গে এভারেস্ট অভিযান ঃ শরৎ

আমার স্ত্রী আং লামুর প্রথম কথা, "এটা কিন্তু শরৎকাল।"

—"হ্যাঁ, আমি জানি এটা শরৎকাল।"

—"তুমি কিন্তু কখনওই এই সময়ে এভারেস্ট অভিযানে যাওনি।" সে তর্ক করে।

—"হ্যাঁ, আমি তাও জানি," আমার দৃঢ় উত্তর।

—"কেন তোমরা এই শরৎকালটা বেছে নিলে?" সে সংশয় প্রকাশ করে।

—"কারণ আমাদের আর একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে।" আমি কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করি।

আসলে বহুকাল ধরে শরৎকালে এভারেস্ট অভিযানের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা চলছে। শীত কালে এভারেস্ট অভিযানের কথা স্বপ্নেও ভাবা যায় না। গ্রীষ্মকালে ভয়াবহ তুষার ঝড় আর হিমানী সম্প্রপাতের আশঙ্কা। সেই তুলনায় শরৎকালে অভিযান সংগঠিত করা হয়ত সম্ভব হবে। এভারেস্ট সম্পর্কে অভিজ্ঞ অনেক অভিযাত্রী আছেন যাঁরা মনে করেন বসন্তকালের চেয়ে শরৎকালের আবহাওয়া ভাল হলেও হতে পারে। তবে কেউ কিন্তু শরৎকালে অভিযান সংগঠিত করার উদ্যোগ নেয়নি, অবশেষে ১৯৫২ সালে সুইসরাই প্রথম এই চিন্তা করল। একপ্রকার বাধ্য হয়েই ১৯৫২ সালের শরৎকালে তারা এভারেস্ট অভিযানের পরিকল্পনা করল। কারণ বৃটিশরা ১৯৫৩-র বসন্তকালের জন্যে নেপাল সরকারের কাছে আগাম অনুমতি নিয়ে রেখেছে। সুইসরা ভেবে দেখল আর একবার এভারেস্ট শীর্ষারোহণের চেষ্টা করতে হলে এখনই করতে হবে কারণ প্রথম আরোহণের সুযোগ আর নাও পাওয়া যেতে পারে।

গতবারের দল থেকে মাত্র দুজন এই দলে আসতে সক্ষম হয়েছে। তাঁদের প্রথম জন ডাঃ গাব্রীয়েল শেভ্যালী। তিনি এবারের দল পরিচালনা করবেন এবং অন্যজন অবশ্যই রেমন্ড ল্যাম্বার্ট। আমার বিশ্বাস শত চেষ্টা করলেও সুইশরা লোকটাকে দল থেকে বাদ দিতে পারত না। সে আসতই। এমনকি দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলে দড়ি ছিঁড়ে চলে আসত। এই পুরনো দুজন ছাড়া বাকি চারজন হল আর্থার স্পোহেল, গুস্তাভ গ্রাস, আর্নেস্ট রেস, এবং জাঁ বুসিও। এছাড়াও দলে একজন ফটোগ্রাফার নর্মান ডাইরেনফোর্থকে দেখা গেল। এবারের অভিযানে তারা আমাকে শুধু শেরপা সর্দার নয় পরন্তু একজন সদস্য হিসেবেও আমন্ত্রণ জানাল। এটা আমার পক্ষে একটা বড় সম্মান, যেভাবেই হোক এর মর্যাদা রাখতে হবে। সর্দার হিসাবে আমি দলে তাদেরই প্রাধান্য দিলাম যারা গতবারে আমাদের সঙ্গে ছিল। অবশেষে সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ায় আমরা কাঠমাণ্ডুতে হাজির হলাম।

আগের বারের তুলনায় এই দলটি ছোট কিন্তু এবারের ব্যবস্থাপনা ছিল অনেক বেশি গোছানো। সাজ সরঞ্জাম বা অন্য যাবতীয় বিষয়ে তারা যথেষ্ট সতর্ক। এক কথায় সাফল্য লাভের জন্যে করণীয় সব ব্যবস্থাই করেছে তারা। পর্বতারোহী, শেরপা, নেপালী মালবাহক সব মিলিয়ে চারশোরও বেশি লোকজন নিয়ে দলটি যখন কাঠমাণ্ডু থেকে রওনা হল তখন দেখে মনে হচ্ছিল যেন বিশাল এক সৈন্যবাহিনী চলেছে যুদ্ধে। আমার জীবনে আমি কোনও

পর্বতারোহী দলকে বিনা বাধায় রওনা হতে দেখিনি, এবারেও তার ব্যতিক্রম হল না। এবারের অসুবিধার কারণ ফটোগ্রাফার ডাইরেনফোর্থ। ভদ্রলোকের সঙ্গে রয়েছে আমেরিকার পাসপোর্ট। নেপাল সরকার সুইসদলে আমেরিকার অধিবাসীকে ভিসা দিকে রাজী নয়। ফলে ভিসা জোগাড়ের জন্যে তিনি কাঠমাণ্ডুতে রয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গে আং দাওয়াকে রেখে বাধ্য হয়ে আমরা রওনা হলাম। ঠিক হল আং দাওয়া দু'সপ্তাহ অপেক্ষা করবে, এর মধ্যে যদি তিনি ভিসা জোগাড় করতে পারেন তবে তাঁকে নিয়ে আং দাওয়া মূল শিবিরে রওনা হবে।

সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু করে মাসের শেষ পর্যন্ত আমাদের পদযাত্রা অব্যহত রইল। এ বছরে বর্ষা শুরু হয়েছিল দেরিতে তাই যাই যাই করেও সে তার ডানা এখনও দিব্যি বিস্তার করে রেখেছে। মাথার ওপরে বৃষ্টি আর পায়ের নিচে কাদার মধ্যে পড়ে দলটা একেবারে নাস্তানাবুদ। আর এইরকম এক অবস্থার মধ্যে পড়ে দলের অনেকের সঙ্গে স্বয়ং ডাঃ শেভ্যালী পর্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শুধু বৃষ্টি হলেও কথা ছিল। সঙ্গে প্রচন্ড ঠাণ্ডা। দলের নেপালী মালবাহকদের সঙ্গে উপযুক্ত শীতবস্ত্র ছিল না, তারাও যথেষ্ট কাহিল। চোদ্দদিনের মাথায় শামুং নামরেপকি লা নামে তের হাজার ফুট উচ্চতার এক গিরিবর্ত্ম বা পাস অতিক্রম করলাম। অতীত দিনে এই গিরিবর্ত্ম সম্বন্ধে একটা কথা প্রচলিত ছিল। এখান দিয়ে যাবার সময় তোমার মাথা আকাশে ঠেকে যাবে। এখানে পৌঁছে আবহাওয়া আরও খারাপ হয়ে গেল। বৃষ্টি, কনকনে ঠান্ডা, সাথে ঝড়ের দাপট। সামান্য পোশাকে নেপালী মালবাহকদের অনেকেই নেতিয়ে পড়ল। দুর্ভাগ্যক্রমে এদের মধ্যে দুজন শেষ পর্যন্ত মারা গেল। অভিযান শুরুর গোড়াতেই দলটা বড় রকমের আঘাত পেল।

মৃত্যু দেখে বেশ কিছু মালবাহক পালিয়ে গেল, তখন আমরা বাধ্য হয়ে খুম্বুতে লোক পাঠালাম শেবপা মালবাহক ধরে আনবার জন্যে। অবশেষে সেপ্টেম্বর মাসের শেষে আমরা যখন নামচেবাজার পৌঁছলাম তখন বর্ষা বিদায় নিয়েছে। পরিষ্কার আবহাওয়ায় ঝকঝকে স্বচ্ছ নীল আকাশ। আব একবার আমরা শেরপারা আমাদের জন্মভূমিতে আপনজনদের সাথে মিলিত হলাম। এই পুনর্মিলনে আমরা প্রত্যেকেই খুশি। সারারাত উৎসবের সঙ্গে নাচগান আর ছাং। এখানে অমি আবার আমার মা এবং ছোটবোনের দেখা পেলাম। এখান থেকে আগের মতই নেপালীদের বদলে আঞ্চলিক শেরপা মালবাহক ভাড়া করতে হল এবং মালপত্র সহ আমরা এগিয়ে চললাম। এভারেস্ট শিখর খুব পরিষ্কার দেখাচ্ছে। এখান থেকে যে এভারেস্টকে দেখলাম সে কিন্তু বসন্তের শ্বেতশুভ্র এভারেস্ট নয়। জায়গায় জায়গায় বরফ গলে কালো পাথর বের হয়ে গেছে আর তার শীর্ষ সদাই তুষার বাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

এবারেও আমরা খুম্বু হিমবাহের কাছে আমাদের মূল শিবির স্থাপন করলাম। গত গ্রীষ্মের রাস্তা ঘাট আমূল বদলে গেছে, শুরু হল আমাদের নতুন করে রাস্তা খোঁজা, অনেক অসুবিধে সত্ত্বেও আমরা আগের বারের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাচ্ছি। বরফের ফাটল পার হবার জন্যে এবার নামচেবাজার থেকে কাঠেব তক্তা নিয়ে এসেছি। তুষার ধসের একেবারে মুখের কাছে বড় ফাটলগুলো পার হবার জন্যে কাঠের তক্তা দিয়ে সেতু বানিয়ে ফেলা হল। গত বছর যেখানে দড়ির সেতু বানিয়েছিলাম সেটা তার জায়গাতেই আছে তবে, তার ওপর বরফপাতের

ফলে বেশ কিছুটা ফাটলের মধ্যে ঝুলে গেছে। এর মধ্যে ডাইরেনফোর্থকে নিয়ে আং দাওয়া এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। এখন আমাদের দলটি সম্পূর্ণ হল। এবারের অভিযানে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে সব সময়েই কেউ না কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ছে। এরই মধ্যে আবার সংক্রমণ হয়ে আং নরবুর গলা ফুলে উঠেছে, ব্যথায় ঢোঁক গিলতে পারছে না। ডাঃ শেভ্যালী তাকে পেনিসিলিন দিয়ে চিকিৎসা করছেন কিন্তু তাতে কোনও কাজ না হওয়াতে বাধ্য হয়ে অস্ত্রপচারের সিদ্ধান্ত নিলেন। সেইমত একটা বড় তাঁবুকে আমরা হাসপাতাল বানিয়ে ফেললাম, গরম জল, ছুরি, কাঁচি, গজ সব প্রস্তুত। এবার আমি, রেসি এবং স্পোহেল তাকে বিছানার সঙ্গে চেপে ধরে থাকলাম। ডাঃ শেভ্যালী নরবুর গলায় অস্ত্রোপচার করলেন চোখের সামনে এমন একটা ব্যাপার দেখতে মোটেই ভাল লাগেনি। একটা ক্ষত থেকে এত পুঁজ, রক্ত বের হতে পারে এটা চোখের সামনে না দেখলে বিশ্বাস করা মুশকিল।

যাই হোক, কাজটা সফল হল এবং কয়েক দিনের মধ্যে সে সুস্থ হয়ে উঠল।

অবশেষে আমরা নিস্তব্ধ উপত্যকা (Silent Valley) তথা ওয়েস্টার্ণ কুম-এ পৌঁছলাম। এখন জায়গাটাকে নিস্তব্ধ বললে ভুল হবে। দিনরাত ঝড় বয়ে যাওয়ার গোঙানির শব্দ সচকিত করে রেখেছে অঞ্চলটা। আর এখানে যখন ঝড়ের চিহ্নমাত্র নেই তখন তা সরে গিয়ে কোনও পবর্তশীর্ষে তার ডানা ঝাপটাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন কোনও বন্যজন্তু খাঁচা থেকে ছাড়া পাবার অপেক্ষায় অস্থির। পরমূহূর্তে ছাড়া পেয়ে তার পূর্বের গোঙানি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আমাদের শিবিরের সমগ্র এলাকায়। যতক্ষণ পর্যন্ত না ঝড়ের দাপট কমছে ততক্ষণ এলাকা ছেড়ে এক পাও অগ্রসর হবার উপায় নেই। শুধু অস্তিত্ব বজায় রাখা। অবশ্য ওপরে ওঠা আমাদের বন্ধ হয়নি। আমাদের সাজ সরঞ্জামগুলো ঠান্ডার উপযুক্ত করে তৈরি। অসম্ভব ঠান্ডাতেও সেগুলো সুন্দর কাজ করছে, বিশেষ করে পায়ের বুট এক কথায় অতুলনীয়। শুধুমাত্র ঐ বুটের জন্যেই একজন সদস্যকেও তুষারক্ষতে আক্রান্ত হতে হয়নি। এখনই আমরা যে ধরনের ঠান্ডার মখোমুখি হয়েছি, তাতে সংশয় জাগে এর ওপর গেলে আমরা আদৌ বেঁচে থাকব কিনা?

এতসব সত্ত্বেও অক্টোবর মাসের শেষে আমরা লোৎসের মূল ঢালের মুখে পাঁচ নম্বর শিবির স্থাপন করলাম। এবার শুরু হবে সাউথ কলে পৌঁছবার আসল লড়াই। ঠিক হল গতবারের রাস্তাতেই আমরা চেষ্টা করব, সেই মত দুটো দলে ভাগ হয়ে বরফে সিঁড়ির ধাপ কাটা এবং দড়ি খাটাবার কাজে মন দিলাম। আমাদের কাজকর্ম ভাল কার শুরু করার আগেই অক্টোবরের একত্রিশ তারিখে একটা দুর্ঘটনা ঘটল। ডাঃ শেভ্যালী এবং স্পোহেলের নেতৃত্বে একদল শেরপা পাঁচ নম্বর শিবিরের কাছে বরফের ঢালে দড়ি খাটানোর কাজ করছিল। দলটার বারজন সদস্য চারটে দলে ভাগ হয়ে পর্যায়ক্রমে কাজ করছে। কাজকর্ম দিব্যি চলছে এমন সময় ওপর থেকে ভারি কিছু একটা গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। ওপরে তাকিয়ে বোঝা গেল হিমানী সম্প্রপাত শুরু হয়েছে। তবে নিচে আসবার আগেই ভেঙ্গে অনেকগুলো টুকরো হয়ে গেল। সকলেই বরফের ঢালে শরীর লাগিয়ে দিয়ে বরফে মুখ গুঁজে দিল। এমন করাতে তারা বড় রকমের আঘাত থেকে বেঁচে গেল, তবে কয়েক জনের কাঁধে

আর পিঠে বরফের ছোট টুকরোর সামান্য আঘাত লাগল। একটা দড়িতে বাঁধা অবস্থায় কাজ করছিল মিঙমা দোরজী, আজীবা আর আমার ভাইপো টোপগে। সম্ভবত চরম মুহূর্তে অসতর্কতা হেতু মিঙমা দোরজী ওপর দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছে আর বরফের চাঙড় এসে তার মুখে আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে সে দেওয়াল থেকে ছিটকে পড়ল, অবশ্য ততক্ষণে অন্যরা দড়ি শক্ত করে ধরেছে ফলে মিঙমা দড়িতে বাঁধা অবস্থায় ঝুলতে লাগল। তার মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

ঐ রকম একটা বিপজ্জনক ঢালে অন্যদের পক্ষে তাড়াতাড়ি কিছু করা সম্ভব হল না, তার কাছে পৌঁছতে কিছু দেরী হল। মিঙমা দোরজীকে নিয়ে নামার সময় আবার এক দুর্ঘটনা। চার নম্বর দড়িতে আইলা, নরবু এবং মিঙমা রিটা নামছিল। সম্ভবত প্রথম দুর্ঘটনার আতঙ্কে তারা কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিল, ফলে সামান্য অসতর্কতায় তাদের পা পিছলে গেল; ফলে তিনজনেই পড়তে শুরু করল যতক্ষণ না প্রায় দুশো ফুট নিচে একটা সমতল বরফক্ষেত্রে তারা আটকা পড়ে। অন্যরা মিঙমা দোরজীকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল কাজেই এবারেও সাহায্য পৌঁছতে কিছু দেরী হল। তবে ভাগ্য ভাল যে এদের আঘাত তেমন গুরুতর নয়। রিটার কাঁধের হাড় ভেঙেছে, আইলা আর দা নরবু সামান্য আঘাত পেয়েছে। যদিও তারা বেঁচে গেল কিন্তু মনের যা অবস্থা হল তাদের যে অভিযানের পরবর্তী পর্যায়তে তারা কতটা সাহায্য করতে পারবে বলা মুশকিল। মিঙমা দোরজীকে পরীক্ষা করে দেখা গেল তার মুখেই শুধু আঘাত লাগেনি পরন্তু গলা আর ঘাড়ের মাঝখান দিয়ে পাথরের একটা তীক্ষ্ণ টুকরো ঢুকে তার ফুসফুসে আঘাত করেছে। ডাঃ শেভ্যালীর আপ্রাণ চেষ্টাতেও তাঁকে বাঁচানো গেল না।

দুর্ঘটনা যখন ঘটল আমরা অনেকেই তখন চার নম্বর শিবিরে ছিলাম। যে মুহূর্তে খবর এসে পৌঁছল আমরা ওপর দিকে রওনা হলাম কিন্তু আমরা পৌঁছবার আগেই সব শেষ হয়ে গেছে। এই ঘটনায় শেরপাদের মনে এক ব্যাপক হতাশা দেখা দিল। একজন সজাতির মৃত্যুতে তারা মুহ্যমান। একটা অভিযানে সদস্য, শেরপা এবং মালবাহক প্রত্যেকের জীবনের মূল্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সুইসরাও এই মৃত্যুতে অত্যন্ত ব্যথিত হল। তারা আমাকে ডেকে বললে যে যদি এই দুর্ঘটনা এবং মৃত্যুর জন্যে শেরপারা অভিযান বন্ধ করতে চায় তবে তাদের কোনও আপত্তি নেই। শেরপারা যা চাইবে সুইসরাও তার যথাযথ মর্যাদা দেবে। সেদিন রাত্রে আমি চার নম্বর শিবিরে শেরপাদের নিয়ে আলোচনায় বসলাম। আলোচনা করে বুঝলাম এমন এক ঘটনায় শেরপারা খুবই ব্যথিত হয়েছে, কেউ কেউ ভয় পেয়েছে এবং অনেকেই অভিযানের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করল। তবে একটা ব্যাপারে সবাই একমত যে যা কিছুই ঘটুক না কেন অভিযান পরিত্যক্ত হবে না। সেইমত আমি সুইসদের সব কথা জানালাম। পরদিন তিনজন আহত শেরপাকে নিচে মূল শিবিরে রওনা করিয়ে দিয়ে আমরা হিমবাহের ধারে পাথর সাজিয়ে মিঙমাকে সমাধি দিলাম। সমাধির উপর পাথর সাজিয়ে এক স্মৃতি স্তম্ভ তৈরি করে তার পায়ের কাছে কাঠের ফলকে মিঙমার নাম বয়স আর দুর্ঘটনার তারিখ লিখে বসিয়ে দিলাম। বিদায় বন্ধু! ১৯৩৪ সালে এভারেস্ট অভিযানে একক অভিযাত্রী মরিস উইলসনের

পর দ্বিতীয় যে জন প্রাণ দিল সে আমার সজাতি এবং বন্ধু মিঙমা দোরজী।

এবার আমাদের প্রথম কাজ হল সাউথকলে পৌঁছবার জন্যে একটা নতুন রাস্তার সন্ধান করা। বসন্তকালেও জেনিভা স্পারে গিরিসঙ্কট থেকে মাঝে মাঝেই হিমানী সম্প্রপাত (Avalance) হয়ে থাকে। শরৎ কালে এর মাত্রা অনেক বেশি। এর মধ্যেই আমরা একজন কমরেডকে হারিয়েছি, অকারণে আর কোনও বলিদান আমাদের পছন্দ নয়। চার নম্বর শিবির থেকে জেনিভা স্পারের সোজাসুজি ওপরে ওঠার রাস্তা পরিত্যাগ করে আমরা ডানদিকে বরফের ময়দান পেরিয়ে লোৎসের দেওয়ালের কাছে পৌঁছলাম। এবার ঐ পথ দিয়ে ওপরে ওঠার প্রচেষ্টা শুরু হল—এখানে হিমানী সম্প্রপাতের আশঙ্কা অনেক কম। খুম্বু হিমবাহ দিয়ে প্রথমবারের অভিযান থেকে আমরা একটা ব্যাপারে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, তা হল ওয়েস্টার্ন কুম থেকে একদিনে সাউথকলে পৌঁছন সম্ভব নয়। সোজাসুজি উঠতে গেলেও মাঝপথে আর একটা শিবির স্থাপন করা প্রয়োজন। নতুন রাস্তা ডানদিকে লোৎসের দেওয়াল ঘেঁসে উঠতে গেলে কম করে আরও দুটো শিবির লাগাতে হবে। আবার শুরু হল আমাদের রাস্তা তৈরির কঠিন সংগ্রাম। এ রাস্তায় আমরা আড়াই হাজার ফুট মত দড়ি লাগালাম, দেখতে দেখতে বরফের ঢালে আরও দুটো শিবির তৈরি হয়ে গেল।

আমাদের অগ্রগতির হার আশাপ্রদ, উঁচু থেকে আরও উঁচুতে উঠে যাচ্ছি, আর এটা অবশ্যম্ভাবী যে আমি আর ল্যাম্বার্ট সব সময়েই আগে আগে চলেছি। কখনও রাস্তা পরিষ্কার করছি কখনও দড়ি লাগাচ্ছি, দুজনেই পরম উৎসাহে কাজ করছি আর মাঝে মাঝেই চেঁচিয়ে উঠছি—সা ভা বিয়েন। এই অভিযানে আমাদের বাড়তি সুবিধে, হচ্ছে যে কাজ করার সময় অক্সিজেন ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছি। আগের অভিযানে অক্সিজেন ব্যবহারের যে যন্ত্র আমাদের সঙ্গে ছিল এবার তার চেয়ে অনেক উন্নতমানের যন্ত্র আমরা ব্যবহার করতে পারছি। কিন্তু যতই হোক, এরকম একটা উচ্চতায় তীব্র ঠান্ডা আর ভয় জাগানো ঝড়ের তান্ডবে মানুষের পক্ষে দীর্ঘদিন লড়াই করা সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে শীতের আগমন বার্তা শোনা যেতে লাগল। আকাশ স্বচ্ছ নীল, ঝড়ের তান্ডব কমে আসছে। ক্রমশ ঠান্ডা বাড়ছে, এতটাই বাড়ছে যে আমাদের অতি মূল্যবান শীতের পোশাক ভেদ করে চামড়া ফুঁড়ে হাড়ে বিঁধে যাচ্ছে। এদিকে দিন ক্রমশ ছোট হচ্ছে, ঝড় থেমে গেছে, চারিদিক নিস্তব্ধ। এখন এমন অবস্থা যে বেলা দুটোর মধ্যে সূর্য লোৎসের দেওয়ালের আড়ালে চলে যাচ্ছে। সূর্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে বর্ণনাতীত ঠান্ডা এসে চরাচর গ্রাস করছে। আর তখন থেকে পরের দিন সকালে যতক্ষণ পর্যন্ত না আবার সূর্যের রশ্মি এসে তাঁবুর গায়ে লাগছে ততক্ষণ শুধু ঠান্ডায় জমে যাবার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলতেই থাকে। আর এরই মাঝে শুধু একঘেয়ে এক শিবির থেকে অন্য শিবিরে ওঠা এবং কখনও বা মাল নিয়ে আসার জন্যে নিচে নেমে আসা। সেদিন চার নম্বর শিবিরে একটা তাঁবুতে আমি আর আজীবা। পাশের তাঁবুতে অসুস্থ ডাইরেনফোর্থ। বেশ কয়েকদিন ধরে গলায় ব্যথা আর একঘেয়ে জ্বরে বেচারা একদম কাহিল, নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই বললেই চলে। গভীর রাতে ভয়ঙ্কর ঝড় শুরু হল। মনে হচ্ছে যেন কোনও ছাড়া পাওয়া দৈত্য তাঁবু উড়িয়ে নিয়ে যাবে। আমরা দুজন তাঁবুর খুঁটি ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করছি যাতে

সেটার কোনও ক্ষতি না হয়। এমন সময় বাইরে থেকে গোঙানির শব্দ কানে এল। কোনও মতে তাঁবুর দরজা খুলে বাইরে মুখ বাড়ালাম, দেখি ডাইরেনফোর্থের তাঁবু ভেঙ্গে পড়েছে। হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে এলাম, আপ্রাণ চেষ্টা করছি তাঁবুটাকে আবার খাড়া করতে, অসুস্থ ডাইরেফোর্থের তাঁবুর বাইরে আসার কোনও ক্ষমতাই নেই। বহু কষ্টে যখন তাঁবুটা খাড়া করলাম ততক্ষণে আমাদের সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে।

একটানা দুর্যোগের মধ্যে অভিযাত্রীদের শুধু শারীরিক নয় মানসিক অবস্থাও ভেঙ্গে পড়েছে। সবাই হতোদ্যম। কোনও কোনও শেরপার কাজ করার ইচ্ছেটা চলে গেছে, কেউ কেউ ওপরে নয় নিচে নেমে যেতে চাইছে। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে বাকি শেরপাদের রীতিমত ঝগড়া হয়ে যাচ্ছে, মুখে যা আসছে তাই বলে গালাগাল দিচ্ছি তাদের। এদিকে গোদের ওপর বিষ-ফোড়ার মত সব সময়েই কেউ না কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ছে, না হয় অসুস্থ হবার ভান করছে। অসুস্থ সকলকেই মূল শিবিরে ফেরত পাঠাতে হচ্ছে। দেখতে দেখতে মূল শিবির একটা ছোট-খাট হাসপাতালের চেহারা নিল। শেষে লোৎসের দেওয়ালে কাজ করার লোকের এতই অভাব দেখা দিল যে একদিন কয়েকজনাকে নিয়ে আসার জন্যে আমাকে চার নম্বর থেকে মূল শিবিরে নেমে আসতে হল। নেমে এসে দেখি সেখানে ইয়েতি নিয়ে বেশ এক উত্তেজিত আলোচনা চলছে। গতবার আমরা যেখানে ইয়েতির পায়ের ছাপ দেখেছিলাম, মূল শিবিরের নিচে সেই জায়গায় একজন মালবাহক হঠাৎ চার পাঁচ ফুট লম্বা একটা ধূসর রংএর ইয়েতির সামনে পড়ে যায়। সেটা তখন দুপায়ে হাঁটছিল। খুব কাছ থেকে লোকটা তার উঁচু কপাল আর চওড়া চিবুক দেখতে পায়। তাকে দেখতে পেয়ে ইয়েতিটা মুখ হাঁ করে তার দিকে তেড়ে আসছিল যেন তক্ষুণি ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু তা না করে সেটা হঠাৎ যেমন তার সামনে এসে পড়েছিল তেমনি হঠাৎই পেছন ফিরে অদৃশ্য হয়ে গেল। সব শুনে বুঝলাম লোকটা বাজে কথা বলছে না, এর আগেও অনেকেরই এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে। শুধু তাই নয় সকলের কথা শুনে বরাবর আমি যেটা বলে আসছি যে ইয়েতি আর কিছুই নয় হিমালয়ের এক ধরনের বাঁদর সে কথার সত্যতাও আর একবার প্রমাণিত হল।

অবশ্য ইয়েতি ছাড়াই সমস্যার আর সীমা নেই। যাই হোক, আমি এবার শেরপাদের দিকে ফিরলাম। তাদের উৎসাহ দেবার জন্যে বললাম, "কি কুঁড়ের মত বসে আছ? সামনে চেয়ে দেখ ঐ বিশাল পাহাড় আমদের ডাকছে এস, আমরা তার ডাকে এগিয়ে যাই।" কাজ হল। বেশ কয়েকজন আমার সঙ্গে রওনা হল লোৎসের দেওয়ালে কাজ করার জন্যে।

পরিকল্পনা মাফিক সবকিছু প্রস্তুত করতে আমাদের আরও এক সপ্তাহ সময় লেগে গেল। সাউথ কলে পৌঁছবার জন্যে সাজসরঞ্জাম নিয়ে আমরা প্রস্তুত। যার যা কিছু করতে হবে একটু তাড়াতাড়ি করা দরকার। এখন নভেম্বরের মাঝামাঝি, শীত আসতে দেরী নেই। শেষ চেষ্টার জন্যে দশজনের একটা দল তৈরি করা হল। দলনেতা ল্যম্বার্ট, সঙ্গে আমি এবং রেস, এছাড়া আরও সাতজন বাছাই শেরপা যারা আমাদের সঙ্গে মাল নিয়ে যাবে। শেরপারা হল আং তেম্পা, পেম্বা সুন্দর, আং নিমা, আং নামগিয়াল, গুনডিন, পেম্বা এবং তোপগে। এরা সকলেই বয়সে তরুণ। প্রচন্ড ঠান্ডা আর দারুণ তুষার ঝড়ের মধ্যে কাজ ক'রে এরা নিজেদের

যোগ্যতা প্রমাণ করছে। এদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ সতের বছরের তোপগে আমার আপন ভাইপো। ওয়েস্টার্ণ কুম থেকে রওনা হয়ে ছ'নম্বর শিবিরে পৌঁছলাম আর সেখান থেকে সাত নম্বর। ১৯শে নভেম্বর আমরা সাউথ কলের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। এখন পথ ততটা খাড়াই নয় কারণ আমরা সাত নম্বর শিবির অনেক উঁচুতে তুলে রেখেছিলাম। তবু আমাদের গতি কমে এসেছে, কারণ এবার আমাদের নতুন করে রাস্তা বানাতে হচ্ছে। বেশির ভাগ সময় শেরপারা মাল নিয়ে অপেক্ষা করছে কখন অগ্রবর্তী দল অর্থাৎ ল্যাম্বার্ট, আমি এবং রেস বরফে সিঁড়ি বানিয়ে দড়ি খাটিয়ে তাদের উঠে আসার ব্যবস্থা করব। সকাল নটায় যাত্রা শুরু করে বিকেল সাড়ে চারটেয় আমরা জেনিভা স্পারের মাথায় পৌঁছলাম। তার কিছুক্ষণ পরে সাউথ কল-- একই বছরে দু দুবার! ধীরে সন্ধ্যা নামছে, বর্ণনাতীত ঠাণ্ডা আর দুঃসহ ঝড়ের দাপটের মধ্যে আমরা তাঁবু লাগাতে শুরু করলাম, পুরো একঘন্টা সময় লাগল কোনওমতে দুটো তাঁবু খাড়া করতে। আর যে মুহূর্তে তাঁবু দুটো দাঁড়িয়ে গেল সাতজন শেরপা হুড়মুড় করে তার মধ্যে সেঁধিয়ে গেল। ওদের এহেন ব্যবহারে আমরা কিছুই বলতে পারলাম না, ওদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। এতটা রাস্তা পাড়ি দিতে আমরা তবু অক্সিজেন ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছি আর ভারি বোঝা পিঠে নিয়ে বিনা অক্সিজেনে ওরা এতদূর উঠে এসেছে। নতুন শক্তি সঞ্চয় করে আমরা আবার তাঁবু লাগানোয় মন দিলাম। অবশেষে বহু কষ্টে তাঁবুর নিশ্চিন্ত আরাম। এবারে কিছু খাওয়া দরকার, কিন্তু কারও তেমন উৎসাহ নেই। খাবারের প্যাকেটগুলো নাড়াচাড়া করে দেখি ঠান্ডায় শক্ত পাথরের মত হয়ে গেছে সব। বহু কষ্টে বরফ গলিয়ে জল বানালাম। এবার তাকে গরম করা, অবশেষে জল গরম হলে তাতে চকোলেট গুলে সকলকে জোর করে খাওয়ালাম। পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্থানে ন'জন মানুষের জন্যে আর একটা দুঃসহ রাত্রি নেমে এল।

ওয়েস্টার্ন কুমের পর থেকে আমরা যে তাঁবুগুলো ব্যবহার করছি সেগুলোর সবকটার দুটো করে ভাগ। বাইরে তাঁবু খাড়া হবার পর ভেতরে আর একটা আস্তরণ। কিন্তু সাউথকলের দারুণ ঠান্ডায় তাঁবুগুলো তেমন কাজ করছে না, শুকনো ঠান্ডায় তাঁবুর কাপড় খসখসে হয়ে গেছে। দুটো আস্তরণের মধ্যে যে ফাঁক, ঝড়ের সময় সেই ফাঁক বুজে দুটো কাপড়ের ঘর্ষণে বৈদ্যুতিক চমক (Spark) সৃষ্টি হচ্ছে। থার্মোমিটারের পারদ শূন্যের চেয়ে তিরিশ ডিগ্রি নিচে নেমে গেছে, তাঁবুর বাইরে ক্রুদ্ধ ঝড়ের বিরামহীন গর্জন ব্যর্থ আক্রোশে ক্রমাগত ফুঁসে চলেছে। আমরা আমাদের শারীরিক এবং মানসিক সহ্য সীমার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি। ল্যাম্বার্টের মত শক্ত মানুষও আজ আর বলতে পারছেনা—সা ভা বিয়েন! প্রকৃতির নিয়মে সকাল হল, তখনও সমানে ঝড় বইছে ঘন্টায় ষাট মাইল বেগে। কোনওমতে চা বানালাম। খাদ্য বলতে ঐটুকু। কারও নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। কিন্তু এভাবে নিশ্চেষ্ট থাকলে মৃত্যু অনিবার্য। ঠিক করলাম ওপর দিকে এগিয়ে যাব। কিন্তু শেরপারা নিচে নামতে চায়, ওরা অসুস্থতার ভান করে, কিন্তু বাস্তবে গুনডিন ছাড়া সবাই সুস্থ আছে। অনেক বকাবকি করে তাদের রাজী করাতে পারলাম। এখন আমরা সাউথ কলে আট নম্বর শিবিরে। শেরপারা অল্প অল্প মাল তুলে নিল। বেশিটাই সাজ সরঞ্জাম, আমাদের ইচ্ছা সামনের শৈলশিরায় আর একটা

শিবির স্থাপন করব।

প্রস্তুত হয়ে রওনা হতে সাড়ে এগারোটা বেজে গেল। শুধু এক ঘন্টা সময় লাগল সাউথকলের ময়দান থেকে ঢালে পৌঁছতে, যেখান থেকে আমরা কঠিন শৈলশিরার পথ ধরব। ঝড়ের হাত থেকে বাঁচতে আমরা ঝুঁকে পড়ে প্রায় গুঁড়ি মেরে হাঁটছি। যদিও আমাদের ডানা নেই তবু যেন এই ঝড়ে ঈগলের মত উড়ে যাব। আমরা কখনওই চাই না যে আমাদের এমন করে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হোক। ল্যাম্বার্ট, আমি এবং রেস অক্সিজেনের সাহায্যে অন্যদের সামনে অতি ধীরে অগ্রসর হচ্ছি। অথচ আজ থেকে ছ'মাস আগে আমি আর আমাদের সামনের ঐ দৈত্যাকৃতি ভাল্লুকটা অক্সিজেনের জঘন্য যন্ত্রপাতি নিয়ে অনেক অল্প আয়াসে এই পথ অতিক্রম করেছিলাম। পৃথিবীতে এত ঠান্ডা থাকতে পারে? ঝড়ের গর্জন কি এমনই ভয়ঙ্কর হতে হয়? তিন জোড়া দস্তানার মধ্যে আমাদের আঙ্গুলগুলো অসাড় হয়ে আসছে। আমাদের নাক, আমাদের ঠোঁট, আমাদের মুখ সব নীল হয়ে গেছে। প্রকৃতির এই ভয়ঙ্কর অসম চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে, বীর, লড়াকু শেরপার দল পিঠে বোঝা নিয়ে প্রায় অথর্ব হয়ে পড়েছে। এখন আমরা কি ফিরে যাব? জানি এছাড়া দ্বিতীয় কোনও রাস্তা নেই। কিন্তু ফিরে যাওয়াটা আমার এবং ল্যাম্বার্টের পক্ষে যে কতটা দুঃসহ তা কেমন করে ব্যক্ত করব! আমরা পরস্পরের ভাষা জানিনা অথচ এভারেস্টকে কেন্দ্র করে আমাদের এই বন্ধুত্ব যেন কত কালের আত্মীয়তা। আমাদের স্বপ্ন ছিল যে একসাথে এভারেস্ট আরোহণ করব। আজ যদি ফিরে যাই তবে কি এ জীবনে আর কোনও দিন সুযোগ পাব? এভারেস্ট আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে, হৃদয় চাইছে এগিয়ে যেতে—কিন্তু পিছনে মৃত প্রায় শেরপার দল, দড়ির মাঝখানে রেস, সে ঘনঘন মাথা নাড়ছে। দাঁড়িয়ে পড়ে ঐ রুদ্ররূপী প্রকৃতির দিকে তাকালাম, অসহায় জন্তুর ক্রুদ্ধ বোবা চাহনী। এখানে জল ঝরে না, সবই বরফ, চোখের জল তাই কখন জমে গেছে। মনের অঙ্গনে অঝোর ধারে অশ্রুধারা বয়ে যাচ্ছে। হায় ল্যাম্বার্ট তুমিও কি কাঁদছ? আমরা পরস্পরের দিকে তাকাতে পারলাম না; মাথা নামিয়ে পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করলাম।

এই অভিযানে আমাদের ভাগ্যে যা জুটল তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুইসরা বলে যে হিমালয় আমাদের প্রত্যাখ্যান করেছে, অবাঞ্ছিত বস্তু মনে করে পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চেয়েছে। এই প্রত্যাখ্যান এমনই নির্মম যে ফিরে আসার আর কোনও প্রশ্নই অবশিষ্ট নেই। সাউথ কল থেকে আরও হাজার ফুট ওপর পর্যন্ত আমরা উঠেছিলাম। সেখানে আমরা পর্বতারোহণের প্রচুর সরঞ্জাম ফেলে এলাম। সাউথকলে ফিরে অসুস্থ গুনডিনকে তুলে নেবার জন্যে যেটুকু সময় ব্যয় করা দরকার তার চেয়ে এক মিনিট বেশি সময় ব্যয় করিনি (আমাদের ফিরতে আর কয়েক ঘন্টা দেরী হলে বেচারা ঠান্ডায় জমে মরে যেত)। সেখানেও প্রায় তিনশো পাউন্ড বিভিন্ন রকমের মাল ফেলে এলাম, অথচ মাত্র আগের দিন কি কষ্ট করেই না সেগুলো এখানে এনেছিলাম। এখন কোনও কিছুই আমাদের বিব্রত করছে না, শুধু একটাই চিন্তা কেমন করে এই নরক ছেড়ে পালাব। ঠান্ডা আর ঝড়ের দাপট, এর বিরুদ্ধে লুকোচুরি খেলতে খেলতে আমরা যত দ্রুত সম্ভব নেমে আসছি। ঝড়ের চাদর জড়ানো ঐ দৈত্য যদি একবার আমাদের নাগাল পায় তবে সব বাদ দিয়ে হাতে থাকে একটাই শব্দ আর

তা হল — 'মৃত্যু!'

সাত নম্বর শিবিরে পৌঁছে আমরা একজন সদস্যের দেখা পেলাম, তিনি শেভ্যালী। পিঠের বোঝা ফেলে দিয়ে আমরা সবাই সেখানে অনেকক্ষণ নির্জীবের মত পড়ে রইলাম। দলনেতাকে দেখেও আমরা কেউ মুখ ফুটে আর একবার চেষ্টার কথা বলতে পারিনি। জানি দশ ফুট ওপরে ওঠার ক্ষমতাও আমরা হারিয়ে ফেলেছি। পরদিনই নেমে এলাম কুম-এর পাঁচ নম্বর ক্যাম্পে। এখন আমাদের একটাই চিন্তা যে কত তাড়াতাড়ি এই ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচা যায়। আমরা নেমে যেতে চাইছি সেখানে, যেখানে গেলে প্রাণ ভরে নিশ্বাস নেওয়া যাবে, গরম খাবার পাওয়া যাবে আর নিশ্চিন্তে ঘুমনো যাবে। আমাদের হাত পা, আমাদের শরীব আর আমাদের হাড়ের মধ্যে একটু উষ্ণতা চাই। অবশেষে মূল শিবির। আশ্চর্যজনক ভাবে আমাদের দলের কোনও লোকের সামান্যতম তুষারক্ষতও হয়নি। এটা কেমন করে সম্ভব হল? এটা কি দৈব বল?'তাই বা বলি কেমন করে। আসলে সুইসরা যে উন্নত মানের পোশাক এবং সাজসরঞ্জাম এবারের অভিযানে ব্যবহার করেছে অতীতে তা দেখিনি। হতে পারে এমন পোশাকের জন্যেই আমরা সবাই রক্ষা পেয়েছি। হিমালয় আমাদের প্রত্যাখ্যান করেছে হয়ত বা তাড়িয়ে দিয়েছে। তবু তো আমরা বেঁচে আছি? শুধু রেখে গেলাম শেরপা শহীদ মিঙমা দোরজীকে।

নামচেবাজারে আমার মা আর বোনের সঙ্গে দেখা হল। আমাদের গ্রামে মিঙমার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছবার সাথে সাথে আমার এক বোন খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তার বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে সোজা মূল শিবিরে চলে আসে। সেখানে আমাকে না দেখে এক নম্বর পর্যন্ত উঠে গিয়েছিল, অবশ্য তখন আমি আরও ওপরে ছিলাম। কাজেই সেখানে আমার সঙ্গে দেখা হয়নি।

ডিসেম্বরের শেষে আমাদের ফেরা শুরু হল। তখন পিছনে শীতের সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে এভারেস্ট আমাদের দিকে কৌতুকভরা চোখে তাকিয়ে আছে। ব্যর্থতা আমাদের মনে নিদারুণ আঘাত হেনেছিল। আমরা সবাই ব্যথিত। ডঃ শেভ্যালী তাঁর দিনপঞ্জীতে লিখলেন, এই ব্যর্থতায় আমার হৃদয় অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমরা তো আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম। এই বিরুদ্ধ আবাহাওয়ায় আমরা যে সাফল্য দেখিয়েছি, মানুষের পক্ষে এতটা করা সত্যিই কঠিন। ফিরতি যাত্রায় বৃষ্টি শুরু হল, সারাদিন বৃষ্টির মধ্যে হেটে আমরা বিরক্ত। আর এখানেই ঘটল পর্বত অভিযানে আমার প্রথম দুর্ঘটনা। সামান্য অন্যমনস্ককতায় পা মচকে হাঁটার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললাম। দুটো স্কি স্টিকের সাহায্যে শুরু হল খুঁড়িয়ে পথ চলা। অবশেষে কাঠমাণ্ডু। একে সারাদিন বৃষ্টিতে ভেজা তায় পায়ে যন্ত্রণা, ফিরলাম জ্বর নিয়ে।

— এভারেস্ট যদি আমার স্বপ্ন বিলাস হয়, তবে এই অভিযানে তা হয়ে গেল এক তিক্ত স্মৃতি!

আর দেরী নয়

কাঠমাণ্ডুতে আমাদের যেভাবে সংবর্ধিত করা হল তা দেখে মনে হয় না যে আমরা এভারেস্ট আরোহণে ব্যর্থ হয়েছি, পরন্তু উল্টোটাই মনে হয়। নেপালের রাজা নিজে হাতে আমাকে 'নেপাল প্রতাপবর্দ্ধক' পদক দিয়ে সম্মানিত করলেন। যে কোনও মানুষের পক্ষে এটা একটা অভূতপূর্ব সম্মান। এদিকে এত সব যে কাণ্ড চলছে তার অনেকটাই আমার স্মৃতিতে আবছা একটা প্রতিক্রিয়া মাত্র সৃষ্টি করেছে। আমি তখন জ্বরে প্রায় বেহুঁশ, সম্ভবত ম্যালেরিয়া। একই বছরে দুটো বড় অভিযানের ধকল সইতে গিয়ে আমার শরীর বেহাল হয়ে পড়েছে। সুইসরা অত্যন্ত বন্ধুবৎসল এবং উদার মনের মানুষ। কাঠমাণ্ডু থেকে তারা আমায় সোজা বিহারে পাটনায় উড়িয়ে নিয়ে এসে আমেরিকান ক্যাথলিক মিশনারীদের 'হোলী ফ্যামিলি' হাসপাতালে ভর্তি করে দিল। সেখানে দশ দিন থাকতে হল আমায়।

এরপর সুইসরা দেশে ফিরে গেল। শেরপারা ট্রেনে চেপে দার্জিলিং-এর পথে পাড়ি দিল। হাসপাতালে আমি তখন একা, অর্ধ অচেতন, জ্বরের ঘোরে মাঝে মাঝে নানারকম স্বপ্ন দেখতাম। প্রায়ই দেখতাম যে আমি এভরেস্টে প্রচন্ড ঠাণ্ডা আর দানবীয় ঝড়ের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। জ্বর ছেড়ে গেলে নিস্তেজ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকতাম, দূর্বল শরীরে হাত দুটো নাড়ানো এমনকি চোখ খুলতেও কষ্ট হত। এভারেস্টে দুটো বড় মাপের অভিযান, ঠাণ্ডা এবং দামাল ঝড়ের বিরুদ্ধে লড়াই, আর একটাই মানুষ শেরপা সর্দার এবং আরোহণকারী সদস্য—এতটা কঠিন বোঝা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে!

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলাম, আমার যোল পাউন্ড ওজন কমে গেছে। দার্জিলিং ফিরতে আমার স্ত্রী এবং মেয়েরা আমাকে দেখে আঁতকে উঠল। আং লামু কান্না ভেজা গলায় বলল, একি চেহারা হয়েছে ? এক বছর আর কোথাও যেতে দেব না তোমায়। বাড়িতে বসে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নাও। তখন শরীর আমার এতই দূর্বল যে কথা বলার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। শুধু ঘাড় নাড়লাম।

এটা ১৯৫৩ সাল। এরই মধ্যে সুইসদের দু'দুটো উন্মানের অভিযান কাহিনী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পর্বতরোহীদের মধ্যে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করল। দেশে ফিরে প্রতিনিয়তই চিঠি পাচ্ছি পর্বতরোহীদের কাছ থেকে, তাদের একান্ত ইচ্ছে আমি যাতে তাদের সঙ্গে এভারেস্ট অভিযানে যেতে সম্মত হই। এমনকি পাটনার হাসপাতালে থাকাকালীন বৃটিশ পর্বতারোহী মেজর চার্লস উইলি চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেছিলেন আমি যেন বৃটিশদের সঙ্গে এভারেস্ট অভিযানে অংশ নিই। তিনি নিজেকে বৃটিশ দলের ট্রান্সপোর্ট অফিসার হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে দার্জিলিং থেকে এই চিঠি লিখেছিলেন। আমি দার্জিলিং ফেরার পর হিমালয়ান ক্লাবের মিসেস হেন্ডারসন ইংরেজদের সঙ্গে অভিযানে যাবার জন্যে আমাকে পীড়াপীড়ি করতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, "দেখ তেনজিং তুমি অতীতে এদের সঙ্গে এভারেস্ট অভিযানে গিয়েছ। তোমাদের পরস্পরের সঙ্গে যথেষ্ট হৃদ্যতা আছে। তুমি গেলে খুবই ভাল হয়।" কিন্তু আং লামু একেবারে বেঁকে বসল, সে কিছুতেই আমাকে

যেতে দেবে না। আমার শরীরটা এতই দুর্বল যে কোনও কিছু ভাববার মত মনের অবস্থা নয়। হেন্ডারসন ধৈর্যশীলা এবং বুদ্ধিমতী মহিলা, আমি যাতে তাড়াতাড়ি আমার হৃত স্বাস্থ্য ফিরে পাই সে জন্যে কয়েক সপ্তাহ ধরে আমাকে দুধ এবং ওভালটিন পাঠাতে শুরু করলেন।

কিছুদিন বিশ্রামের পর আমি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলাম। এখন আমার কোনও কাজ নেই, অখণ্ড অবসর। যখনই একা একা থাকি তখনই সুইসদের কথা, তাদের সঙ্গে অভিযানের কথা মনে পড়ে। তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়াতে আমি খুবই খুশি হয়েছি। জীবনে যত 'চিলি-নাংগা' বা বিদেশীর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে তার মধ্যে সুইসদের ব্যবহারের কোনও তুলনা হয় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যখনই শোলো খুম্বুর শেরপারা শুনবে যে সুইসরা সে পথে অভিযানে আসছে তখনই তারা হাতে ছাং নিয়ে এগিয়ে যাবে তাদের অভিনন্দন জানাবার জন্যে। এতটাই হৃদ্যতা গড়ে উঠেছে সুইসদের সঙ্গে আমাদের। এখনও আমি তাদের সঙ্গে এভারেস্ট অভিযানে যাবার বাসনা লালন করি। আমার চোখের সামনে বারেবারেই ভেসে ওঠে আমার প্রিয়বন্ধু অভিযাত্রী ল্যাম্বার্টের মুখ। আমি সবচেয়ে খুশি হব যদি তার সঙ্গে এভারেস্ট শীর্ষে আরোহণ করতে পারি। কিন্তু তেমন কিছু হবার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ এখন বৃটিশদের পালা, আর তারাও যদি অকৃতকার্য হয় তবে নেপাল সরকার ১৯৫৪ সালে ফ্রেঞ্চ সরকারকে আগাম অনুমতি দিয়ে রেখেছে। কাজেই ১৯৫৫ সালের আগে সুইসদের আর কোনও সুযোগ আসবে না, তবে সে বহু পরের কথা; কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর আগেই কেউ না কেউ কৃতকার্য হবে।

১৯৫১ সালের বসন্ত কালে ল্যাম্বার্ট এবং আমি প্রায় শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিলাম। শুধু যদি অক্সিজেনের যন্ত্রপাতিগুলো আর একটু ভাল হত বা আবহাওয়া ভাল থাকত তবে সেই বছরেই এভারেস্ট পরাজয় বরণ করত। এবার বৃটিশরা তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী দল নিয়ে আসছে। ১৯৫২ সালে আমি যখন সুইসদের সঙ্গে এভারেস্টে রয়েছি তখনই তারা শিপটনের নেতৃত্বে নিউজিল্যান্ডের কয়েকজন অভিযাত্রীর সঙ্গে যুগ্মভাবে চো ওউ অভিযান করে গেছে। এটা করার পিছনে তাদের দুটো উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত যে সাজ সরঞ্জাম ভবিষ্যতে এভারেস্ট অভিযানের জন্যে তারা ব্যবহার করবে তার গুণগত মান পরীক্ষা করা এবং ১৯৫৩ সালের এভারেস্ট অভিযানের দল গঠন করা।

সুইসরা যে নতুন রাস্তা তৈরি করেছে তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে তারা সর্বশক্তি দিয়ে এবার ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় কারণ যেভাবেই হোক প্রথম আরোহণের কৃতিত্ব তাদের পেতেই হবে। চিরকাল এভারেস্টকে তারা বৃটিশ পর্বত হিসেবে মনে করে এসেছে অথচ আর একটু হলে সুইসরা সে সম্মান ছিনিয়ে নিত। একথা তারা খুব ভাল করে জেনে গেছে, তাদের পরেই আসছে ফরাসীরা এবং তারপর আবার সুইসরা। জয়মাল্য চিরকাল অপেক্ষা করবে না।

এদিকে ১৯৫২ সালে কিছু পদযাত্রী নাঙপা লা অতিক্রম করে তিব্বত থেকে নেপালে এসে জানাল যে রুশীরা রংবুকের দিক যেনে আমাদের অভিযান চলাকালীনই অভিযান সংগঠিত করেছে। এটা খুবই সম্ভব অচিরেই তারা আবার চেষ্টা করবে। এখন এভারেস্টকে

সাঁড়াশির মত চেপে ধরা হয়েছে, দুদিকেই রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে, কেউ না কেউ খুব তাড়াতাড়ি সফল হবেই। কাজেই একথা জলের মত পরিষ্কার যে এবারের চেষ্টায় বৃটিশরা ব্যর্থ হলে তারা চিরকালের জন্যেই বঞ্চিত হবে। এবারের অভিযানে বৃটিশ অভিযাত্রী দলে কারা থাকছে সেটা এখনও জানতে পারিনি। প্রথমে কথা ছিল এরিক শিপটন দলটি পরিচালনা করবেন, পরে শুনলাম বৃটিশ সৈন্য বাহিনীর কর্নেল জন হান্টকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমার সঙ্গে জন হান্টের কোনও পরিচয় নেই তবে শুনেছি তিনি হিমালয়ে অনেকগুলো অভিযান করেছেন। আর তাঁর সঙ্গে আসছে ইংলন্ডের বাছাই করা একটি দল এবং দুজন নিউজিল্যান্ডবাসী। এঁদের সঙ্গে অতীতে আমার সাক্ষাৎ হয়নি তবে একজন—নাম এডমন্ড হিলারী ১৯৫১-র এভারেস্ট পরিক্রমা এবং ১৯৫২র চো ওউ অভিযানের সদস্য ছিল।

১৯৫১ সালে টাকা পয়সার লেনদেন নিয়ে বৃটিশদের সঙ্গে শেরপাদের যে ঝামেলা হয়েচিল সেটা মিসেস হেন্ডারসনকে বলাতে আমার কথা লুফে নিয়ে তিনি বললেন, "সেই জন্যেই তো আমি চাই যে তুমি দলে থাক। কারণ তুমি ছাড়া শেরপাদের সঙ্গে অভিযাত্রীদের ঠিকঠাক বোঝাপড়া করাবার উপযুক্ত কেউ নেই।"

—"ভেবে দেখছি, শিগগীরই মনস্থির করে ফেলব," বলে আমি সেদিনের মত চলে এলাম।

চলে তো এলাম, কিন্তু সত্যি কথা হল ভাবতে গিয়ে আমি মহা সংশয়ে পড়ে গেলাম। কারণ আমার কি করা উচিত, এটাই ঠিক করতে পারছি না।

সুযোগ এসেছে, আমি আমার এই জীবন কাহিনীতে চেষ্টা করব খোলামনে সব কিছু ব্যক্ত করার। —আমার এই স্বীকারোক্তি হঠাৎ করে ব্যক্ত করা নয়। বৃটিশদের সঙ্গে অভিযানের শেষে এবং তার পরবর্তী সময়ে এত রকমের ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে যে আসল সত্যটাই চাপা পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। আন্তরিক ভাবেই আমি তার অবসান চাই, আসল সত্য কি প্রত্যেকেই তা জানুক।

সুইসদের সঙ্গে অভিযানেই আমার আগ্রহ বেশি এই সত্য স্বীকার নেওয়া ভাল, যদিও এ নিয়ে অনেক জল ঘোলা করার চেষ্টা হয়েছে। বৃটিশদের আমি অপছন্দ করি এটা মোটেই ঠিক নয়। পৃথিবীর যে কোনও দেশের অভিযাত্রীদের চেয়ে বৃটিশদের সঙ্গেই আমি সর্বাপেক্ষা বেশি অভিযানে অংশ নিয়েছি। এদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই ব্যক্তিগতভাবে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং আমি এতে খুশি, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন মিঃ গিবসন, মেজর ওসমাসটন, মেজর হোয়াইট, টিলম্যান, ফ্রাঙ্ক স্মাইথ, লেঃ মার্শ প্রভৃতি। কিন্তু এটাই সত্যি, সাধারণত ইংরেজরা যথেষ্ট গম্ভীর এবং সজাতি ছাড়া সকলের সঙ্গেই একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলতে চায়। হতে পারে বহুদিন পূর্বদেশ শাসন করার জন্যেই তারা এমনটা করে অথবা এটাই তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ইংরেজদের এই স্বভাবটা শেরপারা খুব ভাল করে লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছে কারণ অনেকদিন ধরে ইংরেজ ছাড়াও অন্য অনেক পাশ্চাত্য জাতির সঙ্গে তারা পর্বতারোহণে গিয়েছে। সুইস এবং ফরাসীদের সঙ্গে পাহাড়ে গিয়ে দেখেছি যে তারা শেরপাদের দলের সদস্য মনে করে, কিন্তু ইংরেজদের সম্বন্ধে এ কথা মোটেই প্রযোজ্য

নয়। ইংরেজরা দয়ালু, ভদ্র এবং সাহসী কিন্তু তারা বহিরাগতদের সঙ্গে সবসময়েই একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলে। অধীনস্থ কর্মীদের সঙ্গে তারা সচেতন ভাবেই একটা ব্যবধান রাখে। যেহেতু 'দূরত্বহীন' অভিযানের অভিজ্ঞতা আমাদের, শেরপাদের আছে তাই এই সাহেব ও কর্মচারীদের মধ্যেকার পার্থক্যবোধ খানিকটা সমস্যা সৃষ্টি করে বৈকি! হ্যাঁ, ইংরেজদের সম্বন্ধে এর প্রত্যেকটা কথা সত্য। কিন্তু এখন এসব কথা চিন্তা করার কি কোনও প্রয়োজন আছে? কারণ তাদের সঙ্গে অভিযানে গিয়ে আমার কোনও সমস্যা হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না, বিশেষত আমি তাদের সঙ্গে কোনও নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছিনা অথবা কোনও জমায়েতে আসন গ্রহণ করছি না। আমি যাচ্ছি এভারেস্টে, আমার স্বপ্নের এভারেস্টে। এখন ফরাসী অথবা সুইসদের জন্যে অপেক্ষা করা কি যুক্তিযুক্ত হবে? যদি এমন হয় যে এবারের প্রচেষ্টায় ইংরেজরা সফল হল আর আমি সেই দলে নেই? তাহলে কি সেটা আমি সহ্য করতে পারব? তাই এভারেস্ট অভিযান বৃটিশদের পক্ষে যতটা জরুরী আমার পক্ষে ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ।

এই সব সাত পাঁচ ভাবতে গিয়ে আমার মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল। তবু ভাবনার শেষ নেই। আমার বয়স এখন উনচল্লিশ বছর, জীবনের সন্ধিক্ষণ। আর কতদিনই বা কঠিন অভিযানে অংশ নিতে পারব। অসুস্থ শরীরে এখনই আমি যথেষ্ট দুর্বল। ভাবতে চেষ্টা করলাম যে কতবার আমি এভারেস্ট অভিযানে গিয়েছি। ডেনম্যানের সঙ্গে ধরলে মোট ছবার। এবার গেলে সপ্তমবার—শেরপা জাতির সংস্কার অনুযায়ী শুভ সংখ্যা। শেরাপারা মনে করে সাত মানেই শুভ। সাতজনের দল, পিতা মাতার সাত সন্তান সবই শুভ।

কিন্তু আমার শরীরের যা অবস্থা তাতে আমি নিজেই যথেষ্ট চিন্তিত। বাড়ি আসবার পর যদিও দ্রুত নিজের শক্তি ফিরে পাচ্ছি, তবু এখনও অভিযানে যাবার মত নয়। এক বছরের চেয়ে একটু বেশি সময়ে তৃতীয় এভারেস্ট অভিযান, পারব তো? এদিকে সুইসদের মত ইংরেজরাও আমাকে শেরপা সর্দার এবং অভিযাত্রী সদস্য হিসেবে দলে নিতে চায়, যেটা আমার পক্ষে অধিক চাপ সৃষ্টি করবে। এইরকম হাজার চিন্তা মাথায় এসে আমার রাতের ঘুম চলে গেল। দিনের পর দিন যদি মন আর শরীরের এমন চাপ চলতে থাকে তাহলে আবার হয়ত আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব। তাই একদিন গুটিগুটি পায়ে টুংসুং বস্তি থেকে বের হয়ে মিসেস হেন্ডারসনের অফিসে হাজির হলাম। আমাকে দেখে তিনি উৎসুক হয়ে উঠলেন। ধীরে ধীরে বললাম, "আমি যেতে রাজী আছি।" কিন্তু সেদিন যে কথাটা তাঁকে মুখ ফুটে বলতে পারিনি, আজও প্রাণ খুলে লিখতে পারছি না তা হল, 'আমি যেতে বাধ্য।' কারণ এভারেস্ট আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে, সে আমাকে তার মোহময় হাতছানিতে কাছে ডাকছে।

যাব, বলে দেওয়াটা যত সহজ আং লামুর কাছ থেকে অনুমতি পাওয়াটা তত সহজ নয়।

রাগে, দুঃখে ক্ষোভে অভিমানে সে চিৎকার করে ওঠে, "তুমি কি মানুষ? আবার অসুস্থ হয়ে পড়বে! এই দুর্বল শরীরে যদি কোনও মতে বরফে একবার পা পিছলে যায়, আমি জানি তুমি কিছুতেই নিজেকে বাঁচাতে পারবে না। অনেক উঁচু থেকে আছড়ে পড়ে তুমি মরে যাবে।

কিছুতেই আমি তোমাকে যেতে দেব না।"

—"তুমি বিশ্বাস কর আমি সব সময় হুঁশিয়ার থাকব।" ক্ষীণ কণ্ঠে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করি।

—"কেন তুমি বারে বারে এত ঝুঁকি নিতে চাও?" সে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

—"পাহাড়ে চড়ার জন্যে তারা আমাকে টাকা দেয়, মাঠে খেলা করার জন্যে নয়। যে কাজের জন্য অর্থ নিই সেটা মন দিয়ে করতে চাই।" আমি কঠিন হবার চেষ্টা করি।

—"তুমি ছন্নছাড়া! তোমার যদি কিছু ঘটে যায় তবে আমার আর এই বাচ্চা মেয়ে দুটোর কি হবে, তা কি ভেবেছ কোনও দিন?" আর পাঁচটা স্ত্রীর মতই সে আমাকে অভিযুক্ত করে।

—"বাজে বোক না। তুমি কোথায় দেখলে যে সংসার সম্বন্ধে আমি উদাসীন? পাহাড়ে চড়ায় আমার রুটি রুজীর সংস্থান হয়। এটা আমার জীবনের অঙ্গ। তুমি যে এই সংসারের কর্ত্রী, কৈ তোমার সাংসারিক কোনও ব্যাপারে আমি কি নাক গলাই? তোমায় আমি সাবধান করে দিচ্ছি যে এভারেস্ট অভিযানের ব্যাপারে তুমি কেন পৃথিবীর কারও অধিকার নেই আমকে বাধা দেবার।" —রাগে আমি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

—"তুমি একটা উন্মাদ, এই করে ঠিক একদিন মারা পড়বে।" চোখের জলে তার কণ্ঠ বুজে যায়।

—"ঠিক আছে। তাই হবে —দুঃসাহস দেখাতে গিয়ে আমি একদিন মারা পড়ব। আর আং লামু তেমন যদি হয় তুমি জেনে রেখ তা হবে এভারেস্টের বুকে। তোমার এই কুঁড়ে ঘরে নয়।"

আমার মনে হয় সব স্বামী স্ত্রীরই মাঝে মধ্যে এরকম ঝগড়া ঝাঁটি হয় এবং মিটেও যায়। আমাদেরও তাই হল। আং লামু যখন দেখলে যে আমাকে বাধা দেওয়া যাবে না তখন বিষণ্ণ হেসে বলে, "ঠিক আছে তুমি জিতে গেলে।"

সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারটা মিটে গেল। কিন্তু সংসারের চিন্তায় আমিও তার মত মনে মনে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। সত্যি করেই যদি আমি আর না ফিরি তবে সংসারটার কি হবে? এখন আমার উপার্জন বেড়েছে, সংসারে কিছুটা স্বচ্ছলতা এসেছে। যে কোনও দলে আমি মাসে তিনশ টাকা মাইনে পাই যেখানে অন্য শেবপারা একশ টাকা থেকে একশো পঁচিশ টাকা পর্যন্ত পায়। অবশ্য এবারের অভিযানে ঠিক হয়েছে যে অভিযান চলাকালীন যদি আমার কোনও দুর্ঘটনা ঘটে তবে আমার বাড়ির লোক এককালীন দু'হাজার টাকা পাবে। সুইসদের সময় এই অঙ্কটা ছিল এর অর্ধেক এবং তার আগে এব এক চতুর্থাংশ। এই মুহূর্তে টাকাটা অনেক মনে হতে পারে কিন্তু বাস্তবের চিত্রটা অন্যরকম। যেভাবে বাজার দর বাড়ছে তাতে ভবিষ্যতে ঐ টাকায় তাদের সংসার চলা দায় হবে। এতসব ভাবতে ভাবতে আমি আমার পরিচিত রবীন্দ্রনাথ মিত্র নামে এক শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের সঙ্গে দেখা কবলাম, দার্জিলিং-এ তার একটা ছাপাখানা আছে। দু'বছর হল তার সঙ্গে আমার গভীব বন্ধুত্ব হয়েছে। কোনও সমস্যা হলে ইদানিং আমি তার সঙ্গে পরামর্শ করি। সব শুনে সে বলল, "অভিযানে গিয়ে সত্যিকাবেই

যদি তোমার কিছু ঘটে যায় তাহলে আমি চেষ্টা করব কিছু চাঁদা তুলে তোমার বাড়ির লোককে সাহায্য করতে।"

এরই ফাঁকে ফাঁকে অভিযানে যাবার জন্যে আমার শরীরটাকে উপযুক্ত ভাবে গড়ে নেবার চেষ্টা করছি। যে কোনও অভিযানে যাবার কয়েক মাস আগে থেকে ভোর বেলা উঠে আমি একটা ঝোলা ব্যাগে (Knapsack) কিছু পাথর ভরে সেটা পিঠে বেঁধে দার্জিলিং-এর উঁচু নিচু পাহাড়ী পথে হেঁটে বেড়াই অন্তত কয়েক ঘন্টা। এবারেও আমি তাই শুরু করলাম। এছাড়া আমি ধূমপান করা অথবা মদ্যপান করা বন্ধ করে দিলাম, উৎসব অনুষ্ঠানও এড়িয়ে চলতে লাগলাম যেগুলো সাধারণভাবে আমি পছন্দই করি। শরীর গঠনের পাশাপাশি প্রতিনিয়ত পরিকল্পনা করছি আমার সপ্তম এভারেস্ট অভিযান কেমন হবে। চিন্তার ফাঁকে কখন যেন বিড়বিড় করি, 'এই উপযুক্ত সময়, এবার আমাকে সফল হতেই হবে। হয় আমি সফল হব না হয় প্রাণ দেব...।' এ ছাড়াও চিন্তা হচ্ছিল, আমার সঙ্গে তো কাউকে থাকতে হবে। এই রকম একটা পাহাড়ে তো একা যাওয়া যায় না। একা গেলে বেঁচে ফিরলেও কেউ বিশ্বাস করবে না। এবার তো ল্যাম্বার্ট থাকবে না, তাহলে সঙ্গে যাবে কে?

বৃটিশদের ইচ্ছে অনুযায়ী মিসেস হেন্ডারসনের সহযোগিতায় আমি কুড়িজন সেরা অভিজ্ঞ শেরপাকে দলভুক্ত করলাম। এদের প্রত্যেকেরই এভারেস্ট অভিযানে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা রয়েছে। দলে সবচেয়ে বয়জ্যেষ্ঠ শেরপা হল আমার বন্ধু দাওয়া থোন্ডুপ। থোন্ডুপের বয়স যদিও পঞ্চাশের কাছাকাছি আর মদ্যপানের মাত্রাটাও ইদানিং একটু বেড়েছে তবু সে দলে থাকলে দলটা শক্ত সমর্থ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় দার্জিলিং থেকে যাত্রা শুরুর ঠিক আগে সে অসুস্থ হয়ে পড়ল, অবশ্য পরে সে আমাদের সঙ্গে মূল শিবিরে যোগ দিল। দলের কনিষ্ঠতম সদস্য হল আমার ভাইপো তোপগে, ১৯৫২ সালে সুইস এভারেস্ট অভিযানে সাউথ কল পৌঁছবার অভিজ্ঞতা তার রয়েছে। এছাড়া রয়েছে আমার বোন লামু মিপার ছেলে গোম্বু। ১৯৫১ সালের বৃটিশ এভারেস্ট অভিযানে শেরপাদের সঙ্গে গণ্ডগোলের কথা মনে রেখে আমি শেরপাদের জানিয়ে দিলাম যে টাকা পয়সার সম্বন্ধে তারা যেন কোনও কথা না বলে, বকশিস্ নিয়ে প্রশ্ন ে◌ালা কিম্বা অন্য কোনও রকম দাবিদাওয়ার কথা তোলা নিষেধ। তাদের যা কিছু বলার সব আমাকে জানাতে হবে, পরিবর্তে আমি সাধ্যমত সকলের সব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব। অবশেষে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে আবার সর্দারের দায়িত্ব নিতে হল। আবার অন্যদিকে বৃটিশরা আমাকে একজন পর্বতারোহী সদস্য হিসেবেও দলভুক্ত করেছে। কাজটা খুবই কঠিন সন্দেহ নেই, কিন্তু এভারেস্ট অভিযানে সুযোগ পাবার জন্যে আমি হোটেলে বাসন ধোয়া থেকে শুরু করে হিমালয়ে ইয়েতি পালনের মত যে কোনও কাজ করতে রাজী।

১লা মার্চ দার্জিলিং থেকে রওনা হবার দিন ধার্য হল। দিন যত এগিয়ে আসে আমাদের ব্যস্ততাও তত বেড়ে যায়। টুংসুং বস্তি প্রায় খালি করে অনেক শেরপানীও আমাদের সঙ্গে নামচেবাজার, এমনকি মূল শিবির অব্দি যাবে। সুইসদের সঙ্গে দু'দুটো প্রায় সফল অভিযানের

পর শেরপাদের অনেকেই এবারের সাফল্য সম্বন্ধে খুবই আশাবাদী। বিদায়কালীন সাক্ষাৎকারের সময় অনেকেই আমায় 'খাদা' (কাউকে সম্মান জানানোর জন্যে অথবা সংবর্ধনার সময়ে শেরপারা মাফলারের মত কাপড়ের সরু টুকরো গলায় জড়িয়ে দেয়) দিয়ে সম্মানিত করল। একদিন রবিবাবু (রবীন্দ্রনাথ মিত্র, আমার বন্ধু) আমার হাতে একটা জাতীয় পতাকা দিয়ে বললেন, "তেনজিং, ঠিক সময়ে এই পতাকা এভারেষ্টের মাথায় উড়িয়ে দিও।" ছোট মেয়ে নিমা তার স্কুলে লেখার একটা লালনীল পেন্সিলের টুকরো আমার হাতে দিয়ে বলল, "তুমি কিন্তু এটা চোমোলোংমাকে দিতে ভুলে যেওনা।" তাকে কোলে নিয়ে আদর করলাম। মনে মনে বললাম, ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করেন তবে আমি সকলের সব সাধ পূর্ণ করব। অবশেষে বিদায় নেবার দিন এগিয়ে এল। এই সময় কোনও রকম আবেগকে প্রশ্রয় দেওয়া আমার স্বভাব নয় তাই যতটা সম্ভব নির্লিপ্ত থাকবার চেষ্টা করলাম।

সেই পুরনো পরিচিত পথ, পাহাড় থেকে নেমে এসে প্রথমে ট্রেনে চেপে রক্সৌল, তারপর বাসে নেপাল। আমাদের পরনে নানা অভিযানে পাওয়া রংবেরংএর পোশাক এক বাহারী মিছিলের চেহারা নিল। কাঠমাণ্ডু পৌঁছে দেখি অভিযাত্রীদের অনেকেই ইতোমধ্যে এসে হাজির হয়েছে। আবার কেউবা পৌঁছল আমাদের প্রায় সঙ্গেই। কর্ণেল জন হান্ট, মেজর উইলী এবং এডমন্ড হিলারীর কথা তো আগেই বলেছি, আরও সাতজন সদস্যের সঙ্গে আমাদের দেখা হল। তাঁরা হলেন, টম বরডিলন, ডঃ চার্লস ইভান্স, এ্যালফ্রেড গ্রেগরী, উইলফ্রিড নয়সি, জর্জ ব্যান্ড, মিখাইল ওয়েস্টম্যাকট এবং হিলারী ছাড়া দ্বিতীয় নিউজিল্যান্ডবাসী জর্জ লোয়ে। দলের চিকিৎসক ডঃ মিখাইল ওযার্ড, একজন বিজ্ঞানী গ্রিফিথ পাগ এবং সমগ্র অভিযান যিনি মুভি ক্যামেরায় ধরে রাখবেন সেই টম স্টোবার্ট-এর সঙ্গেও আলাপ হল। 'দি টাইমস্' পত্রিকার তরফ থেকে এই অভিযানের খরচ বাবদ কিছু টাকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে দলের সঙ্গে এসেছেন জেমস মরিস।

আমরা পৌঁছনর সাথে সাথে বৃটিশরা আমাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল। কিন্তু প্রথম দিনেই এমন একটা ঘটনা ঘটল যে আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হল। আগেও বলেছি, আবারও বলছি এসব নিয়ে আলাচনার সময় আমি আসলে কি ঘটেছিল আন্তরিক সততার সঙ্গে তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। কেউ যেন মনে না করেন যে বৃটিশদের অভিযুক্ত করার জন্যে, তাদের দোষী প্রমাণ করার জন্যে আমি এসব বলছি। আমি এসব বলছি যাতে আসল সত্যটা সকলে জানতে পারে। শেরপাদের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে যে একটা বড় সংসারে মাঝে মধ্যে কিছু ছোটখাট গোলমাল হয় এবং যথাসময়ে আবার সেটা মিটে যায়। ঠিক তেমনি হিমালয়ের প্রত্যেক বড় অভিযানে কিছু না কিছু ঝামেলা হয়েছে আবার সেটা মিটেও গেছে। কিন্তু ১৯৫৩ সালের এভারেস্ট অভিযানকে ঘিরে যা ঘটেছে তা এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এর কারণ হল এর অভূতপূর্ব সাফল্য এবং অস্বাভাবিক প্রচার। সবাই চেষ্টা করেছে ঘটনাগুলো নিজের মত করে প্রচার করতে, তার ফলে সেগুলো এমন আকার নিয়েছে যে সত্যিকারে কি ঘটেছিল তা বুঝে ওঠা মুশকিল হয়েছে। কর্ণেল হান্ট তাঁর

লেখা বইতে সব কথা লেখেননি। আমার মনে হয় তিনি ঠিকই করেছেন, কারণ তিনি অভিযানের একটা প্রামাণিক বর্ণনা দিয়েছেন। এছাড়া তিনি একজন ইংরেজ আর লিখেছেন ইংরেজদের জন্যে। আমাদের কথা, শেরপাদের কথা, তাদের মান অভিমান বেদনার কথা লেখার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেননি। এভারেস্ট আরোহণের যে গুরুত্ব, তাঁর বইতে সেটাই সঠিক ভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের অধিকার আছে তার নিজের কথা বলার। মানুষ নিজের মত করে বাঁচে, জীবনকে সে নিজের মত করেই দেখে। এছাড়া আমি কারও কাছে দায়বদ্ধ নই। আমি যেমন আছি তাই থাকব। যা দেখেছি, যা অনুভব করেছি, আন্তরিকভাবে সততার সঙ্গে তা বলার চেষ্টা করব।

ফিরে আসি প্রথম রাতের সেই অপ্রীতিকর ঘটনার কথায়। কাঠমাণ্ডুতে প্রথম রাত্রে শোবার জায়গা নিয়ে শেরপাদের মনে অসন্তোষ দেখা দিল। ইংরেজরা বৃটিশ দূতাবাসের দোতলায় শুতে গেল। শেরপাদের শুতে দেওয়া হল নিচে একটা গ্যারেজে যেটা অতীতে আস্তাবল হিসেবে ব্যবহৃত হত। শেরপারা এটা ভাল মনে নিতে পারল না, তারা অসন্তুষ্ট হল। আমি তাদের দোষারোপ করতে পারিনা। তাদের অসন্তোষের যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। আজ আর সেদিন নেই যে শেরপারা নিছক মালবাহক-কুলী। অনেক দিন আগেই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, নিজ যোগ্যতায় তারা দক্ষ পর্বতারোহী হিসেবে সম্মান অর্জন করেছে। ন্যূনতম সম্মানটুকু তারা আশা করতেই পারে। আমি কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের ক্ষোভের কথা জানালাম। পাশাপাশি একথাও বললাম যে শেরপাদের যদি ভাল কোনও থাকার ব্যবস্থা না করা যায় তাহলে আমার জন্যে যে আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানে না থেকে আমি কোনও হোটেলে চলে যাব। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে, সেই রাতের জন্যে অন্য কোনও ব্যবস্থা করা সম্ভব হল না। অবশেষে সঙ্গীদের বললাম, "একটা রাত বৈ তো নয়? এস কোনও মতে চালিয়ে নিই।" একথা বলে প্রতিবাদ স্বরূপ আমিও সে রাত্রে শেরপাদের সঙ্গে আস্তাবলে থাকার মনস্থ করলাম। তাবা কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে গুঞ্জন করে শুতে গেল। রাতের ব্যবস্থাটা যে তারা মন থেকে মেনে নেয়নি এবং আস্তাবল সংলগ্ন কোনও পায়খানা না থাকাটা যে তাদের একদম া পসন্দ হয়েছে তারই প্রতিবাদ হিসেবে তারা গ্যারেজের সামনের রাস্তাটাকে পায়খানা হিসেবে ব্যবহার করেছে। এই ঘটনায় দূতাবাস কর্তৃপক্ষ শেরপাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের একটা সারিতে দাঁড় করিয়ে লম্বা ভাষণ দিল। সে ভাষণে শেরপারা কোনও গুরুত্বই দিল না।

জীবনে প্রথম সাংবাদিকের মুখোমুখি হলাম। যেহেতু বৃটিশ অভিযাত্রীরা 'দি টাইমস' ছাড়া অন্য কোনও সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলবে না তাই অন্য সমস্ত সাংবাদিকরা আমাকে ছেঁকে ধরে সমস্ত ঘটনাটা জানার জন্যে হাজার প্রশ্ন করতে লাগল। 'দি টাইমস' ঘটনাটা ইংরেজদের কাছে যেমন শুনেছে সেই মত লিখল, কিন্তু আমার কোনও দায়বদ্ধতা নেই, কাজেই আমি অন্যদের কাছে সত্য ঘটনা ব্যক্ত করলাম। কিন্তু মুশকিল হল সাংবাদিকরা আমার কাছে শুনল একরকম করে, আর নানা কাগজ সেটা প্রকাশ করল তাদের নিজেদের মত করে। বুঝলাম

পর্বতই শুধু মানুষকে উঁচুতে তোলে না ইচ্ছে করলে খবরের কাগজওয়ালারা মানুষকে ওপরে তুলতেও পারে, আবার ফেলে দিতেও পারে। আর প্রথম সাংবাদিকদের মুখোমুখি হবার অভিজ্ঞতা আমার পক্ষে খুবই বেদনাদায়ক এবং মর্মান্তিক হয়েছিল।

অবশেষে এই দুঃস্বপ্নের গ্যারেজ এবং সাংবাদিকদের পেছনে ফেলে কয়েক মাইল দূরের ভাদগাঁও পৌঁছলাম। এই পর্যন্ত আমরা লরী চেপে এলাম। এখানেই অভিযানের সব মালপত্র রাখা আছে। সেই সমস্ত মালপত্র ভাগ বাঁটোয়ারা করে কয়েকশো নেপালী মালবাহকদের নিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করলাম। রওনা হবার আগে আবার এক সমস্যা। স্লিপিং ব্যাগ ছাড়া নিজস্ব ব্যবহারের জন্যে শেরপাদের কিছুই দেওয়া হয়নি। কথা হল মূল শিবিরে পৌঁছে বাকি সরঞ্জাম দেওয়া হবে। শেরপারা প্রশ্ন তুলল, এটা কেন হবে? আগের সমস্ত বড় অভিযানে যদি পদযাত্রা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে তাদের ব্যক্তিগত সরঞ্জাম দেওয়া হয়ে থাকে তবে এক্ষেত্রে তা হবে না কেন? কিন্তু জন হান্টের বক্তব্য হল যে আগে থেকে দিয়ে দিলে মূল অভিযানের আগেই সেগুলো যথেচ্ছ ব্যবহারে খারাপ হয়ে যাবে। আবার আমাকে মধ্যস্থতা করতে হল। আমি তাদের বোঝালাম যে এ ধরনের ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয় আর তাছাড়া এই ব্যবস্থা তো ভালই হয়েছে; কারণ অহেতুক তাদের ঐ বোঝাগুলো বইতে হবে না।

অবশেষে একটা সমঝোতা হল, আমরা আবার রওনা হলাম। বড় অভিযানে যেমন করা হয়, সমগ্র দলটি দুটো ভাগে ভাগ করা হল। প্রথমদিন একদল মালবাহক এগিয়ে গেল এবং সে দলের দায়িত্ব নিতে হল আমাকে। দ্বিতীয় দিন যে দল রওনা হল তার দায়িত্বে রইল মেজর উইলি। তিনি সুন্দর নেপালী বলতে পারেন এবং মানুষটি বেশ হাসিখুশি। কিন্তু ঝামেলা লেগেই থাকল। মালবাহকেরা আজ একটা বিষয়ে অভিযোগ করে তো পরের দিন অন্য ব্যাপারে, এর কোনওটা সত্যিই যুক্তিসঙ্গত আবার কোনওটা একেবারেই অযৌক্তিক। আমি স্পষ্ট ভাষায় তাদের অন্যায় আবদারের প্রতিবাদ করতাম। একদিন শেরপারা খাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ দেখাল। তাদের কথা হচ্ছে যে সাহেবরা সব সময়েই টিনের খাবার খাবে অথচ শেরপাদের স্থানীয় বাজার থেকে কিনে খেতে দেওয়া হয়। আবার মাঝে মাঝে এমন হত যে তারা কিছুই বলত না, মুখভার করে রাখত। এই রকম অবস্থায় আমি খুব বিরক্ত হতাম। আমার নিজের স্বভাবটা খোলামেলা, প্রাণে যা উদয় হয় মুখ খুলে তাই বলে দিই। আমি চাই অন্যরাও তাই করুক। কোনও কথা না বললে বুঝব কেমন করে যে সমস্যাটা কোথায়?

এই রকম পরিস্থিতিতে দলকে উৎসাহ দেবার জন্যে বলতাম, চল ভাই সব এগিয়ে চল। ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিও না। আমাদের সামনে ঐ দেখ মহান হিমালয়ের উঁচু পাহাড়ের চূড়া, আমাদের আসল উদ্দেশ্য সেই চূড়া জয় করা। এইভাবে কখনও উঁচু কখনও নিচু আবার কখনও বা নদীর চর পার হয়ে আমরা চলেছি। প্রত্যহের নানা সমস্যার মাঝেই হিমালয় আমার মন ও শরীরে তার স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে দেয়। পথ চলতে চলতে মাঝে মাঝে মনে হয়েছে দুর্বল শরীরে আমি বোধহয় একটু বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছি। কিন্তু যত উঁচুতে উঠছি আমার অসুখ যেন কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে। আমি ক্রমশ সুস্থ হচ্ছি, শক্তি ফিরে পাচ্ছি।

যখনই এভারেস্টের কথা মনে পড়ছে, সামনের সেই সংগ্রামের দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে তখনই শেরপা বন্ধুদের নানা বিষয়ে ছোটখাট অভিযোগগুলোকে মুরগীর কিচির মিচির মনে হচ্ছে।

ইংরেজদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভালই। তবে এটা সত্যি যে সেই সম্পর্ক সুইসদের মত বন্ধুত্বপূর্ণ নয়। সুইস ল্যাম্বার্টের সঙ্গে একই তাঁবুতে থাকাটা আমার এবং সুইসদের কাছে কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়। কিন্তু কোনও ইংরেজ আমার সঙ্গে একই তাঁবুতে থাকবে না। সুইসদের মত একে অপরের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করা, কিম্বা খুনসুটি করা ইংরেজদের পক্ষে কখনওই সম্ভব নয়। তবে কর্নেল হান্ট একজন সুন্দর মানুষ এবং নেতা হিসেবে অসাধারণ। এছাড়া হিলারী, যার সঙ্গে আমার অনেকটা সময় কাটে, তার সঙ্গে আমার যথেষ্ট বন্ধুত্ব রয়েছে, অন্যরাও খারাপ নয়।

একথা সত্য যে ইংরেজরা সুইসদের মত প্রাণখোলা এবং মিশুকে নয়। কিন্তু তাতে কি যায় আসে? প্রত্যেক জাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। আমার সঙ্গে তারা কেমন ব্যবহার করছে তার চেয়ে অনেক বড় ব্যাপার হল এভারেস্ট অভিযানে সফল হওয়া। বিক্ষুব্ধ শেরপাদের এটাই বোঝাবার চেষ্টা করি। ২৫শে মার্চ আমরা নামচেবাজার পৌঁছলাম। শেরপাদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। নাচ. গান আনন্দ আর উৎসবের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে ছাং! থামে থেকে আমার মা এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে। তিনি অভিযানের সাফল্য কামনা করে হান্টকে আর্শীর্বাদ করলেন। দার্জিলিং এ আং লামু যা বলেছিল এখানে তিনিও তাই বললেন। আমাকে কাছে টেনে বারবার নিষেধ করলেন দুর্বল শরীরে আমি যেন বেশি ঝুঁকি না নিই। তাঁকে আশ্বস্ত করে বললাম, "আম্মা লা, তুমি চিন্তা কর না। তুমি দেখো এবার যদি সফল হই তবে জীবনে আর এমন ঝুঁকি নিতে হবে না।" সমস্ত হৃদয় দিয়ে চাইছি, তাই যেন হয়!

নামচে থেকে আমরা থায়াংবোচে পৌঁছলাম, এটা আমাদের অস্থায়ী মূল শিবির। সাজ-সরঞ্জাম আর পোশাক নিয়ে সবচেয়ে বড় আকারের আর শেষ ঝামেলাটা এখানেই ঘটল। এখানেই শেরপারা তাদের সাজসরঞ্জাম হাতে পেল। অবশ্য একটাই শর্তে এবং তা হল অভিযানের শেষে সেগুলো ফেরৎ দিতে হবে। এমন একটা শর্তে শেরপারা দারুণ রেগে গেল। আগের সমস্ত বড় অভিযান এমনকি বৃটিশদের ১৯৫১র এভারেস্ট অভিযানেও তারা ব্যক্তিগত সরঞ্জাম এবং পোশাক চিরকালের জন্যে পেয়েছে, কাজেই এই শর্ত তারা কিছুতেই মেনে নিতে রাজী নয়। জন হান্টের যুক্তি হল যে পোশাক এবং সরঞ্জাম সবই দেওয়া হবে তবে তা করা হবে অভিযান শেষে পুরস্কার হিসেবে। শেরপারা জানাল পুরস্কার বা দয়া নয় এটা তাদের পারিশ্রমিকের অঙ্গ। আমার জীবনে কোনও অভিযানে আমি এত খারাপ অবস্থার মধ্যে পড়িনি। শেরপারা ভাবল ইংরেজরা আমাকে অনেক টাকা দিয়েছে, যাতে আমি তাদের এই শর্ত মেনে নিতে রাজী করাই। অন্যদিকে ইংরেজরা মনে করল আমি আন্তরিকভাবে সব কিছু সমাধানের চেষ্টা করছি না, পরোক্ষভাবে শেরপাদের সমর্থন করছি। অবশেষে বিরক্ত হয়ে আমি মেজর উইলিকে বললাম যে আমাকে দেবার জন্যে যে পোশাক এবং সরঞ্জাম আছে তা শেরপাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হোক আর আমি সুইসদের দেওয়া পোশাক

দিয়ে দিব্যি চালিয়ে নেব। কিন্তু এতেও কোনও কাজ হল না। নিঃশর্তে পোশাক না দিলে শেরপারা অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে রাজী হল না। অবশেষে একটা আপোষ রফা হল। কিন্তু দু'জনকে কিছুতেই রাজী করাতে পারলাম না। তদের মধ্যে একজন হল পাশাং ফুটার (জকি) এবং আং দাওয়া। পাশাং আমার সহকারী এবং অত্যন্ত যোগ্য অভিযাত্রী। পাশাপাশি কূটনীতিজ্ঞ। শেরপাদের সঙ্গে যখনই কোনও সমস্যা হয়েছে দেখা গেছে পাশাং কলকাঠি নাড়ছে। ফলে সে চলে যাবার ফলে সব কিছু অনেক সহজ হয়ে গেল। যদিও এই ঘটনায় আমি দুঃখ পেলাম তবু স্বস্তি ফিরে এল। চিরকাল একটা ব্যাপার আমার খুব অপছন্দ, তা হল একটা অভিযানে গিয়ে ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করা। মানুষ যখন পাহাড়ে যায় তখন তার উচিত সব নীচতা বা ক্ষুদ্রতা পিছনে রেখে যাওয়া, বড় অভিযানে বড় মন আর উদার হৃদয় নিয়ে যাওয়া উচিত। নিবিষ্ট মনে আমি জকি আর আং দাওয়ার চলে যাওয়া লক্ষ্য করছি। পাহাড়ী পথ ধরে তারা নামচের দিকে নেমে গেল। তারা চোখের আড়ালে যাবার পর আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। এখন আর কোনও অসন্তোষ নেই। অন্য শেরপারা আপন মনে কাজ করছে, তাদের ভারি ভারি বোঝাগুলো নাড়াচাড়া করছে।

এবার আমি ওপরের শ্বেতশুভ্র হিমালয়ের দিকে তাকালাম। সুউচ্চ আমাডাবলাম এবং তাওচে, ঐ সেই নুপৎসে এবং লোৎসে। তাদের পেছনে এভারেস্ট, সেই পুরাতন চোমোলোংমা তার মাথার হাল্কা ধূমায়িত মেঘের মুকুট পরে মহিমান্বিত। এখন দ্বিধা-দ্বন্দ, সমস্যা আর নীচতা সব অবলুপ্ত। প্রশান্ত, স্নিগ্ধ ঠাণ্ডা বাতাস এসে আমার শরীরে মায়ের স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে দিল, তেনজিং ভাল থেক! পৃথিবীর কোনও কিছুতেই আমার আকর্ষণ নেই। আমার হৃদয় স্বপ্নে বিভোর—সামনের ঐ আহ্বান।

—সবকুছ ঠিক হ্যায়। চল বন্ধু এগিয়ে চল। আমি বিড় বিড় করি। উঠে এস, একেবারে ওর চূড়ায় কারণ এটা তোমার সপ্তমবারের চেষ্টা।

—এই সেই সন্ধিক্ষণ....।

সপ্তম এভারেস্ট অভিযান

সারাদিন শেরপারা কোনও না কোনও কাজে ব্যস্ত। এরই ফাঁকে চলে নিজেদের মধ্যে আলাপন, কখনও নেপালী আবার কখনও বা অল্প একটুখানি ইংরেজী। এছাড়া নিজেদের মাতৃভাষা তো আছেই।

—"চল ভাই সব মাল ওঠাও, এগিয়ে চল।"

—"লেকিন হোসিয়ার, ইয়ে বহুত বড়া সফর....।"

—"আরে দারুণ দিয়েছিস্....দেখেছিস্ কেমন শক্তি।"

—"ওরে বাবারে! মালের ভারে এখানেই আমার দফারফা।"

—"কৈ চৈ না.... এটা কোনও ব্যাপারই নয়।"

কথাবার্তা চলছে আর জাতের স্বভাব অনুযায়ী কারণে অকারণে থুথু ফেলছে।

একটু হয়ত বিরতি, আবার কথা, আবার থুথু ছিটানো এবং পাহাড়ে চড়া—শুধুই উঠে যাওয়া।

কঠিন পরিশ্রম আর লম্বা সফর, সারাদিন ওপর নিচ করা। এমন ভারি বোঝা পিঠে নিয়ে হিমালয়ের এই উঁচু চড়াই পথে কে যায় শক্তিমান? নিশ্চয় এরা শেরপা জাতি! শেরপা ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনও মানুষের সাধ্য নেই হিমালয়ের আবহাওয়া আর উচ্চতায় এমনভাবে পরিশ্রম করার। তাই শরীরের ক্লান্তি দূর করতে, মনটাকে তাজা রাখতে এই নিঃসীম শূন্যতায় আর নিস্তব্ধতায় ঠাণ্ডার বিরুদ্ধে লড়াই করতে তারা নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা ইয়ার্কি করছে, অকারণে হেসে উঠছে—আর অভ্যাসমত (অবশ্যই বদ অভ্যাস) থুথু ফেলছে।

—"আম কি উকম—নিজের রাস্তায় চল।"

—"আমি কি তোমায় সাহায্য করব?"

—"এখন কি সব ঠিক আছে?"

—"আচ্ছা, তুজি চে...। তোমাকে ধন্যবাদ।"

—"খুব কঠিন—(তোই-ই)—সাবধান।"

—"সাবাস! কি দেখালিরে ভাই।.. এটা তোর পক্ষেই সম্ভব।"

—"এখন দরকার একটু ছাং....তাহলেই শরীর গরম হবে।"

—"তাসি দিলাই। তোদের সকলকে ধন্যবাদ।"

—"শেরপা জিন্দাবাদ।"

এভাবেই চলছে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত, ক্লান্তিকর ওঠা নামা আর মনটাকে তাজা রাখতে অকারণে বকবক করা।

থায়াংবোচে থেকে সরাসরি মূল শিবিরে না গিয়ে আমরা ছোট ছোট তিনটে দলে ভাগ হয়ে আশপাশের পাহাড়গুলোতে আরোহণ অভ্যাস করতে লাগলাম। এটা ছিল দলনেতা কর্ণেল হান্টের পরিকল্পনা। তিনি চেয়েছিলেন দলটি আসল অভিযান শুরু করার আগে এই আবহাওয়া এবং উচ্চতায় নিজেদের তৈরি করে নিক। এছাড়া এতে সাজসরঞ্জামের ব্যবহারিক ক্ষমতা

সম্বন্ধেও একটা পরীক্ষা হবে। যে দলটিতে আমি ছিলাম সেখানে ছিলেন লোয়ে, গ্রেগরী, পাঁচজন শেরপা এবং দলনেতা নিজে। নুপৎসে হিমবাহের সতেরো হাজার ফুট উচ্চতায় তাঁবু লাগিয়ে আমরা এক সপ্তাহ ধরে বরফে সিঁড়ি বানানো, দড়ি লাগানো এবং অক্সিজেন যন্ত্রপাতির ঠিকঠাক ব্যবহার অভ্যাস করলাম। এক সপ্তাহ অভ্যাস করার পর শিবিরে ফিরলাম। এবার শুরু হল মূল অভিযানের প্রস্তুতি। খুম্বু হিমবাহের সেই বরফের দেওয়ালের কাছে মূল শিবির লাগানো হল, আগের দুটো অভিযানেও এখানেই মূল শিবির ছিল।

পাশাং ফুটার চলে যাবার পর থেকে সাহেবদের সঙ্গে শেরপাদের সম্পর্ক অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল। তবে সম্পর্ক আগের চেয়ে স্বাভাবিক হলেও সমস্যা একেবারে মিটে যায়নি। মাঝে মধ্যেই ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে গণ্ডগোল দেখা দিত। সাহেবরা ঠিক করল মূল শিবির থেকে পরবর্তী শিবিরে যাবার জন্যে প্রত্যেক শেরপাকে যাট পাউন্ড মাল বইতে হবে। শেরপারা জানাল ঐ উচ্চতায় চল্লিশ পাউন্ডের বেশি মাল বহন করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে বিরোধ দেখা দিল, দুপক্ষই নিজেদের দাবিতে অনড়। অবশেষে আমি এই বলে মিটমাট করে দিলাম যে তারা পঞ্চাশ পাউন্ড মাল বইবে। ইংরেজরা বরফের ফাটল অতিক্রম করার জন্যে দেশ থেকে অ্যালুমনিয়ামের মই নিয়ে এসেছে। আমার ইচ্ছে যে মূল শিবির থেকে কাঠের তক্তা নিয়ে যাওয়া হোক। এই বিষয়ে আমার সঙ্গে সাহবেদের বেশ কিছুটা তর্ক হয়ে গেল। ধাতুর মই ওজনে হাল্কা এবং নিয়ে যাওয়া সুবিধে কিন্তু তুষার ফাটল সংখ্যায় অনেক, ফলে মই বারবার এপাশ ওপাশ করতে অনেক সময় নষ্ট হবে। কিন্তু কাঠের তক্তা দিয়ে সেতু বানালে সেগুলো অভিযানের পুরো সময়টাই রেখে দেওয়া যাবে। আমার যুক্তির বিরুদ্ধে তাঁদের যুক্তি হল যে কাঠের তক্তাগুলো নিয়ে যেতে বেশি লোক লাগবে যেটা যথেষ্ট খরচ সাপেক্ষ। আম জানালাম যে যদি আমরা সাফল্য চাই তবে এটুকু মেনে নিতেই হবে। অবশ্য শেষ অব্দি যুক্তিটা তারা বুঝল এবং আমার কথা মেনে নিল।

অভিযানের এই পর্যায় থেকে ইংরেজদের সঙ্গে শেরপাদের সম্পর্ক ভালই। এত বড় একটা অভিযানে কাজকর্ম যেভাবে চলেছে তাকে এক কথায় বলা যায় —সুন্দর! আমাদের দলনেতা, যাঁকে আমরা কর্নেল সাহেব বলে ডাকতাম, যদিও তিনি মাঝে মাঝে দলটিকে সৈন্যবাহিনীর মত শৃঙ্খলা মানতে বাধ্য করতেন, তবু তিনি মানুষটি ছিলেন সুন্দর এবং বিবেচক স্বভাবের। হয়ত শেরপারা আর একটু খোলামেলা সহজ আবহাওয়া বেশি পছন্দ করত। তবু নিন্দুকদেরও স্বীকার করতে হয় অভিযানের কাজ বেশ ভাল চলছিল। ট্রান্সপোর্ট অফিসার হিসেবে মেজর উইলি খুব ভাল কাজ দেখিয়েছেন এবং অন্য অভিযাত্রীদের ব্যবহারও যথেষ্ট ভাল। শুধুমাত্র সত্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করে রাখার স্বার্থেই আমি ছোটখাট অসুবিধেগুলো উল্লেখ করলাম, (ইতোমধ্যেই এসব নিয়ে অনেক উল্টোপাল্টা কথা হয়েছে) অভিযানের বন্ধু এবং সহযাত্রীদের অভিযুক্ত করার জন্যে নয়। ঝামেলাগুলো কেটে যাবার ফলে আমার চেয়ে খুশি কেউ হয় নি, কারণ সর্দার অভিযাত্রী হিসেবে আমাকে সবসময়েই মধ্যস্থতা করতে হয়েছে, এবং আমার পক্ষে বিষয়টা সর্বদা সুখের হয়নি।

একটা বড় অভিযানের ব্যস্ততম স্থান হল মূল শিবির। নিচে থেকে মালপত্র এখানে আসছে

আবার এখান থেকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়ে ওপরের শিবিরে পাঠানো হচ্ছে। অভিযানের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত লোকজন ছাড়াও এক এক সময় নিচে থেকে আসা শেরপা আর শেরপানীদের ভিড়ে মূল শিবির একটা ছোটখাট শহরের চেহারা নিচ্ছে। বরফের দেওয়ালের কাছে পৌঁছে আসল অভিযান শুরু হল। সেখানে হিলারীর নেতৃত্বে যখন একদল রাস্তা তৈরির কাজে ব্যস্ত তখন আমি এবং মেজর উইলি বিপুল পরিমাণ মালপত্র, সাজসরঞ্জামের দায়িত্বে হিমশিম খাচ্ছি। বোঝাগুলো হিসেব করে শেরপাদের দিচ্ছি এবং সেগুলো ঠিকমত পৌঁছেছে কিনা তার তদারকি করছি। এই বিরাট দলের প্রত্যেকেই কোনও না কোনও কাজে ব্যস্ত। প্রত্যেকের নিজস্ব কাজ রয়েছে। কেউ রাস্তা বানাচ্ছে, কেউ ওপরের শিবিরে মাল পাঠাচ্ছে, আবার কেউ অক্সিজেন যন্ত্রপাতি ঠিক করছে, এমনি আরও টুকিটাকি কত কাজ! এছাড়া বেতার বার্তার তদারকি, ফটো তোলা, চিকিৎসা সংক্রান্ত খুঁটিনাটি সব বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হচ্ছে। এরই মধ্যে নিয়মমাফিক ডাক্তারি পরীক্ষার সময়ে দুর্ভাগ্যক্রমে অত্যন্ত অভিজ্ঞ শেরপা গিয়ালসেনের হার্টে একটা অস্বস্তির কথা জানা গেল। ডাক্তারের নির্দেশে তাকে নামিয়ে দেওয়া হল। জকি এবং আং দাওয়ার পর এই নিয়ে আমরা তিনজন অভিজ্ঞ শেরপার সাহায্য থেকে বঞ্চিত হলাম। তবু ভাল এর মধ্যে দাওয়া থোন্ডুপ মূল শিবিরে পৌঁছে গেল। আমরা শোলো খুম্বু থেকে কিছু নতুন শেরপাকে দলে নিয়েছি মাল বইবার জন্যে। এখন সব মিলিয়ে প্রায় চল্লিশজন মালবাহক আমাদের দলে রয়েছে। আশা করা যায় যে তাদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ ওয়েস্টার্ন কুম-এরও পরের শিবিরগুলোতে মাল পৌঁছতে সক্ষম হবে।

মূল শিবিরে সপ্তাহে একবার করে চিঠি আসত। এর মধ্যে আং লামু এবং মিত্রবাবুর কাছ থেকে চিঠি পেলাম। চিঠি পড়ে আমি বিশেষ উৎসাহ পেলাম না। মিত্রবাবু লিখেছেন যে আমি চলে আসার পর কথামত তিনি একটা সভা ডেকেছিলেন কিছু টাকা পয়সা সংগ্রহ করার জন্যে। সভায় অনেকেই অনেক ভালভাল কথা বলেছেন কিন্তু বাস্তবে কিছুই হয়নি। এই ব্যর্থতায় আং লামু খুব মুষড়ে পড়েছে। তার চিঠির প্রতি ছত্রে উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা। মেয়েদের ভবিষ্যৎ, আমার নিরাপদে ফিরে আসা, আর্থিক অনটন এমনই হাজার কথা। টাকা, টাকা আর টাকা—এই সমস্যার হাত থেকে কি মুক্তি নেই? অর্থের চিন্তা আমাকে বোধহয় পাহাড়ের মাথা পর্যন্ত তাড়া করবে। কিন্তু আমি কি করব? তার চেয়ে এই ভাল, মনকে সকল চিন্তা থেকে মুক্ত রাখা। একথা শুনে হয়ত অনেকেই আমায় স্বার্থপর ভাববে কিন্তু পর্বতারোহণে এসে আমি সকল চিন্তা থেকে মুক্তি পাই। অর্থের চিন্তা, বাড়ির কথা, বেঁচে থাকার সমস্যা কিছুই মনে থাকে না—আমার মাথায় তখন একটা চিন্তা আর তা হল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা সামনের ঐ পাহাড়। হাতে চিঠি নিয়ে এই মূল শিবিরে বসে আছি, আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এভারেস্ট। আমাকে এভারেস্ট আরোহণ করতেই হবে।

আগের অভিযানে যে রাস্তা বানানো হয়েছিল এবার তার থেকে একটু দূরে রাস্তা তৈরি করা হল, এমনটা করার কারণ, বরফের অবস্থান, চেহারা আর চরিত্র প্রতিনিয়ত বদলে

যাচ্ছে। রাস্তার নিশানা ঠিক রাখার জন্যে বড়বড় লাঠির মাথায় রঙীন ফ্লাগ লাগিয়ে পুঁতে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বরফের ধাপ কাটা, দড়ি লাগানো এসব কাজও চলছে। বরফের ফাটল পার হবার জন্যে কাঠের তক্তার সাহায্যে সেতু তৈরি হয়েছে, পাশাপাশি দড়ির এবং ধাতুর মই বরফের দেওয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাস্তা তৈরি হলে শেরপাদের লম্বা লাইন পিঠে ভারি বোঝা নিয়ে এক নম্বর থেকে দু'নম্বর শিবিরে এবং সেখান থেকে কুমের নিচে তিন নম্বর শিবিরে যাত্রা করছে। বসন্তের গোড়ায় আবহাওয়া যেমন থাকার তেমনই আছে। সকালে রৌদ্রোজ্জ্বল ঝকঝকে আকাশ, বিকেলের দিকে হাল্কা মেঘ আবার কখনও সামান্য তুষার পাত হচ্ছে। কনকনে ঠান্ডা কিম্বা ভয় জাগানো তুষার ঝড় এগুলো একেবারেই নেই গতবারের শরৎকালে সুইসদের সঙ্গে অভিযানে যে ঠান্ডা এবং ঝড় সহ্য করতে হয়েছে সেটাকে এখন দুঃস্বপ্ন মনে হচ্ছে। আমাদের কাজের যে পদ্ধতি ঠিক হয়েছে সেটাও চমৎকার। প্রত্যেকেই পর্যায়ক্রমে কঠিন পরিশ্রমের পরেই হাল্কা কাজের সুযোগ পাচ্ছে। এছাড়া কয়েকদিন পরপর একটা করে দলকে নিচে মূল শিবিরে এমন কি আরও নিচে যেখানে কিছু কিছু সবুজের দেখা মেলে সেই লোবুচেতে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যুগপৎ বিশ্রাম নেওয়া এবং একঘেয়েমি থেকে বিরাম দেবার জন্যে। আর এই পদ্ধতিতে আমরা সুন্দর ফল পেয়েছি, প্রত্যেকেই তরতাজা অনুভব করছে। গতবারে সুইসদের পক্ষে এই পদ্ধতিতে অভিযাত্রীদের সুস্থ রাখা সম্ভব হয়নি, শীত এসে যাবার ভয় দলটাকে সর্বদাই তাড়া করে গেছে।

এদিকে শীর্ষারোহণের জন্যে কর্নেল হান্ট যে পরিকল্পনা করেছিলেন, সেটা একদিন আমাদের কাছে ব্যক্ত করলেন। আমাকে কথা দেওয়া হয়েছিল, সুস্থ থাকলে আমাকে শীর্ষারোহণের সুযোগ দেওয়া হবে। নিয়মমাফিক ডাক্তারি পরীক্ষায় কদিন আগেই দেখা গেছে যে দলের মধ্যে শারীরিক ভাবে আমি সর্বাপেক্ষা সুস্থ। কাজেই আমি যে সুযোগ পাবই এটা নিশ্চিত ভাবেই ধরে নিয়েছিলাম। প্রথম দলে ডঃ ইভান্স এবং বরডিলনের নাম ঘোষণা করা হল। তারা ব্যর্থ হলে দ্বিতীয় দলে আমি এবং হিলারী। আর আমরাও যদি ব্যর্থ হই তবে আরও একটা দল ঠিক করা হবে কিন্তু সেটা ভবিষ্যতের কথা; সেই সময় ভেবে চিন্তে পরিস্থিতি অনুযায়ী করা হবে। তবে আমাদের মনে হয় তার কোনও প্রয়োজন হবে না। দল ঘোষিত হবার পর আমি মনে মনে দারুণ খুশি হলাম। সেই মুহূর্তে আমার চেয়ে সুখী মানুষ পৃথিবীতে আর কেউ ছিল না। তাই বলে অন্য শেরপাদের মধ্যে একই রকম প্রতিক্রিয়া হল না। তারা ব্যাপারটা অন্যভাবে নিল। ওদের কারও এভারেস্ট আরোহণের ইচ্ছে ছিল না, এবং আমার ইচ্ছের কথা তারা অনুভবও করতে পারত না। তারা বলল, আউ তেনজিং (আউ মানে কাকা, আমাদের জাতির কাছে খুবই সম্মানজনক সম্বোধন। ইদানিং শেরপারা আমাকে আউ সম্বোধন করতে ভালবাসে। তবু আমাকে আউ বলে সম্বোধন করলে সব সময়ে আমার ভাল লাগেনা, নিজেকে কেমন বয়স্ক মনে হয়) তুমি কি পাগল? এমন এক ঝুঁকি নিতে গিয়ে তোমার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে আনিকে (কাকিমা) আমরা কিভাবে মুখ দেখাব?

—"বুড়ি ঠাকুমার মত কথা বোল না।" আমি ঝাঁঝিয়ে উঠি।

—"আচ্ছা মনে কর সবকিছু সুন্দরভাবে সমাপ্ত হল এবং তুমি এভারেস্ট আরোহণ করলে।

সেটাও কি খুব ভাল হবে?" তারা সংশয় প্রকাশ করল।

—"কারণ একবার এভারেস্ট আরোহণ করতে পারলে তুমি বিখ্যাত লোক হয়ে যাবে তোমার জীবনধারা বদলে যাবে, হয়ত আমাদের সঙ্গে আর মেলামেশা করবে না। এছাড়া এভারেস্ট আরোহণ সফল হলে আর কেউ এদিকে আসবে না। আমাদেরও আর ডাকবে না।" তারা ব্যাখ্যা করে বোঝাবার চেষ্টা করে।

—"তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? যে ব্যাপারটা তোমরা একেবারেই বুঝছ না সেটা হল একবার এভারেস্ট আরোহণ সফল হলে খবরটা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে যাবে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আরও বেশি বেশি সংখ্যায় পর্বতারোহীরা এর প্রতি আকৃষ্ট হবে।" নাঃ ওদের সঙ্গে তর্ক করে কোনও লাভ নেই।

তখন থেকে আমি এবং হিলারী একটা জুটি বানিয়ে নিলাম। আমরা সবসময়ে এক সঙ্গে থাকতাম। আমাদের কোনও ভারি কাজ দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। এখন আমাদের একটাই কাজ, নিজেদের যথেষ্ট সুস্থ এবং সতেজ রাখা। অন্যরা যখন লোৎসের দেওয়ালে রাস্তা বানাবার জন্যে কঠিন পরিশ্রম করছে আমরা তখন হাল্কা মাল নিয়ে মূল শিবির থেকে কুম পর্যন্ত ওঠানামা করছি। অক্সিজেন সরঞ্জামগুলো নাড়াচাড়া করে ব্যবহারটা ভালমত শিখে নিলাম যাতে ঠিক সময়ে সহজেই ব্যবহার করতে পারি। এছাড়া চলল দুর্গম রাস্তা এবং বরফ ধসের এলাকাতে অপেক্ষাকৃত তরুণ এবং অনভিজ্ঞ শেরপাদের সাহায্য করা। এইসময়ে আমি এবং হিলারী যে কতবার ওপরের শিবিরে উঠে আবার নেমে এলাম তা গুণে বলা যাবে না। একদিন মূল শিবির থেকে চার নম্বর শিবিরে উঠে আবার ঐ দিনেই নেমে এলাম। শরীর যথেষ্ট সুস্থ এবং প্রয়োজনীয় শক্তি না থাকলে এমন কঠিন পরিশ্রমের কাজ করা সম্ভব হত না। হিলারী একজন দক্ষ পর্বতারোহী, তুষার এবং বরফে অরোহণ করতে সে খুবই নিপুণ, আর এটা সে নিউজিল্যান্ডের পাহাড়ে যথেষ্ট অভ্যাস করেছে। তার সহ্য ক্ষমতা প্রচুর এবং মানুষটা শক্তিমান। ইংরেজদের মত সেও কম কথা বলতে ভালবাসে, মেজাজটা ভাল, বেশ হাসিখুশি। শেরপাদের মধ্যে সে বেশ ভাল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, সকলের সঙ্গে মেলামেশা করা আর খাবারদাবার পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ করে খাওয়া এই গুণগুলো তাকে সকলের কাছে প্রিয় করে তুলেছে। আরোহণের সাথী বা জুটি হিসেবে আমরা সকলের কৌতুকের বিষয় হয়ে উঠেছিলাম। হিলারী ছ'ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা আর আমি তার চেয়ে সাত ইঞ্চি কম, দুজনে যখন এক সঙ্গে হাঁটতাম তখন সেটা বেশ মজাদার দেখতে লাগত। তবে বেঁটে এবং লম্বা এই ব্যাপারটি আমাদের একসঙ্গে আরোহণের ক্ষেত্রে সমস্যার কারণ হয়নি। বরং শক্তিশালী এবং আত্মবিশ্বাসী জুটিই হয়ে উঠেছিলাম আমরা।

বরফের দেওয়ালের নিচের দিকে আমরা যখন আরোহণ অভ্যাস করছি সেই সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটল। বিকেলবেলা আমরা দুজন পরস্পরের সঙ্গে দড়িতে বাঁধা অবস্থায় দু'নম্বর শিবির থেকে এক নম্বর শিবিরে নেমে আসছি, হিলারী সামনে আর আমি পেছনে। হঠাৎ পায়ের নিচে বরফ ধসে গিয়ে হিলারী চোরা তুষার ফাটলের মধ্যে পড়ে গেল। পড়তে পড়তে সে আমার নাম ধরে চিৎকার করে উঠল। ভাগ্যক্রমে আমাদের দুজনের মধ্যে

অব্যবহৃত দড়ি কম ছিল, চিৎকার শুনেই আমি বরফে আইস এ্যাক্স বা তুষার গাইঁতি গেঁথে দিয়ে তার সঙ্গে বাড়তি দড়ির প্রান্ত জড়িয়ে দিয়েই বরফে শুয়ে পড়লাম। মাত্র পনের ফুট নিচে হিলারী দড়ির টানে আটকে গেল। একটু সামলে নিয়ে আমি ঝুলন্ত হিলারীর সঙ্গে বাঁধা দড়ি ধরে টানতে শুরু করলাম। ধীরে ধীরে সে উঠে এল। উঠে এসেই সে আমায় কৃতজ্ঞ স্বরে বলল, "সাবাস তেনজিং!" যদিও দড়ির টানে আমার দস্তানা ছিঁড়ে হাতে কয়েকটা ফোস্কা পড়ে গেল কিন্তু হিলারীর কোনও ক্ষতি হয়নি। শিবিরে ফিরে কৃতজ্ঞচিত্তে হিলারী অন্যদের জানাল, "যদি তেনজিং না থাকত তবে নির্ঘাৎ আমার মৃত্যু হত।" আমার সম্বন্ধে এমন প্রশংসার কথা শুনে আমি মনে মনে খুশি হলাম, যাক্! তাহলে সত্যিই আমি একটা বাহাদুরী কাজ করেছি, যদিও কাজটা সত্যিসত্যি তেমন কিছু ছিল না। অবশ্য পর্বতারোহণে যে কোনও সময় বিপদ ঘটতে পারে একথা জেনেই প্রত্যেক অভিযাত্রীর উচিত সদা সতর্ক থাকা, যাতে নিজের অথবা সহ অভিযাত্রীর কোনও বিপদ না ঘটে।

গতবারের অভিযানে সুইসরা যেখানে শিবির করেছিল কুমের সেই এলাকায় আমরা পর্যায়ক্রমে তিন, চার এবং পাঁচ নম্বর শিবির স্থাপন করলাম। শরৎকালের সেই তাড়াহুড়োর দিনগুলোতে ঠান্ডা আর হাওয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্যে সুইসরা যখন পাহাড় ছেড়ে পালিয়ে আসছিল তখন তারা চার নম্বর শিবিরের আশেপাশে প্রচুর খাবাব দাবার এবং বেশ কিছু পর্বতারোহণের সরঞ্জাম ফেলে এসেছিল। একটু খুঁড়তেই আমি সেগুলো খুঁজে পেলাম। এবারের অভিযানে আমরা মূল শিবিরে যেমন ফেলে যাওয়া প্রচুর জ্বালানি কাঠ পেলাম শিখরের কাছে পেলাম আংশিক ব্যবহৃত অক্সিজেন ট্যাঙ্ক, তেমনি চার নম্বর শিবিরের মালপত্র পেয়েও বিশেষ উপকৃত হলাম। এছাড়াও আমার কাছে গতবারের সাজসরঞ্জাম তো ছিলই। আমি সব সময়েই সুইসদের সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করা বেশি পছন্দ করতাম কিন্তু তাই বলে বৃটিশদের নিয়ে আসা মালপত্রের গুণগত মান মোটেই খারাপ নয়। তবে জুতোর ক্ষেত্রে সুইসদের জলনিরোধক জুতোর কোনও তুলনা নেই। এই জুতোতে চামড়ার ওপর একটা জলনিরোধক আস্তরণ আছে যা বৃটিশ জুতোয় নেই। সুইস জুতো পরে আমি অনেক আরাম পাই এবং খুব ঠান্ডাতেও পা গরম থাকে। আর তেমনি ভাল সুইশদের তৈরি তাঁবুগুলো, যেন চলমান বাড়ি।

শরীরটাকে ঠিক রাখবার জন্যে আমি আর হিলারী যখন কুমের আশেপাশে নানা কাজে নিজেদের ব্যস্ত রাখছি, অন্য অভিযাত্রীরা শেরপাদের সঙ্গে নিয়ে সাউথ কল পর্য্যন্ত রাস্তা তৈরিতে ব্যস্ত। গত শরতে সুইসরা কুম থেকে সাউথ কলের মধ্যে লোৎসের দেওয়াল এবং জেনিভা স্পারের ওপরে মোট দুটো শিবির স্থাপন করেছিল। বৃটিশরাও দুটো শিবিরই স্থাপন করল। এই কাজটুকু করতে তিন সপ্তাহ সময় লেগে গেল। ক্রমশ উচ্চতা বাড়ছে, সদস্যদের কাজ করার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে, এবং একটুতেই বেদম হয়ে পড়ছে। এটা সব সময়ে লক্ষ্য করা গেছে, উচ্চতা কোনও কোনও মানুষকে খুব কাহিল করে দেয়। বৃটিশ দলের দুজন নবীন সদস্য মিচেল ওয়েস্টম্যাকট এবং জর্জ ব্যান্ড উচ্চতা জনিত অসুবিধেয় এতটাই অক্ষম হয়ে

গেল যে বাধ্য হয়ে তাদের নামিয়ে দিতে হল। তরুণ অভিযাত্রীদের ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার প্রায়ই লক্ষ্য করা গেছে যে তারা যতই ভাল এবং দক্ষ পর্বতারোহী হোক না কেন, যতই শক্তিশালী হোক না কেন, জীবনের প্রথম অভিযানে উচ্চতাজনিত অসুস্থতা তাদের কাহিল করে দেয়। এটাই ঘটল ওয়েস্টম্যাকট এবং জর্জ ব্যান্ডের ক্ষেত্রে। অভিজ্ঞ এবং অপেক্ষাকৃত বয়স্করা উচ্চতাজনিত অসুস্থতায় কম কাহিল হয়।

পৃথিবীতে এমন মানুষ জন্মায়নি যে এভারেস্টের মত বড় মাপের পর্বত অভিযানে গিয়ে কোনও না কোনও সমস্যায় পড়েনি। তা সে শারীরিক হোক অথবা মানসিক দুর্ভোগ হোক, এভারেস্টের যত উঁচুতে ওঠা যায় প্রকৃতির নানা বিরুদ্ধতায় জীবন ততই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। পরিশ্রমে শরীর নুয়ে পড়ে যখন একটু বিশ্রাম চাইবে তখনই (অল্প বিরতিতে) কনকনে ঠান্ডা হাড়ের মধ্যে সেঁধিয়ে যাবে। সুতরাং বিশ্রামের কোনও সুযোগ নেই। আবার হয়ত সারাদিন গোঁয়ার ঝড়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে মন বিকল হয়ে গেল। মাথায় যন্ত্রণা, গা বমি ভাব, হজম না হওয়া, একটুতেই হাঁপিয়ে পড়া—শরীর নিয়ে একেবারে জেরবার! এর সঙ্গে আছে সুদীর্ঘ রাত্রির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দুঃসহ নিদ্রাহীনতা। কিন্তু আশ্চর্যরকম ভাবে এইসব সমস্যা আমার অনেক কম। মনে হয় আমার সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদের ঐ তৃতীয় ফুসফুসটাই সম্ভবত এর কারণ। এই নয় যে পাহাড়ে অন্য সকলের চাইতে আমি বেশি দৌড়তে পারি, তবে এটা বারবরই দেখেছি যে যত উঁচুতে যাই, আমি যেন বেশি ভাল থাকি। আমার এই স্বাভাবিক সুস্থতা বজায় রাখা এবং কর্মক্ষম থাকার পেছনে যে কারণ, তা হল আমি সবসময় কোনও না কোনও কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকি। কখনও তাঁবুর দড়ি ঠিক করি, আবার কখনও বা সাজসরঞ্জাম নিয়ে নাড়াচাড়া করি। সময়ে অসময়ে বরফগলিয়ে জল তৈরি করে সকলকে পান করতে দেওযা আমার শখ। আর যখন কিছুই করার থাকে না তখন পা দিয়ে অথবা হাত দিয়ে বরফের দেওয়ালে আঘাত করি নিজেকে সচল রাখার জন্যে। সব সময় সক্রিয় থাকা, রক্ত সঞ্চালন অব্যাহত রাখা, উচ্চতাজনিত অসুস্থতা থেকে আমাকে মুক্ত রাখে। মাথাধরা, গা বমিবমি করা, কিম্বা ঘুমের জন্যে বড়ি খাওয়া—এগুলো আমার হয়না। ক্বচিৎ কখনও গলায় ব্যথা হলে নুনজলে গার্গল করে ভাল ফল পাই। খিদে না পেলেও জোর করেই কিছু না কিছু খাই। শুকনো হাওয়ার জন্যে ঘন ঘন গলা শুকিয়ে যায় কিন্তু কখনওই তেষ্টা মেটাতে বরফ খাওয়া অথবা ঠান্ডা জল পান করা উচিত নয়। তাতে গলা আরও শুকিয়ে যাবে। সেই সময় গরম জল অথবা কোনও গরম পানীয় উপকারী। এই অভিযানে আমরা গুঁড়ো লেমন জুস গরম জলে চিনি দিয়ে মিশিয়ে ঘনঘন পান করেছি। সেটা এত অধিক মাত্রায় পান করেছিলাম যে ১৯৫৩ সালের বৃটিশ এভারেস্ট অভিযানের নাম হয়ে গেল 'লেমন জুস অভিযান'।

সাউথ কল এবং লোৎসে ঢালের মধ্যে ছয় এবং সাত নম্বর শিবির স্থাপিত হল। সবকিছু ঠিকঠাক চলছে, সকলেই মন দিয়ে কাজ করছে, দিব্যি একটা ছন্দোবদ্ধ অভিযান কিন্তু এরই মাঝে হয়ত কখনও কখনও ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়ে যেত। তখন নড়াচড়া সব বন্ধ, মনে

হত কোথাও কোনও প্রাণের চিহ্ন নেই। তাঁবুর মধ্যে বন্দী থেকে প্রতীক্ষা চলছে কখন ঝড় থামবে। আর এই ভয়ঙ্কর ঝড়ের পর প্রায়ই দেখা যেত মানুষজন ছন্দ হারিয়ে কেমন আগোছাল হয়ে পড়েছে। ঠিক সেইসময় কর্নেল সাহেব দৌড়োদৌড়ি করে কখনও ইংরেজী আবার কখনও হিন্দীতে চিৎকার করছেন লোকজনের কাজের স্পৃহা ফিরিয়ে আনার জন্যে। তবে বেশির ভাগ সময়েই সকল কিছু আপন তালে এগিয়ে গেছে। এর মধ্যে ২০শে মের মধ্যে অগ্রবর্তী দল সাতনম্বর শিবির থেকে সাউথ কলের উদ্দেশ্যে রওনা হবার জন্যে তৈরি। দলে ষোলজন শেরপার সঙ্গে আছেন উইলফ্রিড নয়সি। ২১শে মের খুব সকালে দলটির যখন পথের শেষ অংশটুকু পাড়ি দেবার কথা, ওয়েস্টার্ণ কুমের শিবিরে আমরা সকাল থেকে চোখে দূরবীন এঁটে বসে আছি তদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্যে। চলাফেরা শুরু হল। আমরা বিস্মিত হয়ে দেখি যে মাত্র দুজন রওনা হয়েছে, বাকিদের কোনও খবর নেই। খুব ভাল করে লক্ষ্য করে বুঝলাম দুজনের মধ্যে একজন হচ্ছে নয়সি নিজে এবং অন্যজন দলের প্রধান শেবপা আনুলু। আমরা উদ্বিগ্ন হলাম, তাহলে বাকিদের কি হল? এর মধ্যে কুমের চার নম্বর শিবির—যেখানে আমরা ছিলাম সেখান থেকে ব্যান্ড এবং ওয়েস্টম্যাকট নিচে নামবার জন্যে রওনা দিয়েছে। মেজর উইলি কয়েকজন শেরপাকে সঙ্গে নিয়ে ছ'নম্বর শিবিরে অবস্থান করছিলেন, পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁর দল ও মালপত্র নিয়ে সাত নম্বরের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করলেন। চারনম্বর শিবিরে কর্নেল হান্ট, আমি, ডঃ ইভান্স, বরডিলন, লোয়ে, গেগরী এবং হিলারী এই সাতজন রয়েছি। এর মধ্যে আমি এবং হিলারী, বরডিলন এবং ইভাস শীর্ষারোহণের জন্য চেষ্টা করব এবং বাকিরা আমাদের সাহায্যকারী। কর্নেল হান্ট আমাদের চারজনকে অহেতুক পরিশ্রম করতে দিতে রাজী নয়। কিন্তু সাত নম্বর শিবিরের সমস্যা বোঝার জন্যে কাউকে না কাউকে তো পাঠাতেই হবে। আমি তাঁকে বোঝালাম যেহেতু চিন্তাটা শেরপাদের সম্বন্ধে, কাজেই শেরপা সর্দার হিসেবে আমার যাওযা কর্তব্য। আমি ওপরে যেতে চাই শুনে হিলারীও আমার সঙ্গে যেতে চাইল। অনুমতি পেয়ে আমরা খুশি হলাম। চার নম্বর থেকে সাত নম্বর শিবিরে যাওয়াটা যথেষ্ট পরিশ্রমের কাজ তবু অক্সিজেনের সাহায্যে আমরা দুপুরের মধ্যে সেখানে পৌঁছে গেলাম। এই প্রথম আমাদের এ যাত্রায় কুমের ওপরে যাওয়া। আমরা যাবার আগেই নয়সি এবং আনুলু সাউথকলে মাল পৌঁছে ফিরে এসেছে। এদিকে উইলিও তার দলবল, মালপত্তর নিয়ে ছ'নম্বর থেকে সাত নম্বরে পৌঁছে গেছে। গিয়ে দেখি নয়সির দলের বাকি শেরপারা তখনও তাঁবুর মধ্যে। কারও মাথা ধরেছে, কারও গলায় ব্যথা আর বেশির ভাগকেই পরিশ্রান্ত আর নিরুৎসাহ লাগছে, তবে সেই অর্থে কেউ অসুস্থ নয়। আসলে তাদের মধ্যে একটা ভীতি কাজ করছিল, অনেকেই এর আগে এত উঁচুতে আসেনি। আমি পৌঁছে প্রথমেই জল গরম করে পানীয় তৈরি করে তাদের পান করতে দিলাম, কাউকে কাউকে একটু মাসাজ করলাম আর সকলকেই সাবাসী জানালাম, উৎসাহিত করার চেষ্টা করলাম। দল ধীরে ধীরে চাঙ্গা হয়ে উঠল এবং একসময় তারা এগিয়ে যাবার জন্যে রাজী হয়ে গেল। ঠিক হল পরের দিন তারা মালপত্র নিয়ে কলের উদ্দেশ্যে

রওনা হবে। সে রাত্রে আমরা উনিশ জন কয়েকটা মাত্র তাঁবুতে গুঁড়ি মেরে রাত কাটালাম। ঠিক ছিল পরের দিন তারা যখন কলের উদ্দেশ্যে রওনা হবে আমি আর হিলারী নিচে নেমে যাব কিন্তু আমাদের উপস্থিতি দলটার পক্ষে টনিকের কাজ করেছিল তাই সেই উৎসাহ বজায় রাখার জন্যে ঠিক হল আমি এবং হিলারীও তাদের সঙ্গে কল পর্যন্ত যাব। ঐ দিনই দলটিকে কলে পৌঁছে দিয়ে আমি এবং হিলারী চার নম্বরে ফিরলাম। ঐ রকম একটা উচ্চতায় মাত্র তিরিশ ঘণ্টায় আমরা দু'জন পাঁচ হাজার ফুট আরোহণ করে আবার ফিরে এলাম। কাজটা ক্লান্তিকর হয়েছিল কিন্তু অল্প বিশ্রামের পর আমরা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলাম।

এখন প্রথম দল প্রস্তুত। প্রথম জুটি ইভান্স আর বরডিলন, সঙ্গে সহযোগী হিসেবে যাবে কর্নেল হান্ট এবং কয়েকজন শেরপা। ঠিক হল প্রথম দিন তারা কলে পৌঁছবে এবং দ্বিতীয় দিন শীর্ষারোহণের চেষ্টা করবে। একদিন অপেক্ষা করে দ্বিতীয় দল অর্থাৎ হিলারী এবং আমি রওনা হব। আমাদের সাহায্য করবে লোয়ে, গ্রেগরী এবং কয়েকজন শেরপা। আমরা কলে অপেক্ষা করব, প্রথম দল ব্যর্থ হলে আমরা চেষ্টা করব। অভিযানের শেষে এই 'প্রথম' 'দ্বিতীয়' দল নিয়ে অনেক কথা হয়েছে এবং অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই 'প্রথম দল' এবং 'দ্বিতীয় দল' নিয়ে এই যে বিভ্রান্তি তা যাতে দূর করা যায় সে চেষ্টা আমাকে করতে হবে।

সাফল্য লাভের জন্যে যে পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছিল আমার মনে হয় তার পূর্ণ বর্ণনা দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা যাবে। সাধারণভাবে দেখলে ইভান্স এবং বরডিলনই প্রথম সুযোগ পেয়েছিল। সেই সময় তারা আট নম্বর ক্যাম্পে অর্থাৎ সাউথ কলে অবস্থান করছিল। সেখান থেকে তারা সরাসরি শীর্ষের দিকে রওনা হবে অর্থাৎ সাফল্য পেতে হলে তাদের তিনহাজার তিনশো ফুট আরোহণ করতে হবে। কারণ এর মাঝে কোনও শিবির স্থাপনের পরিকল্পনা ছিল না, আর এক নাগাড়ে ঐ দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে যদি তারা সাফল্য পায় তবে সেটা হবে অবিস্মরণীয় ঘটনা। প্রথম দলকে জন হান্ট নাম দিয়েছিলেন 'পরিদর্শন প্রচেষ্টা' (reconnaissance assault)। তাঁর ইচ্ছে দলটি যেভাবেই হোক দক্ষিণ শীর্ষ পর্যন্ত পৌঁছে শীর্ষে পৌঁছবার রাস্তাটা ভাল ভাবে দেখে আসুক। তারা ব্যর্থ হলে আমার এবং হিলারীর পালা। তখন আমাদের জন্যে একটা বাড়তি সুবিধে থাকবে, তা হল দুটি শীর্ষের মাঝে আর একটা শিবির অর্থাৎ ন'নম্বর শিবির স্থাপন করা হবে। এটাই হবে তখনও পর্যন্ত পৃথিবীর উচ্চতম স্থান যেখান পর্যন্ত মানুষ ওজন বয়ে নিয়ে যাবে। সুতরাং এক অর্থে ইভান্স এবং বরডিলন প্রথম দল হলেও অন্য অর্থে আমি আর হিলারী প্রথম দল। আমাদের দলকে বেশি গুরুত্ব দেবার জন্যেই একটা অনুসন্ধানী দল পাঠানো হল এবং ন'নম্বর শিবিরের বাড়তি সুবিধে দেওয়া হল। এরপর আসছে তৃতীয় দলের প্রশ্ন। আমি আর হিলারী ব্যর্থ হলে তৃতীয় দল পাঠানো হবে, যে দলটা তখনও নির্বাচিত হয়নি, এটাই ছিল সমগ্র পরিকল্পনা। অথচ আমরা সফল হবার পর প্রথম এবং দ্বিতীয় দল নিয়ে কতই না আলোচনা। এমন কথাও কোনও কোনও খবরের কাগজ রটিয়েছে প্রথম দলে সুযোগ না পেয়ে আমি নাকি খুবই ভেঙ্গে

পড়েছিলাম। বাজে কথা!

কর্ণেল হান্ট যে পরিকল্পনা করেচিলেন তা ছিল সুন্দর এবং নিখুঁত। কোনও অভিযাত্রীর তাড়াহুড়ো করে অথবা অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে পর্বতারোহণ করা উচিত নয়, অত্যন্ত ধীর এবং শান্ত হয়ে অন্য সহযাত্রীদের সাহায্য নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। একথা সত্যি যে আমি এভারেস্ট আরোহণ করতে চেয়েছিলাম, আশৈশব আমি এই স্বপ্ন লালন করেছি। তবু যদি অন্য কেউ আমার আগে সুযোগ পেত এবং তার জন্যে আমাকে চরম স্বার্থত্যাগ করতে হত, আমি তাই করতাম এবং সমস্ত পৌরুষ দিয়েই করতাম। কোনও ছিঁচকাঁদুনে বাচ্ছা চেলের মত করতাম না, কারণ এর নামই পর্বতারোহণ। ২৩ তারিখে ইভান্স আর বরডিলন কুমের শিবির থেকে রওনা হয়েছিল আর ২৫ তারিখে আমি এবং হিলারী রওনা হলাম। আটজন দক্ষ শেরপাকে নিয়ে লোয়ে এবং গ্রেগরী আমাদের সঙ্গে চলল। সাউথ কলে শিবির স্থাপনকারী দলের সঙ্গে লোৎসের দেওয়ালে দেখা হল। তারা তখন নিচে নামছে। তারা আমাদের সাফল্য কামনা করে বিদায় নিল। অবশ্য তখনও আমরা শীর্ষে ওঠার সুযোগ পাব কিনা তাই কেউ জানেনা। কারণ আগের দল আগামীকাল শীর্ষের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। আমার আইস এ্যাক্সে আমি চারটি পতাকা বেঁধে নিয়েছি। প্রথম দুটির একটি বৃটেনের দ্বিতীয়টি জাতিসংঘের। ঐ পতাকা দুটি বৃটিশরা সঙ্গে এনেছে। এরপর আছে নেপালের পতাকা, যেটা কাঠমাণ্ডুতে আমাকে উপহার দেওযা হয়েছে এবং চার নম্বর ভারতের জাতীয় পতাকা আমার বন্ধু রবীন্দ্রনাথ মিত্র দার্জিলিং ছাড়ার সময় আমাকে দিয়েছিলেন। ভারতের জাতীয় পতাকা সঙ্গে নেবার সময় আমি কর্নেল হান্টকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে সেটা আমি সঙ্গে নিতে পারি কিনা? তিনি সানন্দে আমায় অনুমতি দিয়েছিলেন। জানিনা আমার সঙ্গের এই চারটি পতাকা শীর্ষে শোভা পাবে কিনা, কারণ আমাদের আগে আছে ইভান্স এবং বরডিলন। ওদের সঙ্গে -ও পতাকা আছে।

আমি এবং হিলারী কদিন আগে প্রথম সাউথ কলে আসবার সময় প্রায় সারাক্ষণই অক্সিজেন ব্যবহার করেছিলাম। এই অভিযানে দু'ধরনের অক্সিজেন সরঞ্জাম ব্যবহার হচ্ছে। প্রথমটা 'ক্লোসড সার্কিট' এতে বিশুদ্ধ অক্সিজেন পাওযা যায় যেটা ইভান্স এবং বরডিলন ব্যবহার করছে। দ্বিতীয়টা 'ওপেন সার্কিট' এই ধরনের যন্ত্রে বিশুদ্ধ অক্সিজেনের সঙ্গে বাতাস মিশ্রিত হয়ে প্রশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে আসে। এটা,আমরা ব্যবহার করছি। অক্সিজেন নেবার সময় খুব সহজে যেমন এতে উপকার পাওয়া যায় না, তেমনি বন্ধ করার সময় অসুবিধেও তত হয় না। আমার তো এটাই বেশি নির্ভরযোগ্য মনে হয়। এছাড়া ওপরের, শিবিরগুলোতে রাত্রে আমরা অক্সিজেন সিলিন্ডার সঙ্গে নিয়ে শুতে যেতাম, অক্সিজেনের অভাবে শ্বাসকষ্ট হলে তা ব্যবহার করতাম। আবার অনেক সময় ঘুম আসতে না চাইলে অক্সিজেন ব্যবহার করতাম। আমরা আরও একটা রাত সাত নম্বর শিবিরে কাটালাম: আজ আর এখানে আগের দিনের মত ভিড় নেই। যারা আছে হয় তারা ওপরের শিবিরে না হয় নিচে। সকালে পরিষ্কার আবহাওয়ায় নীল আকাশের নিচে এসে দাঁড়ালাম।

ওপরে রওনা হবার পরে দূরে দক্ষিণ শীর্ষের নিচে দুটো ছোট কালো বিন্দুর নড়াচড়া লক্ষ্য করা গেল। আমরা নিশ্চিত যে ওরা ইভান্স এবং বরডিলন। একটু পরেই বিন্দুদুটো চোখের আড়ালে চলে গেল। আমরা লোৎসের দেওয়াল বেয়ে জেনিভা স্পারের মাথায় পৌঁছলাম, আর সেখান থেকে কয়েকশো ফুট নেমে এলে সাউথ কল। সাউথ কলে আটনম্বর শিবিরে তখন একজন মাত্র লোক রয়েছে। সে আং তেনজিং যাকে আমরা বালু বা ভল্লুক বলতাম (আমার সমগ্র অভিযাত্রী জীবনে কত বালুই দেখলাম, অবশ্য তাদের চেহারার জন্যেই আমরা তাদের মজা করে বালু বলতাম। যাদের নাম মনে পড়ে তারা হল ল্যাম্বার্ট, টিলম্যান, আং তেম্পা এখন এই আং তেনজিং)। আং তেনজিং আমাদের জানাল যে শরীরটা খারাপ থাকার জন্যে সে কর্নেল সাহেবের সঙ্গে মাল নিয়ে যেতে পারেনি। সে জানাল অনেক সকালে কর্নেল হান্ট দা নামগিয়ালকে সঙ্গে নিয়ে ইভান্স এবং বরডিলনের সঙ্গে গিয়েছেন পিঠে মালের বোঝা নিয়ে। তাঁরা বলে গেছেন যে যতদূর সম্ভব মাল পৌঁছে ফিরে আসবেন। এরপর আর কাউকে দেখা যায়নি। আমরা পৌঁছবার কিছুক্ষণ পরে দেখি কর্নেল হান্ট দা নামগিয়ালকে নিয়ে দক্ষিণপূর্ব গিরিশিরা দিয়ে নামছেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা তাঁদের কাছে পৌঁছলাম। গিয়ে দেখি তাঁরা অসম্ভব ক্লান্ত, একেবারে নিঃশেষিত, বিশেষ করে কর্নেল সাহেব। কোনও মতে তাঁদের একটা তাঁবুর মধ্যে ঢুকিয়ে গরম লেমন জুস পান করতে দিলাম। কোনও মতে কর্ণেল জানালেন যে তাঁরা প্রায় সাতাশ হাজার তিনশো পঞ্চাশ ফুট পর্য্যন্ত উঠেছিলেন। মনে পড়ে গেল আমি এবং ল্যাম্বার্ট গতবছর ওর ঠিক দুশো ফুট নিচে শিবির স্থাপন করেছিলাম। তাঁদের ইচ্ছে ছিল আঠাশ হাজার ফুট পর্যন্ত যাবার কিন্তু তা অসম্বব বুঝে তাঁরা ফিরে এসেছেন। ন'নম্বর শিবিরের যাবতীয় মালপত্র এমনকি নিজেদের অক্সিজেন সিলিন্ডার পর্যন্ত রেখে এসেছেন । তাঁরা এতটা অসুস্থ হতেন না যদি এভাবে অক্সিজেনের সিলিন্ডার রেখে না আসতেন। তাঁদের তাঁবুতে শুইয়ে দিয়ে আমি পর্যায়ক্রমে চা, লেমন জুস এবং অন্য গরম পানীয় তৈরি করে তাঁদের পান করাতে লাগলাম, এই প্রচেষ্টায় তাঁরা ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন। আমার জীবনে এই ক্ষণটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে যখন আমার সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে কর্ণেল সাহেব আমাকে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, "তেনজিং তোমরা এই সেবার কথা আমি জীবনে ভুলব না।"

এরই ফাঁকে ফাঁকে চলছে ইভান্স এবং বরডিলনের খোঁজ। আমি একবার তাঁবুর মধ্যে গিয়ে কর্নেল সাহেব এবং দা নামগিয়ালের শুশ্রূষা করছি আবার বাইরে এসে লক্ষ্য করছি যদি তাদের দেখা পাওয়া যায়। এক ফাঁকে জন হান্ট যখন শুনলেন যে এখনও তাদের দেখা পাওয়া যায়নি তখন বললেন, "আজই এলিজাবেথের রাজ্য অভিষেক উপলক্ষ্যে যদি ওরা শিখরটা জয় করতে পারত!" কথাটা শুনে আমার মাথায় হঠাৎ চিন্তা খেলে গেল, তাহলে কি এই কারণেই দুজন ইংরেজকে প্রথম পাঠানো হয়েছে? পরক্ষণেই ভাবলাম যে আমি আজেবাজে এসব কি ভাবছি। মূলত আমার এবং হিলারীর কথা ভেবেই তিনি ন'নম্বর শিবির পর্যন্ত মাল পৌঁছে দিয়েছেন। এমনকি অক্সিজেন সিলিন্ডার ফেলে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন

আর আমি স্বার্থপরের মত চিন্তা করছি। না, এসব স্বার্থ চিন্তা এভারেস্টের জন্যে নয়। বরঞ্চ আমরা সবাই চেষ্টা করছি যাতে কেউ না কেউ সফল হয়। এবার উন্মুক্ত আকাশের নিচে এসে দাঁড়াই; খুঁজতে থাকি যদি ওদের দেখা পাওয়া যায়।

সাউথ কলের ভয়ঙ্কর হাওয়া আর নিদারুণ ঠাণ্ডা বেশ খ্যাতি (!) অর্জন করেছে। সাথে আছে গভীর রাতের চরাচর বিস্তৃত একাকীত্ব। এবারেও আমরা সেই এলাকায় তাঁবু লাগিয়েছি আগের দুবারে সুইসরা যেখানে লাগিয়েছিল। আমাদের চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সুইশদের পরিত্যক্ত তাঁবুর কাঠামো, কোথাও খাবারদাবার আবার কোথাও অক্সিজেনের সিলিণ্ডার। দেখে মনে হয় যেন কোনও অশরীরী আত্মা এগুলো এখানে রেখে গেছে। এখানে আমরা চারটে তাঁবু লাগিয়েছি। এর মধ্যে তিনটে থাকবার জন্যে। নিচে থেকে প্রায় সাতশো পঞ্চাশ পাউন্ড সাজসরঞ্জাম আর খাবার দাবার আনা হয়েছে। সমস্ত মালটাই এত উঁচুতে বয়ে এনেছে শেরপারা। এরা যে কৃতিত্ব দেখিয়েছে তা অতুলনীয়। এখনও পর্যন্ত সতেরজন শেরপা সাউথ কল পর্যন্ত উঠেছে এদের মধ্যে ছ'জন দুবার। একটা কথা ভুললে চলবে না যে এরা কেউ খালি হাতে ওঠেনি পরন্তু প্রত্যেকে তিরিশ পাউন্ড মাল বয়ে এনেছে এবং অক্সিজেন ছাড়াই। আমার সজাতি এই সমস্ত বীর শেরপাদের জন্যে আমি গর্বিত। শেরপারা এই কৃতিত্ব না দেখালে এত উঁচুতে মাল নিয়ে আসতে না পারলে আমার যারা এভারেস্ট আরোহণের স্বপ্ন দেখি তারা কোথায় থাকতাম? উত্তর একটাই আর তাহলে, নিচে বহু নিচে ঐ মূল শিবিরে। মজার কথা হল যে সব শেরপারা সর্বাপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে বয়জ্যেষ্ঠ দাওয়া থোণ্ডুপ এবং বয়কনিষ্ঠ তোপগে, এছাড়া আনুলু, দা তেনজিং ও আং নরবু। মালপত্র নিয়ে যে সমস্ত শেরপারা ওপরে এসেছে, তাদের মধ্যে প্রথম দলের সঙ্গে আসা দা নামগিয়াস এবং তেনজিং বালুও রয়েছে, নেমে যাবার জন্য প্রস্তুত হল, কারণ এখানে যে কটা তাঁবু আছে তাতে সকলের থাকার ব্যবস্থা হবে না। আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে তারা নিচে নামতে শুরু করল। এখন সাউথ কলে সেরপাদের মধ্যে মোট চারজন রয়ে গেল তারা হল আং নিমা, আং তেম্পা, পেম্বা এবং আমি নিজে। ওরা তিনজন থাকল কারণ হিলারী এবং আমার সঙ্গে ওরা ন'নম্বর শিবির পর্যন্ত যাবে। শুরু হল আমাদের প্রতীক্ষা। বিকেলের পড়ন্ত রোদে দেখি দুটো কালো বিন্দু নিচের দিকে নেমে আসছে। বুঝলাম ওরা ব্যর্থ হয়েছে কারণ সফল হলে এত তাড়াতাড়ি নেমে আসা সম্ভব হত না। নামগিয়াল এবং জন হান্টের ক্ষেত্রে যা করেছিলাম এবারেও তাই করলাম অর্থাৎ আমরা দ্রুত এগিয়ে গেলাম ওদের সাহায্য করার জন্যে। তারা এতই ক্লান্ত যে কথা বলার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে। কোনও রকমে জানাল যে তারা দক্ষিণ শীর্ষে পৌঁছেছিল, শিখর আর মাত্র কয়েকশো ফুট দূরে—এবং এ পর্যন্ত মানুষ এর বেশি উচ্চতায় আর ওঠেনি।

ভেবে দেখলাম ইভান্স এবং রবডিলন হয়ত শিখরে পৌঁছতে পারত, কিন্তু তারা ফিরে এসেছে হয়ত একটা কথাই ভেবে যে সফল হলেও তারা ফিরতে পারত না। আমরা প্রচুর লেমন জুস তৈরি করে ওদের পান করতে দিলাম, তারা এতই তৃষ্ণার্ত ছিল যে এক একজন

প্রায় দুসের করে পানীয় শেষ করল। এরপর তাদের বিশ্রাম করতে দিয়ে আমাদের উৎকণ্ঠা শুরু হল, মনে নানা প্রশ্ন ভিড় করে আসছে কিন্তু তারা একটু সুস্থ না হলে কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারছি না। তারা একটু সুস্থ হলে আমরা তাদের একটার পর একটা প্রশ্ন করতে শুরু করলাম আর তারাও আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল যাতে আমাদের সঠিক তথ্য জানানো যায়। ইভান্স জানাল, "তেনজিং তোমার এবং হিলারী সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট ভরসা আছে। তোমরা নিশ্চয় পারবে, তবে দারুণ কঠিন পথ। ন'নম্বর শিবির থেকেই তোমাদের চার পাঁচ ঘন্টা লাগবে। মাঝেমধ্যে বরফের কার্নিস আর খাড়া দেওয়াল আছে। তোমরা খুব সতর্ক থাকবে। তবে আবহাওয়া ভাল থাকলে তোমরা নিশ্চয়ই সফল হবে। আমি নিশ্চিত যে পরের বছর আর আসতে হবে না।"

ইভান্স আর বরডিলন কঠিন প্রিরিশ্রমে একেবারে শেষ হয়ে গেছে। উঠে বসার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই এছাড়া ব্যর্থতায় ভেঙ্গে পরেছে তারা। তবু তাদের নিজেদের এত দুঃখের মাঝেও আমাদের সমস্ত রকম প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে, উপদেশ দিচ্ছে, সাবধান করে দিচ্ছে আর পুষে রেখেছে এক বুক আশা পরের দলে তেনজিং হিলারী নিশ্চয় সফল হবে। এরই নাম কি পর্বতারোহণ? এইভাবেই পর্বত একজন মানুষের মহত্বের বিকাশ ঘটায়। পরবর্তী পর্যায়ে আমি আর হিলারী কোথায় থাকতাম, যদি না এরা আমাদের এইভাবে সাহায্য করত? ইভান্স আর বরডিলন, জন হান্ট এবং নামগিয়াল না থাকলে আমাদের সাফল্যের জন্যে কে রাস্তা তৈরি করত? লোয়ে, গ্রেগরী, আং নিমা, আং তেম্বা আর পেম্বার মত বীর সৈনিক তাদের আত্মত্যাগের মধ্যে দিযে আমাদের আরোহণের পথ সুগম করেছে। আজ আমাদের সুযোগ এসেছে শুধু এদের তৈরি পথ বেয়ে। হে বন্ধু! তোমাদের হাজার সেলাম!

সেদিন রাত্রে আমরা দশজন তিনটে তাঁবুতে গাদাগাদি করে রাত কাটালাম। ঠিক হল পরের দিন খুব সকালে আমরা রওনা হব। কিন্তু রাত বাড়ার সাথে সাথে আবহাওয়া খারাপ হতে শুরু করল। ঝড়ের গতি বাড়তে বাড়তে হাজার বাঘের গর্জনে পরিণত হল। পরের দিন সকালেও আবহাওয়ার কোনও পরিবর্তন হল না। আমাদের সৌভাগ্য যে আরও একদিন অপেক্ষা করবার মত যথেষ্ট খাদ্য আমাদের সঙ্গে রয়েছে। দুপুরের দিকে বাতাসের বেগ একটু কমল, কিন্তু তখন আর ওপরে রওনা হওয়া যায় না। ইভান্স এবং বরডিলন নিচে নামার জন্যে প্রস্তুত হল। কর্ণেল হান্টের ইচ্ছে ছিল আমাদের প্রচেষ্টার সময়টুকু কলেই থাকবেন, কিন্তু বরডিলন অসুস্থ থাকাতে তিনি তাকে সঙ্গে নিয়ে নামতে শুরু করলেন। আং তেম্পা সুস্থ নয়, সেও গেল ওঁদের সঙ্গে। যাবার আগে ইভান্স বলে গেল, "সাবধান থেক ভাই সব। সাফল্য পেতেই হবে।"

আট নম্বর শিবিরে হিলারী আর আমি। এছাড়া লোয়ে, গেগরী, আং নিমা এবং পেম্বাকে নিয়ে আমরা মোট ছজন। শুরু হল অনন্ত প্রতীক্ষা। লেমন জুস, চা আর কফি তৈরি করে ঘন ঘন পান করছি। খিদে নেই তবু বিস্কুট, ফল এই সব খাবার নিয়ে জোর করে সবাই একটু একটু খেল। এরই মাঝে আবহাওয়া আবার বিগড়ে গেল। ঝড়ের গর্জন কখনও বাড়ছে

আবার কখনও কমছে। ঝড় একটু কমলেই তাঁবু থেকে বের হয়ে তাকিয়ে আছি বরফ সাদা এভারেস্টের দিকে। সাউথ কলে দ্বিতীয় রাত্রি নেমে এল। আবহাওয়া আগের মতই। আমরা তাঁবুতে প্রবেশ করলাম। সাহেবরা ঘুমের বড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ল। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আমি শুয়ে আছি, বাইরে ঝড়ের গর্জন। একান্তভাবে কামনা করছি ঝড় থামুক, যাতে আমরা কাল ওপরে যেতে পারি। এটা আমার সপ্তমবারের এভারেস্ট অভিযান। একজন মানুষের জীবনে যথেষ্ট! আমাকে সফল হতেই হবে...। আর বোধহয় সুযোগ পাব না। সেকেন্ড যায়, মিনিট যায়, ঘন্টার পর ঘন্টা পার হয়ে যায়। অনন্ত প্রতীক্ষা আমার। কখনও তন্দ্রা এসে আচ্ছন্ন করে ফেলে পরক্ষণে জেগে উঠি। আবার আচ্ছন্ন হয়ে যাই.....। চোখের সামনে ভেসে ওঠে কত মানুষের চেনা মুখ, ভুলে যাওয়া কত কথা। কত মানুষ প্রাণ দিল এভারেস্ট অভিযানে, যেন এক যুদ্ধক্ষেত্র। মানুষ একদিন জয়ী হবে। আর যেদিন সে সফল হবে.... ভাবনায় ঘোর লাগে। হঠাৎ প্রফেসর তুচ্চির কথা মনে পড়ে গেল। তুচ্চি বলেছিল, "তেনজিং তোমাকে আমি পন্ডিত নেহেরুর কাছে নিয়ে যাব।" ওপরে যেতে পারলে হয়ত তা সম্ভব হবে! শোলো খুম্বুর কথা, আমার শৈশব আর বাল্যের কথা, আমার ধর্মভীরু পিতামাতার কথা মনে পড়ছে। তাঁরা আমার জন্যে কতদিন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন, আমি ঈশ্বরের কাছে, প্রিয় এভারেষ্টের কাছে প্রার্থনা করি আমাকে সাফল্য দাও। অবশেষে, ঘুম, শান্তির ঘুম নেমে আসে আমার দু'চোখে। স্বপ্ন দেখি ঘুরে বেড়াচ্ছি ইয়াক চারণের ভূমিতে, দৌড়ে বেড়াচ্ছি একটা সাদা ঘোড়ার পিছে। কিছুতেই ধরতে পারছি না ওটাকে। জন্তু জানোয়ারের স্বপ্ন দেখা ভাল নয়, এমনটাই তো শুনেছি শৈশবে। আবার অন্য স্বপ্ন, লম্বা সাদা স্বপ্ন... আকাশের গায়ে...

স্বপ্ন সত্যি হল

আজ ২৮শে মে। এই সেই ২৮শে মে যেদিন ল্যাম্বার্ট আর আমি এভারেস্ট শীর্ষের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলাম আজ থেকে ঠিক এক বছর আগে। সেদিন গিরিশিরার ওপরে আমাদের উচ্চতম শিবির থেকে আমরা চূড়ান্ত সংগ্রামের চেষ্টা চালিয়েছিলাম। এবারে ঠিক এক বছর পরে সেই জায়গা থেকে আমরা একদিনের পথ পেছিয়ে আছি। ভোরের আলো ফুটছে, কিন্তু এখনও সমান বেগে হাওয়া বইছে। সকাল আটটার মধ্যে বাতাসের বেগ কমে গেল, আকাশ পরিষ্কার হচ্ছে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আমরা মাথা নাড়লাম, আমাদের যাত্রা শুরু হল।

গতকাল রাত থেকে পেম্বা অসুস্থ বোধ করছে। ওর পক্ষে ন'নম্বর শিবিরে যাওয়া সম্ভব নয়। আগের দিন ঐ একই কারণে আমরা আং তেম্বার সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়েছি। এখন রইল কেবল আং নিমা। এখন আমাদের তিন জনকে বাকিদের বোঝা বইতে হবে, এছাড়া গতি নেই। ভারি বোঝা নিয়ে আমাদের গতি মন্থর হয়ে পড়বে। নটা বাজবার একটু আগে লোয়ে, গ্রেগরী এবং আং নিমা রওনা দিল। এরা প্রত্যেকেই চল্লিশ পাউন্ড করে বোঝা তুলেছে, এ ছাড়া অক্সিজেন সিলিন্ডার। এরা রওনা হবার ঘন্টাখানেক পরে আমি এবং হিলারী যাত্রা করলাম, আমাদের কাঁধে পঞ্চাশ পাউন্ড বোঝা। সাহায্যকারী দলকে সামনে পাঠিয়ে আমরা একটা বাড়তি সুবিধে পেতে চেয়েছিলাম। সেটা হল বরফে সিঁড়ি বানানো, দড়ি খাটানোর মত পরিশ্রমের কাজগুলো তারা করে রাখবে।

সাউথ কলের পর থেকে আমরা সকলেই অক্সিজেনের সাহায্য নিয়ে উঠছিলাম। ধীরে ধীরে সাউথকলের পাথরের ওপর জমে থাকা বরফের পাতলা আস্তরণে সাবধানে পা ফেলে বরফের ঢালের কাছে পৌঁছলাম। বরফের ঢাল বেয়ে অল্প উঠে একটা খাঁজ বা গলির মত পেলাম। এই খাঁজ বেয়ে উঠলে দক্ষিণ পূর্ব গিরিশিরা। পূর্ব পরিকল্পনা মত অগ্রবর্তীদল বরফে সুন্দর ধাপ কেটে সিঁড়ি বানিয়ে রেখেছে, আমাদের পরিশ্রম অনেক কমে গেল। বেলা বারোটায় গিরিশিরার কাছে এসে আমাদের সঙ্গে দলটির দেখা হল। এখানে, একটু ওপরে, আমাদের রাস্তার পাশে কিছু তাঁবুর খাঁচা দাঁড়িয়ে আছে। আশেপাশে ছড়ানো ছেঁড়া ক্যানভাস। এই সেই স্থান যেখানে গতবছর আমি এবং ল্যাম্বার্ট রাত কাটিয়ে গেছি। এখন পরিত্যক্ত, স্মৃতি ভারাক্রান্ত। সুইস শিবিরের পাশ কাটিয়ে গিরিশিরা বেয়ে আমরা উঠতে শুরু করলাম। চড়াই কঠিন তবে বিপজ্জনক নয়। রাস্তা চওড়া, পাথরের খাঁজে পা দেবার সুযোগ আছে, তবে জমে থাকা বরফকে এড়িয়ে চলতে হচ্ছে। সুইস এলাকা ছেড়ে একশো পঞ্চাশ ফুট উঠে জন হান্ট এবং দা নামগিয়ালের দুদিন আগে রেখে যাওয়া মালপত্রের দেখা পেলাম। তাঁবু, খাবার, অক্সিজেন সিলিণ্ডার এ ছাড়া আরও কিছু মালপত্র রয়েছে। এখন থেকে আমাদের এক একজনকে ষাট পাউন্ড মাল বইতে হচ্ছে।

এবার রাস্তা আরও খাড়াই। আমরা হাঁটছি ধীরে অতি ধীরে, একজনের ঘাড়ে অন্যজনের নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এবার বরফের আস্তরণ মোটা হচ্ছে, পাথর বরফে ঢাকা। আবার

ধাপ কাটা শুরু হল। দলের সামনে থেকে লোয়ে সব সময় বরফে ধাপ কাটার কঠিন পরিশ্রমের কাজ করে যাচ্ছে আর আমরা তাকে অনুসরণ করছি। বেলা দুটো নাগাদ আমরা অসম্ভব ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। তখনই একটা জায়গা দেখে তাঁবু লাগানো দরকার।

মনে পড়ে গেল এরই আশেপাশে একটা জায়গা দেখেছিলাম আগের বছর, যেখানে তাঁবু লাগাবার জায়গা পাওয়া যাবে। জায়গাটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তাই আরও এগিয়ে চল্লাম। এবার আমি সামনে। প্রথমে খানিকটা গিরিশিরা ধরে, পরে একটু বাঁদিকে—বরফের কঠিন ঢাল—আমি সেই জায়গাটা খুঁজছি।

—"হেই, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাদের?" লোয়ে চিৎকার করে।

গ্রেগরী স্মরণ করিয়ে দেয়, "আমাদের কিন্তু ফিরতে হবে।"

আমি উত্তর দিই, "খুব দূর নয় আর পাঁচ মিনিট গেলেই জায়গাটা পাওয়া যাবে।" উঠছি, উঠেই যাচ্ছি। তবু সে জায়গাটার দেখা নেই। এমনি করে কত পাঁচ মিনিট পার হয়ে যায়। আর আমি ক্রমাগত বলে যাচ্ছি —"আর একটু, আর পাঁচ মিনিট।"

বরফে আমাদের জুতোর খচ্‌মচ্‌ শব্দ, আর ভারি নিশ্বাসের ওঠানামা। উঠে চলেছি যেন অনন্ত যাত্রা।

—"আর কতগুলো পাঁচ মিনিট লাগবে বলতে পার?" —বিরক্তি আর ক্লান্তিতে শেষ হয়ে যাওযা আং নিমা চিৎকার করে ওঠে।

বিরক্তির শেষ সীমায় পৌঁছে অবশেষে সেই জায়গার দেখা পেলাম। জায়গাটা কিছুটা সমতল, বরফের দেওয়াল হাওয়া আটকাতে সাহায্য করবে, আমরা পিঠের বোঝা নামালাম। মাল নামিয়ে দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে ওরা তিনজন দ্রুত নামতে শুরু করল, আমরা হাত নেড়ে তাদের বিদায় জানালাম। আমি এবং হিলারী রয়ে গেলাম। এখন আমরা সাতাশ হাজার নশো ফুট উচ্চতায় রয়েছি। পৃথিবীর চতুর্থ উচ্চতম শৃঙ্গ লোৎসকে এখন মাথা নিচু করে দেখতে হচ্ছে। দক্ষিণ পূর্বে মাকালু, তাকেও নিচুতে দেখছি। বহু দূরে পূর্ব প্রান্তে কাঞ্চনজঙ্ঘা ছাড়া সবাই আমাদের থেকে নিচে।

শুধু একটা সাদা গিরিশিরা আমাদের ওপরে আকাশের দিকে উঠে গেছে। একটু বিশ্রাম নিয়ে আমরা পৃথিবীর সর্বোচ্চ তাঁবু খাটানোয় মন দিলাম। প্রথমে আইস এ্যাক্স দিয়ে বরফ কেটে জায়গাটা সমতল করতে সচেষ্ট হলাম। তারপর তাঁবুর খুঁটি, দড়ি আর কাপড় দিয়ে তাঁবু খাটানো। কাজ করতে সমতলের চেয়ে পাঁচ গুণ পরিশ্রম করতে হচ্ছে। অবশেষে যখন তাঁবু খাটানো হল সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আমরা তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করলাম। তাঁবুর মধ্যে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে। ঠান্ডা আছে তবে দস্তানা খুলে রাখা যায়। হিলারী অক্সিজেন যন্ত্রটি পরীক্ষা করায় মন দিল, আমি বরফ গলিয়ে জল গরম করে লেমন জুস আর কফি বানালাম। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গেছে, উটের তৃষ্ণা নিয়ে পানীয় শেষ করলাম। তারপর বিস্কুট, সার্ডিন মাছ, আর স্যুপ তৈরি করে কিছু খাবার ব্যবস্থা করি। ফলের রসের টিনগুলো ঠান্ডায় জমে শক্ত হয়ে গেছে, স্টোভে গরম করলাম।

এবার তাঁবুর ভিতর থেকেই তাঁবুর নীচের পাথরগুলো সাজাবার কাজে মন দিয়ে অনেকটা

সফল হলাম। তবে সমতল অংশটা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেল। একটার চেয়ে অন্যটা একফুট নিচে। সমতলের ওপরের অংশে হিলারী তার স্লিপিং ব্যাগ বিছিয়ে নেয়, নিচের অংশটা আমার। দুজন দুদিক থেকে তাঁবুর কাপড়ে চাপ দিয়ে শুয়ে পড়লাম। যাতে সেটা ঠিক জায়গায় থাকে। হাওয়ার বেগ মাঝে মাঝে এমন আকার ধারণ করছে যে এইভাবে না হলে তাঁবু উড়িয়ে নিয়ে যাবে। শুয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ আগামী কালের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করলাম। তারপর অক্সিজেনের মুখোশ পরে যন্ত্রটা চালু করলাম, এখন ঘুমোবার সময়। পালকের তৈরি স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে আমাদের সমস্ত গরমের পোশাক পরে ঢুকে পড়েছি। আমার পায়ে ছিল সুইশদের তৈরি স্নো বুট, আমি সেটা পায়ে দিয়েই শুলাম। বেশির ভাগ পর্বতারোহী মনে করে রাত্রে শোবার আগে জুতো খুলে শোয়া উচিত, কারণ তাতে রক্ত চলাচলের সুবিধে হয়। কিন্তু বরফের রাজত্বে আমি সব সময়েই পায়ে জুতো পরে শুই, এটা আমার অভ্যাস। এবং এতে আমার কোনও অসুবিধে হয়না। হিলারী জুতো খুলে স্লিপিং ব্যাগের পাশে নিয়ে শুয়ে পড়ল। আধো ঘুমে মাঝে মাঝে তন্দ্রা ছুটে যাচ্ছে। যখনই ঘুম ভাঙ্গছে কান পেতে হাওয়ার শব্দ শোনার চেষ্টা করছি। মাঝ রাতে ঝড় থেমে গেল। ঈশ্বর করুণাময়, চোমোলোংমা আমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন। এখন চারিদিক নিস্তব্ধ, যেটুকু শব্দ সে শুধু আমাদের শ্বাস নেবার সাঁই সাঁই শব্দ।

আজ ২৯শে মে, আর এক ২৯শে মে আমি আর ল্যাম্বার্ট ব্যর্থ মনোরথ হয়ে সাউথ কল থেকে কুমের দিকে নামতে শুরু করেছিলাম। সেদিন ছিল শুধু নামা, আর নেমে যাওয়া। রাত্রি সাড়ে তিনটে থেকে আমরা নড়াচড়া শুরু করলাম। আমি স্টোভে গরম জল করার ব্যবস্থা করছি, কফি আর লেমন জুস দিয়ে গলা ভিজিয়ে নেব। গতরাত্রের অবশিষ্ট খাদ্য দিয়ে প্রাতরাশ করলাম। আবহাওয়া পরিষ্কার, হাওয়ার লেশমাত্র নেই। একটু পরে তাঁবুর দরজা খুলে বাইরে তাকালাম, ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। নিচে বহু নিচে বিন্দুর মত থায়াংবোচের মঠ আমার নজরে এল। ষোল হাজার ফুট নিচে ঐ মঠ যাকে আমার পিতামাতা ঈশ্বরজ্ঞানে পুজো করেন, আমি হিলারীর দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করলাম।

এবার আমাদের পোশাক পরে তৈরি হবার পালা। কিন্তু প্রথমেই এক বিপত্তি দেখা দিল। রাত্রে হিলারী তার জুতোজোড়া বাইরে রেখেছিল। এখন ঠান্ডায় জমে দু'টুকরো শক্ত লোহার মত হয়ে গেছে। প্রায় এক ঘন্টা সে দুটো স্টোভে গরম করলাম। সমস্ত তাঁবুর মধ্যে চামড়া শুকনোর গন্ধে ভরে গেল। সে এক শ্বাস রুদ্ধকর অবস্থা। আমরা হাঁপাতে শুরু করলাম। আমাদের এতই কষ্ট হয়েছিল যে মনে হচ্ছিল যেন পর্বতারোহণ করছি। একে তো দেরি হয়ে যাচ্ছে তায় জুতো যদি ঠিক না হয় তাহলে তার পায়ের অবস্থা কি হবে আর কখনই বা রওনা হওয়া যাবে একথা ভেবে হিলারী যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। উৎকণ্ঠিত হিলারী বলল, "আমার মনে হচ্ছে ঠান্ডায় জমে গিয়ে আমার পায়ের অবস্থা ল্যাম্বার্টের মত হয়ে যাবে।" যাই হোক, বহু চেষ্টায় জুতো নরম হল, অবশেষে আমরা তৈরি হয়ে নিলাম। আমি আগের দিন থেকেই প্রয়োজনীয় পোশাক পরে আছি। আমার পোশাক এক অদ্ভুত আন্তর্জাতিক চেহারা নিয়েছে। জুতো জোড়া সুইসদের দেওয়া, উইন্ড প্রুফ জ্যাকেট আর অন্য গরমের

পোশাক বৃটিশদের, কিন্তু মোজা জোড়া আমার স্ত্রী নিজের হাতে বুনে দিয়েছে। আমার পরনের সোয়েটারটা মিসেস হেন্ডারসন আমাকে উপহার দিয়েছেন। হনুমান টুপিটা ডেনম্যানের ফেলে যাওয়া, পরম ভালবাসায় যে লাল মাফলারটি আমার গলায় বেড় দিয়ে আছে বিগত বসন্তের ব্যর্থ অভিযানের পর ল্যাম্বার্ট এটি আমাকে উপহার দিয়ে বলেছিল, তেনজিং হয়ত কোনও দিন এটা তোমার কাজে লাগবে। তখন থেকেই আমি বুঝেছিলাম কোনওদিন প্রয়োজনে লাগবে বলতে সে কি বোঝাতে চেয়েছিল।

সকাল ছটা ত্রিশ মিনিটে হামাগুড়ি দিয়ে আমরা যখন তাঁবুর বাইরে এলাম তখনও আবহাওয়া পরিষ্কার। আমাদের হাতে তিনজোড়া দস্তানা। প্রথমে সিল্কের, তার উপর উলের এবং তৃতীয়টা উইন্ডপ্রুফ। জুতোয় ক্র্যাম্পন বাঁধা হল। পিঠে বাঁধা আছে চল্লিশ পাউন্ডের অক্সিজেন সিলিন্ডার, এই বোঝাটুকুই আমাদের বইতে হবে। আমার আইস এ্যাক্সে শক্ত করে বাঁধা আছে সেই চারটি পতাকা, জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকাই, স্পর্শ পাই একটা ছোট লাল-নীল-পেন্সিল।

—"সব ঠিক আছে?"

—"সব ঠিক।"

আমরা রওনা হই।

হিলারীর জুতো জোড়া যথেষ্ট নরম হয়নি, পা দুটো এখনও ঠান্ডা। সে আমাকে সামনে চলার অনুরোধ করে। আমরা পরস্পরের সঙ্গে দড়িতে বাঁধা, দক্ষিণ-পূর্ব গিরিশিরা ধরে দক্ষিণ শীর্ষের (South Summit) দিকে উঠতে থাকি। কখনও কখনও ইভান্স এবং বরডিলনের পায়ের ছাপ দেখতে পাই। বেশির ভাগ জায়গাতেই দুদিন আগের তুষার ঝড় তা মুছে দিয়েছে। ফলে বুটের ঠোক্কর দিয়ে পা রাখার নতুন জায়গা বানাচ্ছি। একটা জায়গায় এসে আমি দাঁড়িয়ে পড়ি, খুব পরিচিত লাগে। আগের বার ল্যাম্বার্ট আর আমি এখান থেকেই ফিরে গিয়েছিলাম। ইশারায় আমি হিলারীকে ব্যাপারটা অবগত করার চেষ্টা করি। সেদিনের সেই ঝোড়ো হাওয়ার সাথে নিদারুণ ঠাণ্ডা; আর আজকের এই রৌদ্রজ্জ্বল ঝলমলে আকাশ, কি বিরাট তফাৎ! এতক্ষণে হিলারীর পায়ের অবস্থা অনেক ভাল হয়েছে। এবার আমরা স্থান পরিবর্তন করি, হিলারী সামনে আমি পেছনে। আর পর্যায়ক্রমে এইভাবেই আমরা উঠতে থাকি। প্রথমজনকে বুটের ঠোক্কর দিয়ে পা রাখার জায়গা বানাতে হয়—তাই এই স্থান পরিবর্তন। সাউথ সামিট বা দক্ষিণ শীর্ষের কাছাকাছি এসে দেখি বরফের ওপর পড়ে আছে ইভান্স এবং বরডিলনের রেখে যাওয়া দুটো অক্সিজেনের বোতল। ডায়াল বা ঘড়ির ওপর থেকে হাত দিয়ে বরফ মুছে ভিতরের গ্যাসের চাপ কতটা আছে পড়ার চেষ্টা করি, দেখি বোতল দুটোতে প্রায় অক্সিজেন ভর্তি। এটা আমাদের পক্ষে একটা বাড়তি সুযোগ। ফেরার সময় এ দুটো ব্যবহার করা যাবে , আমাদের সঙ্গে যে দুটো আছে সে দুটো থেকে আর একটু বেশি ব্যবহার করা যায়।

আমার যেটুকু মনে পড়ছে, এখনও পর্যন্ত গতবারের রাস্তা দিয়েই হাঁটছি। কিছুটা ভঙ্গুর খাড়াই গিরিশিরা, বাঁদিকে একটা পাথরের খাদ, ডানদিকে বরফের কার্নিশে ঢাকা পড়া আর

একটা খাদ। দক্ষিণ শীর্ষের কাছাকাছি এসে গিরিশিরা একটা তুষার দেওয়ালে মিশে গেছে। এখন আমাদের এই খাড়া দেওয়াল বেয়ে উঠতে হবে। আরোহণ শুরু করে বুঝলাম কাজটা কঠিন হবে। বরফে পা দিয়ে চাপ দিলে পায়ের নিচে থেকে বরফ নিচের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে, কাজেই তাড়াতাড়ি পা তুলে নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ ফেলতে হচ্ছে, আবার বরফ গড়িয়ে পড়ছে। নিজেদের পতন রোধ করব, না আরোহণ করব? আমার জীবনে আমি যত বিপজ্জনক আরোহণ করেছি তার মধ্যে এই অংশটুকু আরোহণ করা আমার এক আতঙ্কজনক স্মৃতি হয়ে থাকবে। সে কথা মনে পড়লে আজও আমার সমস্ত লোম খাড়া হয়ে ওঠে।

অবশেষে বেলা নটার সময় আমরা দক্ষিণ শীর্ষে আরোহণ করলাম। ইভান্স এবং বরডিলন এখান থেকেই ফিরে গিয়েছে। দশ মিনিটের বিশ্রাম। ওপর দিকে তাকাই। এরপর কি আছে? সামনে তিনশো ফুট মত গিরিশিরা উঠেছে, কিন্তু বেশ সরু এবং খাড়া। যদিও দেখে খুব অসম্ভব মনে হচ্ছে না, তবে খুব সহজও হবে না। বাঁদিকে আগের মতই খাড়া খাদ, সেখান থেকে আট হাজার ফুট নীচে ওয়েস্টার্ন কুম। চার নম্বর শিবিরে বিন্দুর মত ছোট তাঁবুগুলি চোখে পড়ে। ডানদিকে বরফের কার্নিশ। কার্নিশ ভেঙ্গে পতন হলে দশ হাজার ফুট নিচের কাংশুং হিমবাহে আছড়ে পড়তে হবে। খুব বাঁদিকে যাওয়া যাবে না, সেদিকে খাড়া খাদ, ডান দিকেও যাওয়া যাবে না, সেখানে বরফের কার্নিশ বিপজ্জনক ভাবে ঝুলে আছে। প্রত্যেকের কাঁধে দুটো অক্সিজেনের বোতল, ওজন চল্লিশ পাউন্ড। কিন্তু করার কিছু নেই, এ বোঝা বইতেই হবে অন্তত যতক্ষণ না একটা বোতল খালি হচ্ছে। দক্ষিণ শীর্ষে পৌছনোর পর আমাদের একটা ক'রে বোতল খালি হয়ে গেল। খালি বোতল সেখানে নামিয়ে আমরা দ্বিতীয়টা চালু করে দিলাম। বরফ ক্রমশ শক্ত হচ্ছে, এখন চলার অসুবিধে নেই।

হিলারী জিজ্ঞেস করে, "সব ঠিক আছে?"

—"আচ্ছা, সব কুছ ঠিক হ্যায়।"

দক্ষিণ শীর্ষ থেকে প্রথমে খানিকটা নিচে নামা। তারপর চড়াই, শুধুই উঠে যাওয়া। ওঠবার সময় ভয় হচ্ছে পা পিছলে যাব বা বরফের কার্নিসের দিকে হড়কে যাব, কারণ রাস্তাটা এখানে খুবই সরু। আমরা ঠিক করলাম একসঙ্গে নয় একে একে উঠব। প্রথম জন যখন উঠছি দ্বিতীয় জন তখন আইস এ্যাক্সটা বরফে গেঁথে তার গায়ে দড়িটা জড়িয়ে দিচ্ছি। এই ভাবে প্রথম জন একটা দূরত্ব পর্যন্ত উঠে অপরজনকে ঐ একই পদ্ধতিতে সাহায্য করছে। ঝকঝকে নীল আকাশের নিচে শান্ত আবহাওয়ায় আমরা এখন যথেষ্ট সতেজ আছি। কিন্তু শ্বাস নিতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। মাঝেমাঝে থেমে পড়ে অক্সিজেনের নল থেকে বরফ সাফ করছি। এইখানে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার, যে শ্বাসকষ্ট আর অক্সিজেন ব্যবহারের অসুবিধে এই দুটো বিষয়ে, হিলারী আমার সম্বন্ধে যে কথা বলেছে তা সঠিক নয়। এভারেস্ট আরোহণের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা যেন সততা বজায় রাখি। হিলারী বলেছে যে শ্বাসকষ্টে আমি এতই কাহিল ছিলাম যে তার সাহায্য না পেলে দমবন্ধ হয়ে মরে যেতাম। শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল ঠিকই তবে শ্বাসরুদ্ধ হবার মত অবস্থা হয়নি আমাদের। এই অসুবিধে আমাদের দুজনকেই সমানভাবে কষ্ট দিয়েছে একা আমাকে নয়। পরস্পরকে সমানভাবেই সাহায্য

করতে হচ্ছিল আমাদের।

যাই হোক, আমরা অল্প একটু যাচ্ছি, আবার থামছি। আমরা উঠছি বরফের কার্নিস আর পাথরের খাদ এড়িয়ে গিরিশিরার মাঝ বরাবর। অবশেষে এসে পৌঁছই শেষ কঠিন বাধা সেই পাথরের খাড়া দেওয়ালের কাছে যা মূল এভারেস্ট শীর্ষকে আড়াল করে রেখেছে। এই দেওয়ালের ছবি আমরা বহুবার গভীর মনযোগ দিয়ে দেখেছি। ছবি নেওয়া হয়েছে আকাশ পথে প্লেন থেকে। এছাড়া থায়াংবোচে থেকে চোখে দূরবীণ লাগিয়েও বহুবার একে লক্ষ্য করেছি। এখন সময় আগত, এবার এই বাধা অতিক্রম করতে হবে। ভেবে ঠিক করতে পারছি না কি করব? দেওয়াল বেয়ে উঠে যাব অথবা একে বেড় দিয়ে ওঠার সহজ কোনও রাস্তা খুঁজব? লক্ষ্য করলাম দেওয়ালের আর কার্নিসের মাঝে একটা ফাটল রয়েছে। ঠিক হল ঐ ফাটল বেয়েই উঠব। এই সময় যেহেতু হিলারী আগে ছিল কাজেই সে দেওয়ালের ফাটল বেয়ে ধীরে সন্তর্পণে আরোহণ শুরু করল। আমাদের লক্ষ্য কিছুটা ওপরে একটা পাথরের টেবিল, প্রথমে ওখানেই পৌঁছতে হবে। ঐ ফাটলের একটা দিকে আছে বরফের এক ঝুলন্ত কার্নিস, আরোহণ কালে বাধ্য হয়ে ঐ কার্নিসের ওপর পায়ের চাপ দিতে হচ্ছে। মনে সদা আশঙ্কা, যদি একবার বরফের কার্নিস ভেঙ্গে পড়ে তাহলে টাল রাখা সম্ভব হবে না এবং সেক্ষেত্রে আশঙ্কা রয়েছে খাড়া দেওয়াল থেকে ছিটকে পড়ার। খুব সতর্কভাবে আমি হাতের দড়ি ছাড়ছি যার অপর প্রান্ত বাঁধা রয়েছে হিলারীর কোমরে (পর্বতারোহণের ভাষায় একেই বিলে দেওয়া বলে)। যে কোনও পতন হলেই যাতে তাকে আটকে দেওয়া যায়। অবশেষে হিলারী পাথরের টেবিলে পৌঁছে গেল। এবার আমার পালা। ওপর থেকে হিলারী আমাকে বিলে দিতে লাগল, অতি সতর্কতায় ধীরে ধীরে আমি উঠে গেলাম।

এভারেস্ট আরোহণের এই কঠিন আর শেষ বাধাটুকু আরোহণের নিখুঁত এবং সত্য ঘটনাটি আমি একান্ত সততার সঙ্গে এখানে বর্ণনা করলাম। অপ্রিয় হলেও আবার আমাকে হিলারী কর্তৃক বর্ণিত আরোহণের বর্ণনার প্রতিবাদ করতে হয়। জন হান্টের 'দি এ্যাসেন্ট অব্ এভারেস্ট' বইতে পাথরের এই খাড়া দেওয়ালকে চল্লিশ ফুট উঁচু বলে যে বর্ণনা সে দিয়েছে আমার বিচারে সেটা পনেরো ফুটের একটু বেশি। এছাড়া হিলারী বলেছে যে ঐ উচ্চতাটুকু সে নিজের দক্ষতায় উঠেছে এবং আমাকে টেনে তুলেছে। বর্ণনাটা সে এইভাবে দিয়েছে যে সমুদ্রের জল থেকে একটা বিশাল মাছকে বহু কষ্টে ডাঙ্গায় তোলার পর সেটা যেমন খাবি খায় পাথরের টেবিলে ওঠার পর আমার অবস্থাও নাকি সেই রকমই হয়েছিল। এরপর থেকে ঐ অংশের আরোহণ কালে আমার সঙ্গে সমুদ্রের ঐ খাবি খাওয়া মাছের তুলনা আমাকে প্রায়ই শুনতে হয়েছে। আমি পরিষ্কার বলতে চাই যে এটা আমাকে অত্যন্ত বিরক্ত করে। সত্যি হল এটাই, যে কেউ আমাকে টেনে তোলেনি। আমি নিজেই উঠেছিলাম, যেমন হিলারীও উঠেছিল। আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম যেমন সে আমাকে।

একথা বলতে আমার কোনও কুণ্ঠা নেই যে হিলারী আমার বন্ধু এবং একজন দক্ষ পর্বতারোহী। তার সঙ্গে এভারেস্ট শিখর আরোহণ করে আমি গর্বিত। কিন্তু একথা বলতেও আমার দ্বিধা নেই যে এভারেস্টের সফল আরোহণকালে সঙ্গী হিসেবে আমার দক্ষতাকে সে

সর্বদাই ছোট করে দেখাবার চেষ্টা করেছে। আমরা উভয়েই আরোহণ করেছি পরস্পরের সঙ্গী হিসেবে অথচ আমাদের যৌথ সাফল্যের কথাকে সে তার নিজের কৃতিত্ব বলে বর্ণনা করেছে, আর আমাদের ব্যর্থতা বা অসুবিধার দায় অনায়াসে আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে। আমি স্পষ্ট করে একটা কথা বলতে চাই যে আমাদের এই সাফল্য পরিপূর্ণ রূপেই আমাদের যুগ্ম কৃতিত্ব। বিপদের সময় কঠিন আরোহণ কালে প্রকৃতির বিরুদ্ধে অসম লড়াইয়ের সময় আমরা একই দড়ির দুই প্রান্তে বাঁধা ছিলাম কমরেড হিসেবে। আমরা কেউ কাউকে টেনে তুলিনি বা ঠেলে পাঠাইনি। আমরা কেউ কারোর নেতা নই, আমরা ছিলাম পরস্পরের সঙ্গী।

দেওয়ালের মাথায় উঠে আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। সেই মুহূর্তে আমাদের চলার কোনও ক্ষমতাই ছিল না। অবশেষে অক্সিজেন সিলিন্ডারের সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে আমরা আমাদের শক্তি ফিরে পেলাম। মুখ তুলে ওপর দিকে তাকালাম, আনন্দে এবং উত্তেজনায় আমার বুকের রক্ত ছলকে উঠল। এভারেস্ট শীর্ষ খুব দূরে নয়। সুতরাং এগিয়ে চললাম। কিন্তু এখনও সেই একই অবস্থা। ডানদিকে বরফের কার্নিশ, বামে পাথরের খাদ আর মধ্যে গিরিশিরা। তবে গিরিশিরার খাড়াই অপেক্ষাকৃত কম। এখান থেকে একটার পর একটা বরফের ঢিপি একটা অন্যটার চেয়ে উঁচু পার হয়ে এগিয়ে যেতে হবে। এখনও আমরা বাঁদিক ঘেঁসে ডান দিকের বরফের কার্নিস এড়িয়ে চলেছি। এভারেস্ট শীর্ষ থেকে প্রায় একশ ফুট নিচে, বরফশূন্য প্রস্তরভূমির সামনে এসে দাঁড়ালাম। আমাদের পায়ের নিচে সুন্দর তাঁবু লাগাবার জায়গা। দুটো তাঁবু লাগাবার পক্ষে যথেষ্ট। এটাই পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্থান যেখানে শিবির স্থাপন করে এভারেস্ট আরোহণের চেষ্টা করা যায়। পাথরের দুটো টুকরো তুলে পকেটে রাখলাম, ফিরে গিয়ে সকলকে দেখাতে হবে। অবশেষে এক সময় প্রস্তরভূমি আমাদের পেছনে রয়ে গেল, আমরা বরফের ঢেউ খেলানো প্রান্তর পার হচ্ছি, ধীরে অতি ধীরে। মনে ভাবছি এই ঢিবিটাই বোধহয় শেষ, আমাদের আর চড়তে হবে না। অবশেষে এমন একটা জায়গায় এলাম যেখান থেকে দাঁড়িয়ে পিছনের বরফের ঢিপিগুলো পরিষ্কার দেখা যায়। তার পেছনে খোলা আকাশ, নিচে ধূষর সমতল। সামনে আর একটাই ঢিবি তবে তত খাড়া নয়, তার মাথা টপকে ন্যদিকে উন্মুক্ত গাঢ় নীল আকাশ দেখা যায়। দেখা যায় তিব্বতের মালভূমি। এখান থেকে আরোহণ করতে হবে একটা বরফের ঢালু রাস্তা দিয়ে, যেখানে দুজন মানুষ পাশাপাশি হেঁটে যেতে পারে। এভারেস্ট শীর্ষের তিরিশ ফুট আগে আমরা কয়েক মিনিটের জন্যে দাঁড়িয়ে গেলাম, তারপর মুখ তুলে ওপর দিকে তাকিয়ে আবার উঠতে শুরু করলাম।

আমি বহুবার ভেবেছি এই শেষ মুহূর্তের বর্ণনা আমি কিভাবে হাজির করব। আমি এমনভাবে বর্ণনা দিতে চাই যাতে সকলের সামনে পৃথিবীর প্রথম দুজন অভিযাত্রীর এভারেস্ট শীর্ষে পদার্পণের ছবি পরিষ্কার ফুটে ওঠে। কারণ আমরা ফিরে আসার পর এই বিষয়টি নিয়ে বোকার মত অনেকেই প্রশ্ন করেছে, কে আগে উঠেছে, আমি না হিলারী? আবার কেউ কেউ বলেছে এদের মধ্যে একজনই পৌঁছতে পেরেছে অথবা কেউই পারেনি। আবার কেউ বলেছে এরা দুজনেই উঠেছে তবে একজন আর একজনকে টেনে তুলেছে। এগুলো সবই বাজে কথা।

এই বাজে কথাগুলো যাতে চিরকালের মত বন্ধ হয়ে যায় সেই কারণে এভারেস্ট বিজয়ের পর কাঠমাণ্ডুতে আমরা দুজন যৌথভাবে এক বিবৃতি দিয়েছিলাম। আমরা বলেছিলাম যে আমরা দুজন প্রায় একসঙ্গে শীর্ষে আরোহণ করেছি। ভেবেছিলাম এতেই কাজ হবে, মানুষের মনে আর কোনও সন্দেহ থাকবে না। কিন্তু এই বিবৃতিটা যথেষ্ট হয়নি, পরন্তু নতুন করে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করল। বিবৃতি পড়ে কিছু লোক বলতে শুরু করল 'প্রায়' একসঙ্গে কথাটার মানে কি ? বোঝ ঠেলা! একজন পর্বতারোহী হয়ত এই প্রশ্নের অসারতা বুঝতে পারবে, তারা বুঝবে যখন দুজন আরোহী একই দড়ির দুই প্রান্তে বাঁধা তখন সব সময়েই তারা যৌথ। কিন্তু সাধারণ মানুষকে এটা বোঝানো মুশকিল। তারা আগে পরের ব্যাপারটায় যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে ভারত এবং নেপালে আমার উপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল যাতে আমি বলি যে আমিই আগে উঠেছিলাম। আবার পরে যখন পৃথিবীর অন্য দেশে গিয়েছি সেখানেও আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, ঠিক করে বল তো কে আগে উঠেছে?

আবারও আমাকে বলতে হচ্ছে, যে এটা বোকার মত প্রশ্ন। এই প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই। কিন্তু এই একই প্রশ্ন এত বার এত রকম ভাবে করা হয়েছে যে অনেক চিন্তা করে আমি ঠিক করেছি যে আমার আত্মজীবনীতে আমি শেষ মুহূর্ত আরোহণের একটা চলন্ত বর্ণনা দেব। আমি এই বর্ণনা দেবার মনস্থ করেছি আমার স্বার্থের জন্যে নয়, অথবা হিলারীর কথা ভেবেও নয়, আমি এটা করতে চাই এভারেস্টের জন্যে—তার সম্মানের জন্যে। এই রকম একটা বিতর্কিত বিষয়ে আমি যদি কোনও প্রানিধান যোগ্য উত্তর না রেখে যাই তবে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে অপরাধী থেকে যাব। তারা যদি প্রশ্ন করে 'কেন'? উত্তর না দেবার পেছনে কি কোনও রহস্য আছে? এমন কিছু কি ঘটেছিল যার জন্যে আমরা লজ্জিত? যদি প্রশ্ন করে, কেন আমাদের কাছে সত্যকে প্রকাশ করা হয়নি?.....এস! তাহলে আমরা শেষ মুহূর্তের আরোহণের বর্ণনা দিই।

শীর্ষের সামান্য আগে আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম। ওপর দিকে তাকালাম ক্ষণিকের তরে। আবার চলা শুরু করলাম। যে দড়িতে আমরা বাঁধা ছিলাম সেটা ত্রিশ ফুট লম্বা। আমাদের দুজনের মধ্যে ছফুট দড়ি ছেড়ে রেখে বাকিটা আমার হাতে গুটিয়ে রেখেছিলাম। 'প্রথম' কিম্বা 'দ্বিতীয়' সেই মুহূর্তে আমার মাথায় এই চিন্তা ছিল না। আমাদের সামনে সোনার আপেল জাতীয় কোনও কাল্পনিক বস্তু ছিল না যে পরস্পরকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে আগে গিয়ে সেটার দখল নেব। আমরা ধীরে সতর্ক হয়ে হাঁটছিলাম। এবার আমরা শীর্ষ বিন্দুতে.... হিলারী সেখানে পা রাখল, আমি ধীরে তাতে কদম মেলালাম।

এই সেই কাহিনী সেই 'বিরাট রহস্য', কে আগে? সুতরাং তর্কের অবসান ঘটিয়ে এই হল অনুপুঙ্খ বর্ণনা। আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি—ঠিক এইরকমই হবার কথা। আমার এই বর্ণনা শুনে আমার প্রিয়জনেরা হতাশ হয়েছে, তারা ভেবেছিল আমি বলব তেনজিং পা রাখল আর হিলারী তাতে কদম মেলাল। আমার প্রিয়জনেরা সত্যি ভাল, তারা সরল তাদের আমি ভালবাসি, তাদের খুশি করতে পারলে আমি তৃপ্তি পেতাম। কিন্তু আমার কাছে এভারেস্টের চেয়ে মহৎ, সত্যের চেয়ে বড় আর কিছুই নেই। হিলারীর চেয়ে এক কদম পিছনে এভারেস্ট

আরোহণ করাটা যদি আমার পক্ষে অসম্মানের হয় তবে তাই হোক। তবু আমি জানি এটা কখনই অসম্মানের নয় যেমন নয় আমার এই সত্য কথা বলাটা। এই বর্ণনা দেবার আগে আমি বহুবার ভেবেছি যে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের সাফল্য সম্বন্ধে কি ধারণা করবে? তারা কি সন্দেহ করবে না যে এর মধ্যে এত রহস্য কেন? তারা কি আমাদের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলবে না, ঐ দেখ দুজন কমরেড ! যাদের জীবন এবং মরণ একই দড়িতে বাঁধা ছিল তারা পৃথিবীর কাছে কিছু একটা গোপন করতে চাইছে। তাই আমি মনে করি ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমাদের সত্য বলাই উচিত। এভারেস্টের সম্মান যে কোনও কিছুর চেয়ে অনেক অনেক মূল্যবান।.... আজ সবকিছু বলা হল। আমি মুক্ত।

আমরা এখন এভারেস্ট শীর্ষে। আমার স্বপ্ন সফল হল, আমি ধন্য। পর্বতশীর্ষে আরোহণের পর সকল পবর্তারোহী যা করে থাকে আমরাও তার ব্যতিক্রম নই। প্রথমে আমরা পরস্পরের সঙ্গে করমর্দন করলাম। কিন্তু এভারেস্ট আরোহণ করার সাথে অন্য কোনও পর্বতারোহণের তুলনা চলতে পারে না। এ এক অবিস্মরণীয় সাফল্য। আমি হাত বাড়িয়ে হিলারীকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলাম। আমরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে এত জোরে পিঠে চাপড় মারছিলাম যে অক্সিজেন ব্যবহার করা সত্ত্বেও প্রায় দমবন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা হয়েছিল। এখন ঘড়িতে এগারোটা বেজে তিরিশ মিনিট। চারিদিকে চোখ মেলে তাকালাম। আকাশ ঘন নীল। এত ঘন নীল আকাশ আমি এর আগে দেখিনি। তিব্বতের দিক থেকে মৃদুমন্দ ঠান্ডা বাতাস আসছে। এভারেস্টের মাথার তুষার থেকে সবসময়ে যে ধোঁয়া ওঠে তার পরিমাণ এখন অতি সামান্য। উল্টোদিকের বহু নিচে পরিচিত দৃশ্যপট দৃষ্টিগোচর হল। সেই রংবুক মঠ, শেকর জং শহর, খার্তা উপত্যকা, এবং অবশেষে মূল রংবুক আর পূর্ব রংবুক হিমবাহ। নর্থকলের সেই জায়গাটা চোখে পড়ল ১৯৩৮ সালে যেখানে ছ'নম্বর শিবির হয়েছিল। এরপর আমাদের উঠে আসার পথ ঘুরে দেখার চেষ্টা করলাম। দক্ষিণ শীর্ষ থেকে সেই লম্বা একটানা গিরিশিরা সাউথ কলে মিশেছে। এবার ধীরে ধীরে ওয়েস্টার্ন কুম আর বরফের ভয়ঙ্কর ধস এলাকা। খুম্বু হিমবাহকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বোঝা যায় থায়াংবোচে মঠের অবস্থান আর অবশেষে আমার অতি পরিচিত সেই সব উপত্যকা যেখানে একদিন আমি ইয়াক চরাতাম। যতদূর চোখ যায় শুধু পর্বতশ্রেণী, একদিকে নেপাল অন্যদিকে তিববত। হাত বাড়ালে লোৎসে, নুপৎসে, মাকালু। মজা হল এরা সবাই এখন আমাদের নিচে। দূরে কাঞ্চনজঙঘাকে দেখে মনে হয় যেন বরফের ঢিপি। কি অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য, কি আশ্চর্য তার রূপ—যা আগে কখনও দেখিনি। এমন আশ্চর্য ভয়াবহ সৌন্দর্যের মুখোমুখি আগে কখনও হইনি, ভয়াবহ, কিন্তু ভয় করছে না। আমি পাহাড় ভালবাসি, ভালবাসি এভারেস্টকে, এই অপূর্ব মুহূর্তে এভারেস্ট আমার কাছে প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। শুধু পাথর আর বরফের নিষ্প্রাণ পর্বত নয়।

আমরা অক্সিজেন নেওয়া বন্ধ করলাম। পৃথিবীর মাথাতে বিনা অক্সিজেনে শ্বাস নিতে আমাদের কোনও অসুবিধে হয়নি। অক্সিজেনের মুখোশ থেকে বরফ সরাবার জন্যে সেটা খুলে, মুখে একটা লজেন্স দিয়ে আবার লাগিয়ে নিলাম, তবে যতক্ষণ না আবার নামার জন্যে প্রস্তুত হচ্চি ততক্ষণ অক্সিজেন চালু করিনি। হিলারী অতি যত্নে তার ক্যামেরা গরম কাপড়ের

নিচে ঢাকা দিয়ে রেখেছিল যাতে হাওয়ার দাপটে সেটা অকেজো হয়ে না যায়। এবার সেটাকে বের করে। আমি আইস এ্যাক্সে বাঁধা চারটি পতাকা মেলে ধরলাম। হিলারী আমার ছবি তুলে নিল। পতাকাগুলোর প্রথমে ছিল রাষ্ট্রসঙঘ, দ্বিতীয় বৃটিশ, তৃতীয় নেপাল এবং চতুর্থ ভারত। যারা আমাদের এভারেস্ট আরোহণের সাফল্য নিয়ে নানা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল তারা পতাকাগুলি সাজানোর এই ক্রম নিয়েও নানা প্রশ্ন তুলেছিল। কিন্তু এভাবে সাজানোর পেছনে আমার কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। আমি যদি ভারত বা নেপালের পতাকা প্রথমে দিতাম তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারত কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘের পতাকা সবার ওপরে স্থান দিয়ে আমি সত্যিই আনন্দিত। আমাদের এই সাফল্য এই পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের।

আমি হিলারীর দিকে ফিরে ক্যামরা চাইলাম তার ছবি তুলে দেবার জন্যে। কি কারণে জানি না সে আমাকে তার ছবি তুলতে দিল না। তার পরিবর্তে শীর্ষের বিভিন্ন দিকের ছবি তোলায় মন দিল। পর্বতশীর্ষে আরোহণের পর যা করে থাকি আমি এবার সেই কাজে মন দিলাম। যে মিষ্টির ঠোঙ্গা সঙ্গে করে এনেছিলাম বরফে গর্ত করে তা পুঁতে দিলাম। পকেটে হাত দিয়ে আমার ছোট মেয়ে নিমার দেওয়া লাল নীল পেন্সিলটা বের করলাম। সে আমাকে এটা তার প্রিয় চোমোলোংমাকে দেবার জন্যে বলেছিল। এতক্ষণ হিলারী আমার এই কাজ লক্ষ্য করছিল। সে পকেট থেকে একটা কাপড়ের তৈরি কালো রংএর বেড়াল বের করে আমার হাতে দিল গর্তে রেখে দেবার জন্যে। হিলারী আমাকে বলেছিল যে জন হান্ট তাকে এটা দিয়েছিল এভারেস্টের মাথায় রেখে আসার জন্যে। আমি দেখলাম কালো বেড়ালের চোখ দুটো সাদা। সেটাকেও গর্তে রেখে আমি ভগবানের উদ্দেশ্যে পুজোয় মন দিলাম। আমাদের এভারেস্ট আরোহণের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে হিলারী বলেছে যে সে এভারেস্টের মাথায় জন হান্টের দেওয়া একটা ক্রুশ রেখে এসেছিল। তবে সেটা আমার চোখে পড়েনি। আমি আমার পুজো শেষ করলাম। সাতবার এভারেস্ট আরোহণের চেষ্টা করে এই সপ্তমবারে সফল হলাম। ঈশ্বর করুণাময়, চোমোলোংমা আমাকে দয়া করেছেন।

আমরা পনেরো মিনিট এভারেস্ট শীর্ষে ছিলাম। এবার নামার পালা। বরফে পুঁতে রাখা পতাকা জড়ানো আইস এ্যাক্স তুলে নিলাম। আইস এ্যাক্স ছাড়া আমার পক্ষে নামা সম্ভব নয়। কাজেই আইস এ্যাক্স থেকে দড়ির বাঁধন খুলে পতাকাগুলি এভারেস্টের মাথায় শুইয়ে দিয়ে তার দড়ির প্রান্ত শক্ত করে বরফে পুঁতে দিলাম। আমরা নেমে আসার কয়েকদিন পরে ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি বিমান এভারেস্টর মাথায় চক্কর দিয়ে খবর দিয়েছিল তারা সেখানে কিছু দেখতে পায়নি। হতে পারে তারা অনেক উঁচুতে ছিল বলে কিছুই দেখতে পায়নি নতুবা প্রবল ঝড়ে সেগুলি উড়ে গিয়েছিল। যাই হোক, পতাকাগুলির কি গতি হয়েছিল তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

নামা শুরু করবার ঠিক আগে আমি আরও একবার চারদিকে ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিলাম যদি আরভিন এবং ম্যালরীর কোনও নিশানা পাওয়া যায়। না, কিছুই পাওয়া যায়নি। এই প্রশ্ন সেই মূহূর্তে আমার মনে জেগেছিল যে সত্যিই কি তারা এভারেস্ট আরোহণ করেছিল? আমার মনে হয় হিলারীও হয়ত আমার মত একই কথা ভাবছিল। এছাড়া আমার

মনে উদয় হল সেই সব বীর শেরপা এবং ইংরেজদের কথা, সুইসদের কথা—যারা বিগত তেত্রিশ বছর ধরে এভারেস্ট আরোহণের জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। তারা লড়াই করেছে আর কেউ কেউ প্রাণ দিয়েছে। তাদের সেই অভিজ্ঞতা আজ আমাদের সফল হতে সাহায্য করেছে। ভাবছি সেই সব মূল শিবির আগলে রাখা আরোহীদের কথা, মালবাহক শেরপাদের কথা যারা না থাকলে আমরা সফল হতে পারতাম না। সবকিছু ছাপিয়ে মনে পড়ছে আমার প্রিয় বন্ধু ল্যাম্বার্টের কথা। সে আমার এতই আপন, এতই প্রিয় যে তার কথা ভাবছি বললে ভুল হবে, পরন্তু মনে হচ্ছে আমি যেন তারই সঙ্গে এখানে দাঁড়িয়ে আছি। যেন মুখ ফেরালেই হাসি হাসি মুখে বলছে, সা ভা বিয়েন—সব কুছ ঠিক হ্যায়। এক দীর্ঘশ্বাস চেপে যাবার চেষ্টা করি, সে না থাক তার দেওয়া লাল মাফলারটা জড়ানো আছে আমার গলায়। ফিরে গিয়ে এটা তাকে পাঠিয়ে দেব স্মৃতি হিসেবে।

এভারেস্ট আরোহণের পর আমাকে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে যার অনেকগুলোর সাথেই রাজনীতি বা স্বার্থের কোনও সম্পর্ক নেই। যা আছে তা হল বিশ্বাস আর ভালবাসা। যেমন নেপাল এবং ভারতে আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করেছে যে আমি গৌতমবুদ্ধকে সেখানে শায়িত অবস্থায় দেখেছি কিনা? কেউ কেউ জানতে চেয়েছে মহাদেব শংকরের দেখা পেয়েছি কিনা? আবার কেউ জোর করে আমাকে দিয়ে বলাতে চেয়েছে যে এভারেস্টের মাথায় উঠে আমার এক অদ্ভুত আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয়েছে। কিন্তু আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাতে চাই যে এর কোনওটাই সত্যি নয়। যা সত্যি তা হল সেই সময় আমি হৃদয়ে ভগবানের করুণা উপলব্ধি করেছি। তবে বাস্তবে প্রার্থনা করেছিলাম তাঁর দেওয়া জয়ের পরে যাতে নিরাপদে নেমে যেতে পারি।

আমরা অক্সিজেন চালু করলাম। শুরু হল নামা। মন চাইছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নেমে যাওয়া যায়। কিন্তু বাস্তবে খুব ধীর সন্তর্পণে নামতে হয়েছে। এখন আমাদের শরীর ক্লান্ত, এই সময় সামান্য অসতর্ক হলে রক্ষে নেই। অতীতে পর্বতারোহণে যতগুলি দুর্ঘটনা ঘটেছে তার বেশিটাই হয়েছে নামার সময় একথা আমাদের অজানা নয়, আর তাই এ সতর্কতা। বরফে বুটের ঠোক্কর দিয়ে ধাপ বানিয়ে আমরা নামছি, যে পথ দিয়ে উঠেছিলাম, চেষ্টা করছি সেই পথটাকেই ধরে রাখতে। সেই পাথরের দেওয়াল আর তার ফাটলের কাছে এসে পৌঁছলাম। আক্ষরিক অর্থেই অমি প্রায় লাফিয়ে নেমে গেলাম ঐ দেওয়ালের শেষাংশ থেকে। শৈলশিরা ধরে মাত্র এক ঘন্টায় দক্ষিণ শীর্ষে পৌঁছে গেলাম। এই পথটুকু হিলারী আগে আগে এসেছে আর আমি পেছন থেকে দড়ি ধরে থেকেছি শক্ত করে, যাতে কোনও বিপদ না হয়। আমরা ক্লান্ত ছিলাম, কিন্তু অবসাদ আমাদের গ্রাস করতে পারেনি। যেটুকু কষ্ট আমরা পেয়েছি তাহল অসম্ভব তৃষ্ণা। সঙ্গে যে জল ছিল তা জমে গেছে। বরফ দিয়ে গলা ভেজালে গলার অসুখ আর কাশিতে কষ্ট পাওয়া, তাছাড়া তাতে তৃষ্ণা মেটে না বরং বেড়ে যায়।

দক্ষিণ শীর্ষে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আমরা নামার জন্যে প্রস্তুত হলাম। এবার আমাদের পায়ের নীচে সেই ভয়ঙ্কর তুষার ঢাল, নামার সময় যাকে ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক মনে হচ্ছে। হিলারী খুব সতর্কতার সঙ্গে তার দেহ একেবারে পিছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে নামছে। এই

হেলিয়ে যে তার পেছনটা প্রায়ই বরফে ঘষে যাচ্ছে। আমি শক্ত করে দড়ি ধরে আছি, কোনও মতে পিছলে গেলে দশহাজার ফুট নীচে কাংশুং হিমবাহে আছড়ে পড়ব উভয়ে। একটু পরে ইভান্স এবং বরডিলনের রেখে যাওয়া অক্সিজেন সিলিন্ডার দুটো দেখতে পেলাম। ঠিক সময়েই আমরা এ দুটো দেখতে পেলাম কারণ আমাদের বোতল খালি হয়ে এসেছে। দুটোর সময় তাঁবুতে পৌঁছে আমি স্টোভ জ্বেলে মিষ্টি লেমন জুস বানালাম। বহুক্ষণ পরে আমরা গলা ভেজানোর জন্যে কিছু পানীয় পেলাম। গ্রহণ করলাম, যেন নতুন প্রাণ ফিরে পেলাম।

ন'নম্বর শিবির থেকে এবার আমাদের নেমে আসার পালা। এখন আমরা সাউথ কলের দিকে খাঁজের পথ বেয়ে নামছি, কোথাও কোথাও আমাদের পুরনো পায়ের ছাপ রয়ে গেছে কোথাও তা ঝড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যদিও পায়ে ক্রাম্পন বাঁধা আছে তবু ভয় হয় বোধহয় গড়িয়ে পড়ে যাব। এবার আমি সামনে চলেছি। কখনও বরফ কেটে ধাপ বানাচ্ছি আবার কখনও বুটের ঠোক্কর দিয়ে বরফে গর্ত করে নিচ্ছি। বহু নিচে ছোট ছোট রঙ্গীন তাঁবু চোখে পড়ল। তাঁবুর আশেপাশে বিন্দুর মত কিছু নড়াচড়া করছে। ক্রমশ তাঁবু আর নড়াচড়া করা বিন্দুগুলো স্পষ্ট হল। কলের ঠিক ওপরে বরফের সহজতর রাস্তায় হাঁটছি, দেখলাম জর্জ লোয়ে কিছু লোকজন নিয়ে ওপরে উঠে আসছে। কাছে এসে সে তার হাতদুটো দিয়ে আমাদের জড়িয়ে ধরল, গরম কফি খেতে দিল; অবশেষে ধরাধরি করে তারা আমাদের তাঁবুর কাছে নিয়ে এল।

গ্রেগরী সেদিন সকালে নিচে নেমে গেছে। অন্যদিকে পাশাং ফুটারকে সঙ্গে নিয়ে নয়সি উঠে এসেছে। লোয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করছে যাতে আমাদের একটু উষ্ণতা দেওয়া যায়। আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য দেবার জন্যে সে চেষ্টার ত্রুটি রাখছে না। নয়সি আমাদের জন্যে চা তৈরিতে মন দিল। উত্তেজনায় স্টোভে একটু বেশি পাম্প দিয়েছিল বোধহয় তাই কেরোসিনের গন্ধ মাখা, কিন্তু পরম ভালবাসায় তৈরি গরম চায়ে তৃপ্তিতে চুমুক দিলাম। অন্যরা এরই ফাঁকে আমাদের হাজার প্রশ্ন করছে। কোনও মতে তাদের শান্ত করলাম। এখন আমাদের বিশ্রাম দরকার। বাইরে অন্ধকার নামছে ঠাণ্ডায় কষ্ট হচ্ছে। নয়সি এবং লোয়েকে সঙ্গে নিয়ে হিলারী একটা তাঁবুতে ঢুকে গেল। আর একটাতে আমি আর পাশাং। শ্লিপিং ব্যাগে ঢুকে আমি অক্সিজেন মুখোশ পরে নিলাম। এখন অনেকটা আরাম হচ্ছে । এবার ঘুমোব। আর কিছু ভাবতে পারছি না।

তেনজিং জিন্দাবাদ

'আমাদের জীবনে এল সেই পরম পরিতৃপ্তি আর হাজারো অশান্তি। কারণ আমরাই প্রথম এভারেস্ট আরোহণ করেছি।'

পরের দিন আবহাওয়া চমৎকার, রৌদ্রজ্জ্বল ঝলমলে আকাশ। আমরা এখনও যথেষ্ট পরিশ্রান্ত, একটু দুর্বলও। টানা তিনদিন হিমালয়ের প্রায় সর্বোচ্চ উচ্চতায় রাত কাটিয়ে এভারেস্ট আরোহণ করেছি এবং তারপর সরাসরি সাউথ কলের আরও নিচে নেমে এসেছি। আট নম্বর শিবিরে সাহেবরা তাদের বেশির ভাগ জিনিস ফেলে রেখে গেল। চারটে ব্যাগে সরঞ্জাম ভর্তি ছিল তার মধ্যে তিনটে আমি পিঠে তুলে নিলাম, আর নিলাম ফেলে যাওয়া একটা ফ্লাস্ক। উত্তেজনার বশে লোয়ে তার দুটো ক্যামেরার একটা ফেলে চলে গেছে। সেটা আমি আমার স্যাকে ভরে নিলাম। পথে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা, তারা আমাদের জন্যে সেখানেই অপেক্ষা করছিল। সাত নম্বর শিবিরে ছিল মেজর উইলি আর কয়েকজন শেরপা। ছ'নম্বর শিবিরে পৌঁছবার আগে দেখি টম স্টুবার্ট তাঁর মুভি ক্যামেরা নিয়ে আমাদের দিকে তাক করে আছেন। এবার আমরা নেমে আসছি পাঁচ নম্বর শিবিরের দিকে। সেখানে দাওয়া থোন্ডুপ আর ভাগ্নে গম্বু কয়েকজন শেরপাকে নিয়ে হৈহৈ করে ছুটে এল। যখনই কারও সঙ্গে দেখা—বেশ কিছু কথা, কিছু উত্তেজনা। অন্যরা কিছুতেই আর আমাকে মাল বইতে দিল না, পিঠের বোঝা কেড়ে নিল। চার নম্বর ছিল অগ্রবর্তী মূল শিবির। সেখানেই আমরা দলের বাকিদের সঙ্গে মিলিত হলাম। কুমের দীর্ঘ বরফের ময়দান দিয়ে হেঁটে যখন আমরা শিবিরের দিকে চলেছি তখন সদস্যরা বেরিয়ে এল আমাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে।

প্রথমে আমরা কোনও কিছুই প্রকাশ করিনি। কিন্তু লোয়ে নিজেকে সংযত রাখতে পারল না, তার আইস এ্যাক্সটা এভারেস্টের দিকে দেখিয়ে খবরটা প্রকাশ করে দিল। মুহূর্তে সমস্ত পরিবেশটা বদলে গেল। সে কি উত্তেজনা! আমার জীবনে আমি কোনও অভিযানে এত উত্তেজনা লক্ষ্য করিনি। পায়ে ভারি বুট আর তাতে ক্রাম্পন বাঁধা, ঐ অবস্থাতে সকলেই দৌড়ে আমাদের দিকে আসতে লাগল। দলনেতা হান্ট—হিলারী এবং আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি বার বার জিজ্ঞাসা করলেন, "একথা কি সত্যি? ওরা কি সত্যি বলছে?" আমি ইভান্সকে জড়িয়ে ধরলাম। সকলেই সকলকে জড়িয়ে ধরছে। সে সময়ে বাইরের কেউ সেখানে থাকলে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করত যে সাহেব এবং শেরপাদের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ নেই। আমরা সবাই পরস্পরের সাথী।

সেদিন ছিল আমার জীবনে সবচেয়ে মধুর এবং স্মরণীয় সন্ধ্যা। আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা শুধু খাদ্য আর পানীয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকলাম। এছাড়া কথা—শুধু কথা। কিন্তু একথা তখনও আমার জানা ছিল না যে এরই মধ্যে এমন অনেক কিছু ঘটছিল যার থেকে ভবিষ্যতে অনেক ঝঞ্ঝাট, অনেক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সন্ধ্যায় আমরা যখন আনন্দ উৎসবে মশগুল ঠিক সেই সময় কিভাবে যেন ভারতীয় বেতারে প্রচার হয়ে গেল যে এবারেও এভারেস্ট অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। এদিকে সাফল্যের খবর রাণারের মাধ্যমে

নামচেবাজারে জানিয়ে দেওয়া হল এবং সেখান থেকে সাংকেতিক ভাষায় কাঠমাণ্ডুর বৃটিশ দূতাবাসে তা বেতার মারফৎ পৌঁছে গেল। মিঃ সামারহেসে নেপালে বৃটিশ রাষ্ট্রদূত অত্যন্ত গোপনে খবরটা লণ্ডনে জানিয়ে দিলেন। আর এদিকে পুরো একটা দিন সমগ্র পৃথিবী এভারেস্ট আরোহণের খবরটা জানতেই পারল না। ইংরেজরা হয়ত ভেবেছিল যে খবরটা তারা প্রথমে রাণীকে জানাবে এবং তার পরের দিন অর্থাৎ রানীর অভিষেকের দিন সমগ্র পৃথিবীকে জানাবে। এটা হত তাদের তরফ থেকে রানীকে এক মহার্ঘ উপহার। তারা ব্যাপারটা তাদের মত করে দেখেছে এবং সেই হিসেবে হয়ত ইংরেজরাই ঠিক কিন্তু প্রাচ্যের মানুষের কাছে এর সম্পূর্ণ বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। এমনকি রাজা ত্রিভুবননারায়ণ যাঁর দেশে এভারেস্ট অবস্থিত, তিনি পর্যন্ত এই খবর জেনেছেন একদিন পরে এবং সেটাও এসেছে ইংল্যাণ্ড ঘুরে।

এর মধ্যে এতসব কাণ্ড যে ঘটে গেছে আমি তার বিন্দু বিসর্গও জানতাম না। আমি নিজেই আমাদের সাফল্যের খবর রাণারের মাধ্যমে নামচেবাজারে আমার বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারতাম। অভিযান সংগঠিত করেছে ইংরেজরা, যাবতীয় খরচ তারাই করেছে। কাজেই আমি মনে করেছিলাম খবরটা যথাযথ ভাবে পরিবেশন করার দায়িত্বটাও তাদের। কাজেই এক্ষেত্রে আমাদের অর্থাৎ শেরপাদের কোনও ভূমিকা থাকার কথা নয়। আগ বাড়িয়ে কিছু করতে যাওয়া আমাদের উচিত হবে না। আমি আমার সহকর্মীদের ব্যাপারটা এভাবেই বুঝিয়েছিলাম। আমার এই ধরনের ভাবনা চিন্তা করার ফল হয়েছিল উল্টো। লোকে প্রচার করল যে খবরটা গোপন করা জন্যে তেনজিং ইংরেজদের কাছ থেকে ঘুষ খেয়েছে। শুধু তাই নয় এভারেস্ট আরোহণ সফল না হওয়া সত্ত্বেও সে প্রচার করেছে যে অভিযান সফল হয়েছে। মানুষ যখন এসব কথা চিন্তা করেছে তখন আমি কিই বা করতে পারি? শুধু আমার উত্তর হচ্ছে যে মানুষের ভাবনার প্রথম অংশটা একেবারেই মিথ্যে আর দ্বিতীয় অংশ এতই বিরক্তিকর যে আমি মনে করিনা যে এর কোনও উত্তর দেবার দরকার আছে।

কত দিন কত মাস পার হয়ে গেছে, আমি শুধুই এভারেস্ট অভিযানের চিন্তায় মশগুল থেকেছি। অন্য কিছু ভাববার অবসর ছিল না। এতদিন পর বহু পরিশ্রান্ত দিনের শেষে আজ আমার বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই সব মমতা মাখা মুখ, আমার মেয়েরা, আমার স্ত্রী, যারা আমাকে ভালবাসে। সেই রাত্রে এক বন্ধুকে দিয়ে একটা ছোট্ট চিঠি লেখালাম, 'আমি তেনজিং লিখছি—আমি আর একজন সাহেব ২৯শে মে এভারেস্ট শীর্ষে আরোহণ করেছি। এ কথা শুনে তুমি নিশ্চযই খুশি হয়েছ' আর লিখতে পারছি না। ক্ষমা ক'র। 'চিঠির শেষে নিজের হাতে সই করলাম। হ্যাঁ! এই চিঠি লিখেছিলাম আমার স্ত্রী আং লামুকে। আমার অসুস্থ শরীরের কথা চিন্তা করে সে কিছুতেই আমায় আসতে দিতে চায় নি। সে ভয় পেয়েছিল অধিক পরিশ্রম আর এভারেস্টের রুদ্র রূপের সঙ্গে অসম সংগ্রামে দুর্বল শরীরে আমার মৃত্যু হবে। শেষ মুহূর্তে যাকে চোখের জলে ভাসিয়ে আমি আমার প্রিয় এভারেস্টের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলাম, এ চিঠি তাকেই লেখা।

একটি মাত্র রাত চার নম্বর শিবিরে কাটিয়ে আমি নামতে শুরু করেছিলাম। তখন আমার

একটাই চিন্তা এবার পাহাড় ছেড়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিচে নামতে হবে। কুম ছেড়ে তুষার ধ্বসের এলাকাকে পেছনে ফেলে একদিনে মূল শিবিরে নেমে এলাম, সঙ্গে আং শেরিং আর ডাগ্নে গম্বু। যাক বাঁচা গেল, এতদিনে আমি এভারেস্ট জ্বর থেকে মুক্তি পেলাম। হায়! তখন কি জানতাম যে এ আমার কতখানি মিথ্যে ভাবনা? মূল শিবিরেও একদিন কাটিয়ে আমি পরদিন পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে আমার জন্মভূমি থামেতে চলে এলাম আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। আমার মা আমাকে দেখে বেজায় খুশি। আর যখন শুনলেন যে আমি এভারেস্ট আরোহণ করেছি তখন আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে বললেন, "আমি কতবার তোমায় বারণ করেছি এমন বিপজ্জনক কাজে তুমি যাবে না। যাক এবার তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে তো? আর কখনও ওমুখো হবেনা, বুঝেছ?" সারা জীবন ধরে আমার মা একটা কথা বিশ্বাস করতেন যে এভারেস্টের মাথায় একটা সোনালী চড়ুই আছে আর আছে সোনালী কেশরের সিংহ। নিজের ছেলে সেই এভারেস্টের মাথায় চড়েছে শুনে তিনি তার বিশ্বাসটা ঝালিয়ে নিতে চাইলেন। কিন্তু শুনে দুঃখ পেলেন যখন শুনলেন যে আমি সেসব কিছুই দেখিনি। কিন্তু যখন শুনলেন যে এভারেস্টের মাথা থেকে রংবুকের মঠ দেখা যায় তখন তাঁর সে কি আনন্দ।

মূল শিবির থেকে আমি একাই এখানে এসেছি। মা আর ছোটবোনের সঙ্গে দুদিন গ্রামের বাড়িতে কাটালাম। কৈশোরের পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি আর কখনও আমাদের গ্রামের বাড়িতে থাকিনি। আমার আসার খবর পেয়ে গ্রামের বহু লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। আমাদের গ্রাম তখন এক উৎসবের চেহারা নিল, প্রচুর খাওয়া দাওয়া আর তার সঙ্গে ছাং—যত খুশি। কিন্তু শুধু উৎসবে মেতে থাকলে চলবে না তখনও অনেক কাজ বাকি। একশজন মালবাহক নিয়ে আমাকে থায়াংবোচেতে ফিরতে হবে। তারা মূল শিবির থেকে মালপত্র নিয়ে কাঠমাণ্ডুতে ফিরবে। গ্রাম ছাড়ার আগে আমি সঙ্গে আমার মাকে আনতে চাইলাম। আমার ইচ্ছা ছিল এবার তিনি আমার সঙ্গে গিয়ে দার্জিলিং-এ বাস করবেন, ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও বয়সের জন্যে মা আসতে পারলেন না, তবে আমার দিদি লামু কিপা এবং ভগ্নীপতি তাঁদের দুটো মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আমার সঙ্গী হলেন।

পাহাড় থেকে অভিযাত্রীরা ধীরে ধীরে থায়াংবোচকে নেমে আসছে। উত্তেজনা আছে, আছে বিভ্রান্তিও। এদিকে বর্ষা এসে যাওয়াতে যথেষ্ট সংখ্যক মালবাহক সংগ্রহ করা মুশকিল হয়ে পড়ল। যেহেতু এভারেস্ট আরোহণ সফল হয়েছে তাই মানুষের মনে ধারণা হল যে অভিযাত্রীরা ভবিষ্যতে এ পথে আর আসবে না কাজেই এক অদ্ভুত অবসাদ তাদের আচ্ছন্ন করল। এদিকে যে সমস্ত লামারা বরাবর এভারেস্ট অভিযানের বিরোধীতা করেছে তারা রটিয়ে দিল যে এভারেস্টের মাথায় পা রাখার ফল ভাল হবেনা। এত সমস্ত বাধা কাটিয়ে লোকজন জড়ো করে আমাদের ফেরা শুরু হল। দলনেতা জন হান্ট জানালেন যে তিনি সবার আগে কাঠমাণ্ডু যেতে চান কারণ সেখানে তার কিছু জরুরী কাজ আছে। এছাড়া তিনি ইংল্যাণ্ড ফেরার সময় আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চান, সে বিষয়েও কিছু কাজ রয়ে গেছে। ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি অবশ্য এত কিছু ভাবছিলাম না। আমার একটাই ভাবনা ছিল আর তা

হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দার্জিলিং-এ ফেরা। আর মনের কোণে একটা ইচ্ছে ছিল যে অভিযান থেকে যদি কিছু টাকা পাই তবে একটা ছোট বাড়ি বানাব। কিন্তু এসবের বাইরে আমার জন্যে আরও কত কি যে অপেক্ষা করছিল তা আমার স্বপ্নের অগোচরে ছিল।

মাত্র কয়েকদিন আগে যে পথে অভিযানে গিয়েছি ফেরার পথে তার চার পাশের পরিবেশ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। থায়াংবোচেতে পৌঁছে দেখি যে আমরা আসবার অনেক আগে ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনস্টন চার্চিলের কাছ থেকে আমার নামে এক অভিনন্দন বার্তা এসে অপেক্ষা করছে। আর তারপর থেকে বন্যার জলের মত অভিনন্দন বার্তা আসছে তো আসছেই। আমার খুব ইচ্ছে যে আমার মেয়েরা আর আং লামুকে একটা খবর পাঠাই যাতে তারা কাঠমণ্ডুতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে। মেজর উইলি আমার সঙ্গে সবসময়েই খুব সুন্দর ব্যবহার করতেন। আমি তাঁর কাছে আমার মনের কথা বললাম এবং এও বললাম যে দার্জিলিং-এ তারবার্তা পাঠাতে যা খরচ হবে সেটা আমি দিয়ে দেব। তিনি অবশ্য অভিযানের খরচেই আমার বাড়িতে সে খবর পাঠিয়েছিলেন। এরপর আমাদের ফেরা শুরু হল। এখন থেকে আমি বুঝতে পারছিলাম যে এভারেস্ট আরোহণে প্রথম সফল হবার জন্যে আমার জীবনে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। মেজর উইলি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে আমায় সঙ্গ দিতে শুরু করলেন। তিনি আমাকে উপদেশ দিতেন কেমন করে অচেনা মানুষজনের সঙ্গে কথা বলতে হবে। এছাড়া একজন ব্যক্তিগত সচিব যেভাবে চিঠির জবাব তৈরি করে দেয় সেইভাবে আমার নামে প্রতিদিন যে চিঠি আর তারবার্তা আসতে শুরু করল তার উত্তর লিখে দিতেন। তিনি আমাকে উপদেশ দিলেন, "দেখ তেনজিং এবার তোমার জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন আসবে। এখন থেকে তোমাকে সম্পূর্ণ নতুন জীবনযাপন করতে হবে, যার সম্বন্ধে তোমার কোনও ধারণা নেই। কাজেই খুব সতর্ক হয়ে চলবার চেষ্টা করবে। কিন্তু এ তো সবে শুরু।"

চড়াই উৎবাই পেরিয়ে, মালভূমি ছেড়ে আমরা চলেছি কাঠমাণ্ডুর দিকে। আমাদের দেখার জন্যে মানুষ ভিড় করে আসছে। প্রতিদিনের ভিড়, আগের দিনকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। কাঠমাণ্ডু থেকে পঞ্চাশ মাইল আগে খবর পেলাম যে আমার স্ত্রী এবং মেয়েরা সেখানে পৌঁছে গেছে। যত এগিয়ে যাই উৎসুক জনতার ভিড় ততই বেড়ে যায়। কাঠমাণ্ডুর কাছাকাছি এসে একসময় মনে হল আমরা যেন সাংবাদিকদের মিছিলের মধ্যে হাঁটছি, এরা কেউ নেপালের কেউ ভারতের। বৃটেন এবং আমেরিকা থেকেও অনেকে এসেছে। উইলি আমাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিল যে সাংবাদিকরা অদ্ভুত সমস্ত প্রশ্ন করবে, আমি যেন একটু সতর্ক হয়ে উত্তর দিই। উইলির কথাই সত্যি হল। তারা শুধুমাত্র অভিযানের সাফল্য নিয়েই প্রশ্ন করেনি সেউ কেউ আমার রাজনীতি আর নাগরিকত্বের কথাও জানতে চেয়েছে। সাংবাদিকদের সঙ্গে মানিয়ে চলা সহজ কথা নয়। মাঝে মাঝে এমন হত যে এক ঝাঁক সাংবাদিক এক সঙ্গে গুচ্ছের প্রশ্ন করল, কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই তাঁরা নিজেদের প্রশ্নের উত্তব নিজেরাই দিয়ে দিলেন। বোঝো ঠেলা! যে কথা আমি বললাম না সেগুলোই আমি বলেছি বলে লিখে দেওয়া হল। এর মধ্যে হাকসি বলে একটা জায়গায় পৌঁছে 'লাইফ' পত্রিকাব জেমস বার্ক বলে এক

সাংবাদিক সুন্দর এক সাক্ষাৎকার নিলেন। 'লাইফ' আসলে আমেরিকার একটা পত্রিকা, যারা বৃটিশ এভারেস্টের অভিযানের সংবাদ এবং কাহিনীর স্বত্ব আমেরিকার জন্যে 'দি টাইম্‌স'-এর কাছ থেকে কিনে নিয়েছে। যাই হোক, এর কিছুদিন পরে ইউনাইটেড প্রেস এ্যাসোসিয়েশনের জন হাবাচেক্ আমার আর একটা সাক্ষাৎকার নিলেন। পরে আমি এই ইউনাইটেড প্রেস এ্যাসেসিয়েশনের সঙ্গে একটা চুক্তিতে সই করেছিলাম। সেই চুক্তি অনুযায়ী আমি তাদের কাছে এভারেস্ট আরোহণের কাহিনী ব্যক্ত করতে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ ছিলাম। কিন্তু বৃটিশ অভিযাত্রীরা 'দি টাইমস' ছাড়া অন্য কারও কাছে কোনও কথা বলতে পারবেন না এটাই ছিল চুক্তি। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না। তবু কাঠমণ্ডু পৌঁছে এবং তারপর নতুন দিল্লিতেও আমার এই চুক্তি নিয়ে প্রচুর কথা হয়েছে। 'দি টাইম্‌স' চেয়েছিল যাতে অভিযানে অংশগ্রহণকারী সকলকে তাদের বাধ্যবাধকতার মধ্যে আনা যায়। জন হান্টও এ ব্যাপারে আমাকে চাপ দিয়েছিলেন কিন্তু আমি রাজি হইনি। আমি বহু দিন বহু কষ্ট করেছি। পিঠে ভারি বোঝা নিয়ে দিনের পর দিন পাহাড়ে ওঠানামা করেছি শুধু অর্থ রোজগারের জন্যে। আমার জীবনে এই প্রথম সুযোগ এসেছে নিজের সাফল্যের পরিবর্তে কিছু অর্থ রোজগার করার, আমি এই সুযোগ হারাতে চাইনি।

ধোলাঘাট নামে একটা জায়গায় পৌঁছে এমন এক কাণ্ড ঘটল যার জন্যে আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না। কয়েকজন নেপালীর একটা বড় দল আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে হঠাৎই জোর করে আমাকে নিয়ে চলে গেল, আমি বাকি দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। তারা আমার কাছে যেটা জানতে চেয়েছিল তার সঙ্গে এভারেস্ট আরোহণের কোনও সম্পর্ক ছিল না। তাদের প্রশ্নের ধরন দেখে আমার মনে হয়েছিল তারা রাজনীতি করে। তারা প্রথমেই এক রকম জোর করে আমাকে দিয়ে যেটা বলিয়ে নিতে চেয়েছিল সেটা হল আমি যেন বলি যে আমি নেপালের নাগরিক। তাদের দ্বিতীয় দাবি আমাকে বলতে হবে যে আমিই প্রথম আরোহণ করেছি। আমি তাদের বললাম, "রাজনীতি আমি বুঝি না। তাছাড়া আমি নেপালী না ভারতীয় এ নিয়ে এতদিন কেউ মাথা ঘামায় নি। এখনই বা এ প্রশ্ন কেন?" আমি তাদের বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে এ ধরনের কথা বলার কোনও মানে হয় না। আমি তাদের আরও বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে এভারেস্ট আরোহণ করা কোনও ব্যক্তি বা কোনও জাতির সাফল্য নয় এটা পৃথিবীর সমস্ত অভিযান প্রিয় মানুষের মিলিত প্রচেষ্টার সাফল্য। কিন্তু কে শোনে কার কথা, তাদের অত্যাচারে আমার পাগল হয়ে যাবার মত অবস্থা। একটা কাগজে কি সব লিখে তারা আমাকে জোর করে সই করিয়ে নিল। তাতেও নিষ্কৃতি দেয়নি, শেষকালে বিশাল জনতা আমাকে খেলার পুতুলের মত এদিক থেকে ওদিকে লোফালুফি শুরু করল। আমাকে নিয়ে এ রকম ঘটনা ঘটতে পারে জানলে আমি শোলো খুম্বু থেকে কিছুতেই আসতাম না। জুন মাসের কুড়ি তারিখে আমরা যখন বেনোপা বলে একটা জায়গায় জীপ চলার রাস্তায় পৌঁছলাম তখন তারা আমাকে জোর করে জীপে তুলে নিল। এর মধ্যে তারা আমাকে নেপালী পোশাকে সজ্জিত করেছে। এই মানসিক আর শারীরিক অত্যাচারে আমি কাহিল হয়ে পড়লাম। শেষে হাল ছেড়ে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ওদের হাতে সঁপে দিলাম।

গ্রামের পথে রাস্তার দুধারে, জনতার ভিড়, তারা আমাকে দেখে চিৎকার করছে "তেনজিং জিন্দাবাদ।" এমন একটা অবস্থা ভাল লাগবারই কথা, কিন্তু আমি তো চেয়েছিলাম যে আর পাঁচটা অভিযানের শেষে যেমন ঘরে ফিরে যাই এবারেও যেন সেই ভাবে আমি আমার আপনজনদের কাছে ফিরতে পারি।

কাঠমাণ্ডুতে প্রবেশ করার তিন মাইল আগে আমার সঙ্গে আমার স্ত্রী এবং মেয়েদের দেখা হল—আমার জীবনে এমন মধুর আনন্দের দিন খুব কমই এসেছে। আং লামু আমার গলায় একটা খাদা (এক ধরণের চাদর যা নেপালীরা বিশেষ সম্মানার্থে দিয়ে থাকে) জড়িয়ে দিল। দুই মেয়ে গলায় মালা পরিয়ে দিল। আমি নিমাকে কোলে তুলে কানে কানে বললাম, তোমার পেন্সিল আমি ঠিক জায়গায় রেখে এসেছি।

তাদের কাছ থেকে জানলাম যে ২রা জুন সারাদিন বৃষ্টি হচ্ছিল দার্জিলিং-এ। কিছু লোক রেডিওতে আমাদের এভারেস্ট বিজয়ের খবর শুনে বৃষ্টিতে ভিজে সেই খবরটা তাদের জানায়। রেডিওতে খবর শোনার পর থেকেই আমাদের বাড়িতে সরকারী বেসরকারী লোকজনের ভিড় বাড়তে থাকে আর বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি এবং তারবার্তা আসতে থাকে। দার্জিলিং উৎসবের চেহারা নেয়। বন্ধু মিত্রবাবু আমাকে নিয়ে একটা গান লেখান আর এখন সেই গান দার্জিলিং-এ সবার মুখে মুখে ঘুরছে। সারা শহর আমার ছবিতে ভরে গেছে। এমন যখন অবস্থা তখন আমার কাছ থেকে কোনও খবর না পেয়ে তারা অস্থির হয়ে পড়ে। অথচ কাঠমাণ্ডু থেকে আমি তাদের যে খবর পাঠিয়েছিলাম কোনও এক অজানা কারণে সে খবর তাদের কাছে পৌঁছয় নি। একসময় আং লামু ঠিক করেছিল মেয়েদের নিয়ে কাঠমাণ্ডু চলে আসবে কিন্তু পাছে আমি রাগ করি সেই ভয়ে আসতে পারছিল না। টানা এগোরো দিন তারা আমার কাছ থেকে খবর পাবার আশায় অপেক্ষা করেছে। অবশেষে আর থাকতে না পেরে তারা ঠিক করেছে যে ভাবেই হোক কাঠমাণ্ডু আসবে। আমার ছবি বিক্রি করে মিত্রবাবু একশ টাকা পেয়েছিলেন, তিনি সে টাকা তাদের দেন এ ছাড়া মিসেস হেন্ডারসন এবং অন্যান্য বন্ধুরা চারশো টাকা সংগ্রহ করে তাদের হাতে দিয়েছিলেন। অবশেষে আমার আত্মীয় পাশাং ফুটার এবং শেরপা এ্যাসোসিয়েশনের লেখাপড়া জানা ছেলে লাকপা শেরিং কে সঙ্গে নিয়ে চারদিন আগে তারা কাঠমাণ্ডু আসে।

উন্মাদ জনতা আমাকে বেশিক্ষণ তাদের সঙ্গে থাকতে দিল না। জীপ থেকে নামিয়ে আমাকে একটা রথের মত দেখতে গাড়িতে তুলে দিলে। এতক্ষণ আমি বাকিদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিলাম। রথে উঠে দেখি জন হান্ট আর হিলারী সহ বাকিরাও সেখানে রয়েছে। রথটা ঘোড়ায় টানছিল। আমরা ধীরে ধীরে শহরে প্রবেশ করছি, লোকের ভিড় বাড়তে বাড়তে জনস্রোতের আকার নিল। জনতা আমাদের দিকে চাল, টাকা, আবীর ছুঁড়ছে, ধাতুর তৈরি টাকা এত বেশি বেশি করে মাথায় এসে লাগছে যে আমার মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল। কিন্তু কিছুই করার নেই, শুধু হাসি হাসি মুখে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছি।

এ রকম হৈ হট্টগোলের মাঝখানে কত কাণ্ড যে ঘটে গেল তার সবকিছু আজ আর আমার

মনে নেই। অভিযানের ময়লা পোশাকেই আমাদের রাজা ত্রিভুবননারায়ণের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি আমাকে 'নেপাল তারা' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করলেন। জন হান্ট এবং হিলারীকে অন্য কিছু সম্মান প্রদান করলেন (যা এখন আর আমার মনে নেই), যেটা নেপাল তারার মত ততটা সম্মানের নয়। আবার ইংল্যাণ্ডের রাণী জন হান্ট এবং হিলারীকে 'নাইটহুড' দিলেন আর আমাকে দিলেন কেবলমাত্র জর্জ মেডেল। অন্য অনেক কিছুর মত এই সম্মান প্রদর্শনও সেই সময়ে নানা ঝঞ্ঝাট আর ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করেছিল। উপাধিদানের মাধ্যমে কাকে কোথায় ছোট করা অথবা বড় করে দেখানো হল এটাই হল অতি উৎসাহীদের আলোচনার বিষয়। আমাকে নিয়ে যারা বেশি গর্ববোধ করে তারা বলে বেড়াতে লাগল যে নাইটহুড উপাধি না দিয়ে আমাকে ছোট করা হয়েছে। এখন ভারতবর্ষ স্বাধীন। ভারতের কোনও নাগরিকের পক্ষে বিদেশী উপাধি গ্রহণ করা মুশকিল, কাজেই নাইটহুড দিলে তা আমাকে বিব্রত করত। আর তা ছাড়া উপাধি পেয়ে কি আমার দুটো হাত বের হত, না ডানা গজাত?

আমাদের এই সাফল্য ক্রমশ রাজনীতির কালো মেঘে ছেয়ে যেতে লাগল। যা কিছু ঘটেছে তাতেই একটা রাজনীতির ছোঁয়া দেবার চেষ্টা চলছিল। নেপালের মানুষ আমাকে যে সম্মান দিয়েছে তা আমি জীবনে ভুলব না। আমাকে বীর হিসেবে প্রমাণ করতে গিয়ে তারা মাঝে মাঝে ইংরেজদের অবজ্ঞা করছে। ইংরেজরা যে আমদের সম্মানীয় অতিথি সে কথা ভুলে মাঝে মাঝে এমন কথা বলেছে যে আমি খুবই লজ্জিত হয়েছি। শুধু তাই নয়, এই সব কথায় আমার এবং ইংরেজদের মধ্যে বড় রকমের ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। তারা বলেছে আমি নাকি হিলারীকে টেনে হিঁচড়ে তুলেছি, আবার কেউ বলেছে হিলারী নাকি উঠতেই পারেনি, আমি একাই আরোহণ করেছি। এই কথাগুলো লোকে বিশ্বাস করেছে কারণ যে কাগজে আমাকে দিয়ে সই করানো হয়েছিল তাতে এসব কথা লেখা ছিল। আমি লেখাপড়া জানিনা, আমাকে দিয়ে জোর করে কোথায় সই করিয়ে নেওয়া হয়েছে তার দোষ কি আমার? এদিকে এসব কথাবার্তা শুনে জন হান্ট রাগের মাথায় নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না। তিনি বলে বসলেন যে বীর আখ্যা পাওয়া তো দূরের কথা তেনজিং একজন পর্বতারোহী হবার যোগ্যই নয়। ব্যস! আগুনে ঘি পড়ার মত অবস্থা হল। নেপালী আর ভারতীয় সাংবাদিকেরা এর প্রতিবাদে আমাকে দিয়ে কিছু একটা বলিয়ে নেবার জন্যে উঠে পড়ে লাগল। আর আমিও জন হান্টের কথায় মর্মাহত হয়ে দু এক কথা বলে দিলাম। পরে বুঝতে পেরেছিলাম যে এগুলো বলা আমার উচিত হয়নি কিন্তু তখন আর অনুশোচনা করা ছাড়া কিছুই করার ছিল না। অথচ আমি কিম্বা ইংরেজরা কেউই এভারেস্ট বিজয়ের মত এতবড় সাফল্যকে ছোট করে দেখাতে চাইনি। অবশেষে ২২শে জুন নেপাল রাজের প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে স্বীকারোক্তির একটা বয়ান তৈরি করে তাতে আমাকে এবং হিলারীকে দিয়ে সই করানো হল। হিলারী যে কপিতে সই করল সেটা আমাকে দেওয়া হল আর আমি যে কপিতে সই করলাম সেটা দেওয়া হল হিলারীকে। যেটা আমার কাছে আছে তাতে লেখা আছে!

On May the 29th Tenzing Sherpa and I left our high Camp on Mount Everest for our attempt on the summit.

As we climbed upwards to the South Summit first one and then the other would take a turn at leading.

We crossed over the South Summit and moved along the summit ridge. We reached the summit almost together.

We embraced each other, overjoyed at our success; then I took photographs of Tenzing holding aloft the flags of Great Britain, Nepal, United Nations and India.

(Signed) E.P. HILLARY

'২৯শে মে আমি এবং তেনজিং শেরপা মাউন্ট এভারেস্টের শীর্ষ শিবির থেকে শীর্ষ-আরোহণের জন্যে রওনা হলাম।

সাউথ সামিটের (দক্ষিণ শীর্ষ) পথে প্রথমে একজন এবং পরে অন্যজন এইভাবে আমরা আরোহণে নেতৃত্ব দিচ্ছিলাম।

সাউথ সামিট অতিক্রম করে আমরা মূল শীর্ষের গিরিশিরা বরাবর আরোহণ শুরু করলাম। অবশেষে উভয়ে প্রায় একসঙ্গে শীর্ষ আরোহণ করলাম।

সাফল্যে অভিভূত হয়ে আমরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলাম, তারপর আমি বৃটেন,নেপাল, রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং ভারতের পতাকা হাতে তেনজিং এর ছবি তুললাম।

(স্বাঃ) ই. পি. হিলারি।

এই বিবৃতি একদম সত্যি। প্রায় একসঙ্গে আরোহণ করেছিলাম—কথাটা যে কত সত্যি তা আমি লিখে বোঝাতে পারব না। অবশ্য এ বিষয়ে আমি আগেই বর্ণনা দিয়েছি।

কে আগে? আর আমি কোনও দেশের নাগরিক? এই দুটো প্রশ্ন ভাঙ্গা রেকর্ডের মত দিনরাত কানের কাছে বাজতে বাজতে আমাকে পাগল করে ছেড়েছিল। একটা পর্বতারোহণের সাফল্যের সঙ্গে 'কোন্ দেশের লোক' এই প্রশ্নটার যে কি সম্বন্ধ তা আমি বুঝতে পারিনা। তবু প্রশ্নটা শুনতেই হয়েছে। এবং বারেবারে। অবশেষে নেপালের প্রধানমন্ত্রী শ্রী কৈরালার সঙ্গে যখন এ বিষয়ে কথা হল, তখন আমি সবিনয়ে জানালাম যে আমি নেপালকে ভালবাসি। আমার জন্ম নেপালে। কিন্তু বহু বছর আমি ভারতবর্ষে বাস করছি আর আমার মেয়েরা সেখানেই জন্মেছে। তাদের চালচলন লেখাপড়া সবই ভারতীয় ধরনের। আমি ভারতেই থাকতে চাই। শ্রী কৈরালা এবং অন্য মন্ত্রীরা খুবই দয়ালু মানুষ। আমার উত্তর শুনে তিনি আমাকে দ্বিতীয় কোনও প্রশ্ন করেননি। অন্যদের মত কোনও জোর করেন নি। শুধু বলেছিলেন, তুমি ইচ্ছে করলে নেপালেও বাস করতে পার। নেপাল সরকার তোমাকে একটা বাড়ি করে দেবে আর সব রকমের সুযোগ সুবিধা দেবে। অবশ্য থাকতে না চাইলে আমি রাগ করব না। শুধু যেখানেই থাক ভাল থেক, সুখে থেক। তবু একথা আমি চিরদিন মনে রাখব যে এভারেস্ট বিজয়ের সেই উন্মাদনার দিনগুলোতে আমি যখন নানা ঝামেলায় ব্যতিব্যস্ত তখন তাঁরা আমাকে স্নেহচ্ছায়ায় আগলে রেখেছিলেন। তাই কাঠমাণ্ডুর সাংবাদিক সম্মেলনে আমি

বললাম, "আমি নেপালের কোলে জন্মেছি বড় হয়েছি ভারতের স্নেহ ছায়ায়। আমি উভয়েরই সন্তান।"

কাঠমাণ্ডুতে এক সপ্তাহ ছিলাম। সেখানে প্রতিদিনই উৎসব আর প্রতিদিনই নতুন নতুন সমস্যা। এই কদিন শেরপাদের আর আস্তাবল বা গ্যারেজে শুতে হয়নি। আমরা নেপাল সরকারের অতিথিশালায় স্থান পেয়েছিলাম। এর মধ্যে একদিন বৃটিশ দূতাবাস থেকে আমাদের নিমন্ত্রণ জানানো হল। কিন্তু আমি সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করলাম না। না যাবার পিছনে অবশ্য একটা কারণ আছে। ১৯৪৯ সালে টিলম্যানের সঙ্গে অভিযানে এসে আমি দলের সঙ্গে ঐ দূতাবাসে ছিলাম। এবার গতবছর যখন সুইসদের সঙ্গে কাঠমাণ্ডু এসেছিলাম তখন একদিন কোথাও জায়গা না পেয়ে বৃটিশ দূতাবাসে গিয়ে অনুরোধ করেছিলাম যদি রাতটুকু থাকার একটা ব্যবস্থা হয়। এতটা আশা করা আমার উচিত হয়নি। তারা আমার অনুরোধ রাখেনি। তখন বৃটিশ দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারী ছিল কর্নেল প্রাউড। এখন যে ফার্স্ট সেক্রেটারীটি আমাদের নিমন্ত্রণ করেছো তিনি ঐ কর্নেল প্রাউড। কাজেই এ লোকের নিমন্ত্রণ রক্ষা করা আমি প্রয়োজন মনে করিনি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি আমার সহ অভিযাত্রীদের অসম্মান করতেচেয়েছি। তবু আমার এই না যাওয়া নিয়ে অনেক কথা হয়েছে।

কাঠমাণ্ডু থেকে রাজা ত্রিভুবননারায়ণের ব্যক্তিগত প্লেনে আমি কলকাতা এলাম। সঙ্গে আমার পরিবারের লোকজন আর লাকপা শেরিং, তখন সে আমার ব্যক্তিগত পরামর্শদাতার কাজ করছিল। বাকিরা অন্যপথে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হল। কলকাতায় আমাদের রাজভবনে থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। কলকাতায় পৌঁছবার সাথে সাথে আবার উৎসাহী জনতার ভিড়, আবার তেনজিং জিন্দাবাদ ... এবং আরও অনেক কিছু। এখানে এসে মিত্রবাবুর সঙ্গে দেখা হল, আমি আগেই মিত্রবাবুকে চিঠি দিয়েছিলাম যাতে তিনি কলকাতা চলে আসেন। মিত্রবাবুকে কাছে পেয়ে আমার প্রথম কাজ হল তাঁর হাতে আমার গলায় জড়ানো ল্যাম্বার্টের দেওয়া মাফলারটা তুলে দেওয়া। তাঁকে অনুরোধ করলাম তিনি যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা সুইজারল্যান্ডে আমার প্রিয়তম বন্ধু ল্যাম্বার্টকে পাঠিয়ে দেন এভারেস্টের স্মৃতি হিসেবে। কলকাতায় এসে ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধি আমার এভারেস্ট আরোহণের কাহিনী লিখে নিল, আমার সঙ্গে তাদের এরকম চুক্তিই হয়েছিল। আমার ইংল্যাণ্ড যাওয়া নিয়ে এক সমস্যা দেখা দিল। আমি ঠিক করলাম স্ত্রী এবং কন্যাদের সঙ্গে না নিয়ে আমি সেখানে যাব না। কিন্তু অভিযাত্রী দলের কাছে এত টাকা ছিল না যে তারা আমার পরিবারের সকলের খরচ দিতে পারে। এর মধ্যে 'ডেইলি এক্সপ্রেস' থেকে একটা প্রস্তাব এল। যদি আমি তাদের কাছে পুরো কাহিনী বর্ণনা করি তাদের কাগজে লেখার জন্যে তাহলে তারা আমার পরিবারের ইংল্যান্ড যাবার সব খরচ দিতে রাজি আছে। কিন্তু ভাবনা চিন্তা করে আমি তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম—আমার ভয় হল, এর মধ্যে কোনও রাজনৈতিক অভিসন্ধি আছে। নেপালে আমার অভিজ্ঞতা ভাল হয়নি। অভিযানের সব সদস্যই তখন দিল্লিতে। আমিও দিল্লি গেলাম।

দিল্লির বিমান বন্দরে আমাদের অভিনন্দন জানাবার জন্যে এত লোকের ভিড় হয়েছিল যে এর আগে আমি মানুষের এই বিরাট সমাবেশ আর দেখিনি। দিল্লীতে নেপালের দূতাবাসে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। ঐ দিন রাত্রেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। আমার জীবনে এটা একটা স্মরণীয় দিন। প্রফেসার তুচ্চির কথা মনে পড়ে গেল। তিনিই প্রথম পণ্ডিত নেহেরুর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবার কথা বলেছিলেন। আমার স্বপ্ন আর প্রত্যাশার সঙ্গে এই সাক্ষাৎকার একেবারে মিলে গেল। অন্যদের মত, আমাকে কিভাবে ব্যবহার করা যায় তা না ভেবে, পণ্ডিতজী প্রথম থেকেই আমাকে পুত্রের মত স্নেহ করতেন। তিনি সদাই চেষ্টা করতেন যাতে আমার কোনও অসুবিধা না হয়। অভ্যর্থনার পরে তিনি আমাকে তাঁর অফিসে ডেকে পাঠালেন। আমি সেখানে যেতে তিনি আমাকে বললেন, তোমাকে লণ্ডনে যেতেই হবে। কারণ এর মধ্যেই এভারেস্ট আরোহণ নিয়ে অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। পবিত্র হিমালয় এবং এভারেস্টের স্বার্থে এখন আমাদের চেষ্টা করতে হবে যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে, তার যেন অবসান হয়। তোমার এবং তোমার পরিবারের সকলের ইংল্যাণ্ডে যাবার ব্যবস্থা করা হবে, তুমি চিন্তা করো না। পণ্ডিতজীর কথায় আমি আনন্দের সঙ্গে রাজি হলাম।

শুধু তাই নয়, পরের দিন তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আলমারি খুলে নিজের জামা, প্যান্ট, কোট উপহার দিলেন। এর মধ্যে অনেকগুলোই তাঁর বাবার ব্যবহার করা জামা প্যান্ট ছিল। এগুলো তিনি স্মৃতি হিসেবে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। জামা প্যান্টগুলো আমার শরীরে সুন্দর মানিয়ে গেল। আং লামুকে নোট বই আর একটা বর্ষাতি উপহার দিয়ে হেসে বল্লেন, এটা তোমার কাছে রেখে দিও, লণ্ডনে খুব বৃষ্টি হয় কাজে লাগবে। তাঁর আলমারিতে রাখা একটা গান্ধী টুপি দেখে সেটা নিতে চাইলাম। কিন্তু তিনি দিতে রাজি হলেন না। বললেন, তুমি এভারেস্ট বিজয়ী অভিযাত্রী। এই টুপি মাথায় পরলে তোমাকে সবাই রাজনীতির লোক বলবে। আমি চাই তুমি সকল রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাক। শেষকালে তিনি আমাকে একটা ব্রিফকেস উপহার দিলেন যেটা হাতে রাখলে আমাকে বেশ কেউকেটা মনে হবে। আর একথা তো সত্যি যে আমি এখন আর একজন দরিদ্র মালবাহক নই, পরন্তু শেরপা তেনজিং নোরগে—যে প্রথম এভারেস্ট আরোহণ করেছে।

দিল্লি ছাড়ার আগে আমার পাসপোর্ট দরকার। একটা নয় আমাকে দু-দুটো পাসপোর্ট দেওয়া হল। একটা নেপালের অন্যটা ভারতের। আর আমি ঠিক এমনটাই চেয়েছিলাম। কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা পশ্চিমের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমার সঙ্গে স্ত্রী এবং মেয়েরা বাদেও লাকপা শেরিং ছিল, সে আমার উপদেষ্টা এবং সচিব। পর্বতারোহী শেরপারা কাঠমাণ্ডু থেকেই দার্জিলিং ফিরে গেছে। আমরা বি.ও.এ.সি-র একটি বিমানে রওনা হলাম। মিসেস হান্ট নেপাল এসেছিলেন তাঁর স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে, তিনিও ঐ একই বিমানে আমাদের সঙ্গে দেশে ফিরছেন। বৃটিশ পর্বতারোহীরাও রয়েছেন একই বিমানে। আমাদের যাত্রার প্রথম বিরতি করাচি। দলে দলে লোক এসেছে বিমান বন্দরে আমাদের দেখবার জন্যে। সেখান থেকে বাগদাদ, কায়রো, রোম হয়ে আমরা চলেছি লণ্ডন। [illegible]

পৃথিবীতে এই প্রথম এলাম। রোমে আমাদের প্লেনের ইঞ্জিনে গণ্ডগোল দেখা দেওয়াতে সে রাত আমরা সেখানেই থাকলাম। ভারতীয় এবং বৃটিশ দূতাবাসের কর্মীরা আমাদের দেখাশুনো করার ভার নিল। পরদিন সকালে প্লেনে ওঠার আগে জন হান্টকে কেমন উদ্বিগ্ন মনে হল। খবর নিয়ে জানলাম ইউনাইটেড প্রেসকে দেওয়া আমার সাক্ষাৎকারের প্রথম অংশই ঐ দিনই ছাপা হয়েছে। ঐ সাক্ষাৎকারে আমি অভিযাত্রী এবং শেরপাদের মধ্যে কিছু ভুল বোঝাবুঝির কথা বলেছিলাম। চলার পথেই তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতে এলেন, এবং আমরা ঘটে যাওয়া ঘটনা সম্পর্কে খোলামেলা কথা বলতে লাগলাম। আমি অভিজ্ঞ পর্বতারোহী নই বলে তিনি সংবাদপত্রে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তাতে আমি কতটা আহত হয়েছিলাম, সেটা তাকে জানালাম—তিনিও ব্যাখ্যা করলেন তাঁর সমস্যাগুলো। মেজর উইলি ইতোমধ্যেই আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তিনি আমাকে বুঝিয়েছিলেন যে ঘটনাগুলোর পেছনে ইংরেজদের কোন বদ মতলব কাজ করছিল না, এবং আমি এ ব্যাপারে একমত হয়েছিলাম। হান্টকেও আমি সে কথা বললাম। কিছু ঝঞ্ঝাট হয়েছিল এটা তো সত্যি, আমি শুধু নিজের মত করে তা ব্যাখ্যা করেছি—কোনও রাগ থেকে নয়—কোনও ফায়দা তোলার জন্যেও নয়। এই আলোচনা আমাদের উভয়ের পক্ষেই শুভ হয়েছিল।

রোমের পর জুরিখ। যদিও সেখানে আমাদের প্লেন অল্প কিছুক্ষণের জন্যে থেমেছিল তবু ঐ অল্প সময়েই বিমান বন্দর মিলন উৎসবের চেহারা নিয়েছিল। সুইজারল্যান্ডের বন্ধুরা আমার জন্যে সেখানে অপেক্ষা করছিল। এভারেস্ট আরোহণ করার সময় থেকেই আমি প্রতি নিয়ত যার কথা ভেবেছি আমার প্রিয়তম বন্ধু তার বিরাট চেহারা আর বড় মন নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে।

সা ভা বিয়েন.....ল্যাম্বার্টের বিরাট শরীরের আলিঙ্গনে আমার ছোট দেহ হারিয়ে গেল। বিদায়ক্ষণ উপস্থিত, আমরা ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। লণ্ডন বিমান বন্দরে আমাদের প্লেন এসে নামল। জন হান্ট আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি যদি সবার আগে ইংল্যাণ্ডের পতাকা হাতে প্লেন থেকে নামেন তাহলে আমার কোনও আপত্তি আছে কিনা? আমি সবিনয়ে আমার সম্মতি জানালাম। আইস এ্যাক্সে জড়ানো বৃটেনের পতাকা হাতে জন হান্ট প্রথম, তার পেছনে আমরা নেমে এলাম। বিশাল জনতা আমাদের দেখে হাত নেড়ে উল্লাস জানাতে লাগল।

ইংল্যাণ্ডে পৌঁছে বন্ধুরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নিজের নিজের বাড়ি চলে গেল। আমি স্ত্রী কন্যাদের নিয়ে লণ্ডনে রয়ে গেলাম। সেখানে ইন্ডিয়ান সার্ভিস ক্লাবে আমার থাকার ব্যবস্থা হল। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত মিঃ বি.জি. খের আমাদের জন্যে সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। সারাদিন ব্যস্ততার মধ্যে কেটে যায়, নানা জনে দেখা করতে আসে। এরই ফাঁকে ফাঁকে সংবাদপত্রের লোকজন আসে, নানা প্রশ্ন করে, ছবি তোলে' ইংরেজরা তাদের ভারতীয় অতিথিদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে সদাই ব্যস্ত। তাদের ব্যবহারও নম্র। নেপালে আমার ইংরেজ বন্ধুরা যে ব্যবহার পেয়েছে তার সঙ্গে যখন আমার প্রতি ওদের ব্যবহারের তুলনা করি তখন আমি সত্যিই লজ্জা পাই। এরই মধ্যে একদিন রেডিওতে আর একদিন টি.ভিতে আমার সাক্ষাৎকার

প্রচার করা হল। এইভাবে অভ্যর্থনা, নিমন্ত্রণ আর নানা জনের সঙ্গে কথা বলে দিন কেটে যায়। আমি এখানে সবচেয়ে সমস্যায় পড়লাম সাংবাদিকদের নিয়ে। সব জিজ্ঞাসার শেষে তারা একটা প্রশ্ন করবেই আর তা হল এভারেস্টের শীর্ষে অরোহণ করে আমার কি অনুভূতি হয়েছিল। বারবার এই একই প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে আমি এতই বিরক্ত হয়ে পড়েছিলাম যে থাকতে না পেরে একদিন এক সাংবাদিক সমাবেশে বললাম, দেখুন এরপর আপনারা আমার হয়ে একবার এভারেস্ট শীর্ষে আরোহণ করুন এবং নেমে এসে এক হাজার একবার উত্তর দিন যে আপনাদের কি অনুভূতি হয়েছিল। আমার মনে হয় শুধুমাত্র তখনই আপনারা বুঝতে পারবেন যে তখন আমার কি মনে হয়েছিল আর এখন কি মনে হচ্ছে।

কোথা দিয়ে ষোলটা দিন পার হয়ে গেল। তবে একটাই দুঃখ যে লণ্ডনে পৌঁছে পেম পেম অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হল আর আমার লণ্ডনে থাকার বেশিটা সময় তাঁকে হাসপাতালেই কাটাতে হল। আং লামু আর নিমাকে নিয়ে আমি দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখে বেড়াতাম। কিন্তু আং লামু সবচেয়ে আনন্দ পেত কেনাকাটা করার সুযোগ পেলে। বহু মানুষ আমাদের জন্যে নানা উপহার সামগ্রী নিয়ে আসত, সেগুলো নিতে আমার বেশ সংকোচ হত। কিন্তু আমার স্ত্রীর সে সব কোনও ব্যাপার নেই, উপহার গ্রহণে তার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। এর মধ্যে একদিন একটা দোকানে ঢুকেছি কিছু কেনাকাটা করতে। দোকানের মালিক আমাকে দেখে চিনতে পেরেছেন, তার শখ হল আমাকে কিছু উপহার দেবেন। একথা শুনে নিমা একটা দামী রোলিফ্লেক্স ক্যামেরা তুলে নিল। আমি বিব্রত হয়ে বললাম, "নিমা ওটা নয়, এটা নাও।" বলে একটা অতি সাধারণ ক্যামেরা তার হাতে দিলাম। বুঝলাম তার রাগ হয়েছে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিয়ে নিল। পরে দার্জিলিং ফিরে সে মিত্রবাবুকে বলল, জান কাকু, আমি একটা ভাল ক্যামেরা নিতে গেলাম বাবা নিতে দিল না। আমি উত্তর দিলাম, "তোমরা মেয়েরা চিরকালই লোভী। কেউ কিছু দিতে চাইলে অমন কাঙ্গালের মত ব্যবহার করা উচিত নয়। লোভ সম্বরণ করা উচিত।"

জন হান্ট তাঁর দেশের বাড়িতে যাবাব জন্যে আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন। পেম পেম তখনও হাসপাতালে, ওকে ছেড়ে বাইরে কোথাও যেতে পারলাম না। তবে মেজর উইলির বাড়ি গিয়েছিলাম, উনি কাছেই থাকতেন। আমার সঙ্গে এরিক শিপটন এবং হ্যগ রাটলেজের সঙ্গে দেখা হল। দেখা হতে আমরা সবাই খুব খুশি হলাম। আমি যখন চিত্রলে ছিলাম তখন ডঃ এন. ডি. জেকীল আমাকে খুব সাহায্য করেছিলেন। তিনি আমাকে ভালবাসতেন। কিন্তু তিনি আমাকে কতটা ভালবাসতেন তা জানতে পারলাম যখন আমার এখানে আসবার সংবাদ পেয়ে তিনি পাঁচশো মাইল দূর থেকে এসেছেন দেখা করতে। তাঁর এই আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এইভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল। যখন কোনও কাজ থাকে না, তখন একা একা ঘুরে বেড়াই। পরনে থাকে ইউরোপীয় পোশাক যাতে কেউ চিনতে না পারে। তবে কোথাও নিমন্ত্রণ থাকলে পণ্ডিত নেহেরুর দেওয়া ভারতীয় পোশাকে হাজির হতাম।

ধীরে ধীরে অভিযানের সদস্যারা লন্ডনে এসে হাজির হল। অবশেষে সেই দিন এল, আমবা যাব বাকিংহাম প্রাসাদে রাণীকে আমদের শ্রদ্ধা জানাতে। আমরা চলেছি, রাস্তার

দুধারে হাজার হাজার মানুষ আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। প্রাসাদে প্রবেশ করার আগে লাল রংয়ের কোট আর মাথায় ফারের টুপি পরে গার্ডরা দাঁড়িয়ে আছে দুধারে সার দিয়ে। দারুণ সুন্দর দেখতে লাগছে। প্রথমে আমরা প্রাসাদের বাগানে প্রবেশ করলাম। সেখানে আমাদের চা পানে আপ্যায়িত করা হল। বহু লোকের ভিড়। দম বন্ধ হয়ে আসে। আমার যদি এমন অবস্থা হয় তবে না জানি আং লামুর কি অবস্থা হচ্ছে। চা পানের পর আমরা প্রাসাদের অভ্যর্থনা গৃহে গেলাম। সেখানে রানী এলিজাবেথ এবং এডিনবরার ডিউক আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। রাণী আমাদের পুরস্কার দিলেন, মেডেল দিলেন। এবার পানীয় এল। পানীয়ে চুমুক দিয়ে আমি সদ্য সমাপ্ত এভারেস্ট অভিযানের দিনগুলোতে ফিরে গেলাম—লেমন জুস! রাণী আমার সঙ্গে অনেক গল্প করলেন, আমার নানা অভিযানের খবরাখবর নিলেন। কর্নেল হান্ট হিন্দুস্তানী ভাষা কিছু কিছু জানতেন, তাই আমাকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে এলেন। আমি অবশ্য তাঁর সাহায্য ছাড়াই রানীর সঙ্গে কথা বললাম, ইংরেজীতে। এরপর ডিউক রাত্রের আহারে নিমন্ত্রণ করলেন। রাতের আহারের শেষে আমরা প্রাসাদ থেকে বিদায় নিলাম। রানীর দেওয়া অভ্যর্থনা শেষ হবার পরের দিন থেকে আবার শুরু হল নিমন্ত্রণ রক্ষা আর অভ্যর্থনা সভায় হাজির থাকা। বেশির ভাগ নিমন্ত্রণই আসে বিভিন্ন দেশের দূতাবাস থেকে। পানীয় বলতে চা আব লেমন জুস। আচ্ছা এর বদলে ছাং হলে কি হত আমার?

এই কদিন ইংল্যান্ডে বৃটিশ বন্ধুদের সহৃদয় আতিথেয়তা আমার মনের সব বোঝা হাল্কা করে দিয়েছে। বুঝলাম কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের জন্যেই আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। কর্নেল হান্টকে কথা দিলাম যে তিনি যদি ভবিষ্যতে হিমালয়ে কোনও অভিযান করতে চান তাহলে আমি আমার সাধ্যমত তাঁকে সাহায্য করব।

এবার দেশে ফেরার পালা, অবশ্য তার আগে সুইজারল্যান্ড ঘুরে যাব। সকলে এসে বিদায় জানালেন। 'সুইস ফাউন্ডেশন ফর এলপাইন রিসার্চ' আমাকে সেখানে দু'সপ্তাহের জন্য নিমন্ত্রণ জানিয়েছে। এই সংস্থাই ১৯৫২ সালের দুটো এভারেস্ট অভিযান করেছিল। লণ্ডন বিমানবন্দরে সকল বন্ধু এসেছে আমাদের বিদায় জানাতে। প্লেনে পরিচিত বলতে আমার স্ত্রী কন্যা আর লাকপা শেরিং।

—বিদায় বন্ধু! তোমার যাত্রা শুভ হোক। তারা হাত নাড়ছে। প্লেন মাটি ছেড়ে আকাশে উড়ল।

জুরিখে সুন্দর এক ঘরোয়া পরিবেশে আমাদের অভ্যর্থনা জানানো হল। এখানে এক রাত্রি থেকে পুরনো বন্ধুদেব সঙ্গে আল্পসের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। সেখানে ভ্রমণ ছাড়াও পর্বতারোহণের সুযোগ পেলাম। সুইস ফাউণ্ডেশনের মিঃ আর্নস্ট ফিস এবং তাঁর স্ত্রী আমার সঙ্গে ছিলেন সফর সঙ্গী হিসেবে। রোসেনলুই পর্বতের বিখ্যাত গাইড আর্নল্ড গ্লাথার্ড এর পর্বতারোহণ শিক্ষা দেবার জন্যে একটা স্কুল আছে। ল্যাম্বার্টের সঙ্গে সেখানে আমরা সেমিলিস্টক নামে একটা খাড়া পাহাড়ে আরোহণ করলাম। এর পর অন্য একটি শিখরে। আমরা দুজন পর্বতশীর্ষে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছি বহু নিচে সমতলের দিকে। আমার মন চলে গেছে এক বছর আগের সেই দুর্যোগপূর্ণ দিনটিতে যখন আমি আর ল্যাম্বার্ট এভারেস্ট শীর্ষের অল্প নিচে

থেকে ফিরে এসেছিলাম। যদি আবহাওয়া আর একটু ভাল হত সেদিন তবে আমাদের দুই বন্ধুকে হয়ত ফিরে আসতে হত না। জানিনা এই মুহূর্তে ল্যাম্বার্টও আমারই মত একই কথা ভাবছে কিনা!

পরিমানে খুব বেশি নয় তবে পর্বতারোহণ পর্বটা খুব ভাল লাগল। এখানকার উচ্চতা এবং পারস্পরিক দূরত্ব অনেক কম, কিন্তু আমার দেশের সঙ্গে এখানকার উপত্যকাগুলোর মিল আমাকে মুগ্ধ করল। সুইজারল্যাণ্ডে একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। এখনে ছেলে, বুড়ো, বাচ্চা, যুবক, যুবতী সবাই পাহাড়ে চড়তে খুব ভালবাসে। পাহাড়ে চড়া এখানে এক অতি প্রিয় খেলা।

একদিন আমরা চামনিক্স-এ কাটালাম। চামনিক্স ফ্রান্সের সীমান্তে অবস্থিত। ১৯৫১ সালে যাঁদের সঙ্গে নন্দাদেবী অভিযানে গিয়েছিলাম এখানে এসে তাঁদের অনেকের সঙ্গেই দেখা হল। ১৯৫০ সালে অন্নপূর্ণা অভিযানের সফল নেতা মরিস্ হেরজগের সঙ্গে ভাগ্যক্রমে এখানেই দেখা হল। সময় কম তাই মন্ট-ব্লাঁকে চোখের দেখা দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হল। চামনিক্সর আশে পাশে এত ভিড় যে তাকে পাহাড় না বলে রেল স্টেশন বলাই ভাল।

দেখতে দেখতে দু'সপ্তাহ দ্রুত কেটে গেল। এবার ঘরে ফেরার পালা। বন্ধুদের বিদায় জানিয়ে ভারতমুখী প্লেনে চেপে বসলাম।

পয়লা মার্চ আমি দার্জিলিং ছেড়েছিলাম আর এটা অগাস্ট মাস। এর মধ্যে একদিনও বিশ্রাম পাইনি। যে তেনজিং এভারেস্ট আরোহণ করেছিল আজ তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে' এর মধ্যে অর্দ্ধেক পৃথিবী ঘোরা হয়ে গেল। এরই মধ্যে কত কি না ঘটে গেল জীবনে। লোকে যাই বলুক, তোমরা জেনে রেখ আমি সেই পুরনো তেনজিংই আছি।....

এবার ঘরে ফেরা। আবার এক দফা অভিনন্দন, হাজার লোকের ভিড়, হাজার জিন্দাবাদ। তারপর?

আমি স্বপ্ন দেখতাম এভারেস্ট আরোহণ করব, সেই স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। এবার আমাকে আমার নিজের মত বাঁচতে হবে, একান্তই আমার মত। যেমন ছিল আগের দিনগুলোতে।

চিরদিনের টাইগার হিল

আবার ভারতবর্ষ....।

নতুন দিল্লীতে পণ্ডিত নেহেরু এবং রাষ্ট্রপতি শ্রী রাজেন্দ্রপ্রসাদ আমার বিদেশ ভ্রমণের খুঁটিনাটি বিষয়ে খবর নিলেন। পণ্ডিতজী আমাকে বললেন আমি যেন প্রয়োজনে বিনা সঙ্কোচে তাঁর কাছে আসি। বুঝলাম সত্যি কোনও সমস্যা এলে তিনি আন্তরিকতার সঙ্গেই আমাকে সাহায্য করবেন।

হাজার হাজার মাইল ঘুরে এসে আবার দার্জিলিং, আমাদের প্রিয় টুংসুং বস্তি। এর মধ্যে যত উপহার পেয়েছি তার সবকিছু গুছিয়ে রাখার জায়গা নেই আমার এই ছোট্ট বাসাতে। প্রথমে হোটেলে উঠলাম, পরে একটা ছোট ফ্ল্যাটে। নতুন একটা বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা চলছে। নতুন ভাড়া করা বাড়িতে গুছিয়ে বসার সাথে চলছে লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা, আলাপ আলোচনা। এর মধ্যে এভারেস্ট অভিযানের শেরপারা এসে দেখা করল আমার সঙ্গে। তাদের সঙ্গে অভিযানের খুঁটিনাটি ঘটনা নিয়ে স্মৃতিচারণ করে দিন কাটে। অভ্যর্থনা, সাক্ষাৎকার আর ভিড়ও সমানে চলছে। বিশ্রাম চাইছি, পাচ্ছি না। স্বপ্নের মত দিনগুলো পার হয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে ক্লান্তি আর অবসাদ জমতে শুরু করেছে। এসব একঘেয়ে লাগছে এখন।

এভারেস্ট আরোহণের পর আমি তখন নেপালে, সেই সময় আমার বন্ধু রবি মিত্র পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে দার্জিলিংএ একটা পর্বতারোহণ স্কুল তৈরির সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছিল। রবিবাবু ডাঃ রায়কে বলেছিল যে তেনজিং হবে সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তার বুদ্ধিটা আমার মন্দ লাগেনি। ডাঃ রায়ও ব্যাপারটা মন দিয়ে শুনলেন, তাঁরও ইচ্ছা যে এমন একটা ইনস্টিটিউট তৈরি হোক। দেশে ফেরার কিছু পরে আমরা পর্বতারোহণ স্কুলের পরিকল্পনা করলাম। ঠিক হল স্কুলের নাম হবে হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট। ভারতীয়দের মধ্যে পর্বতারোহণ বিষয়ে ভালবাসা ও জ্ঞান বাড়িয়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের যুবক যুবতীরা এখানে পাহাড়ে চড়ার কৌশল শেখার সুযোগ পাবে। স্কুলের প্রশাসকের দায়িত্ব দেওয়া হল আমার পুরনো বন্ধু বন্দরপুঞ্ছ এবং নন্দাদেবী খ্যাত এন. ডি. জয়ালকে। পদোন্নতি হয়ে এখন সে মেজর জয়াল। আমি হলাম প্রধান প্রশিক্ষক। ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় দার্জিলিং। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে দার্জিলিং-এর আশেপাশে কোনও উপযুক্ত এলাকা নেই যেখানে পাহাড়ে চড়ার শিক্ষা দেওয়া যায়। এর জন্যে উপযুক্ত স্থান হল কাঞ্চনজঙ্ঘার উত্তর দিকে সিকিমে।

পর্বতারোহণের স্কুল চালাবার প্রকৃত অভিজ্ঞতা লাভের জন্যে আমরা সুইস ফাউন্ডেশন ফর এ্যালপাইন রিসার্চ এর আর্নল্ড গ্যাথার্ডের পরামর্শ নেব ঠিক করলাম। আমার বাড়ি ফেরার দুমাস পরে গ্যাথার্ড এলেন ভারতবর্ষে। তাঁকে নিয়ে আমি আর জয়াল সিকিম হিমালয়ে প্রশিক্ষণের উপযুক্ত স্থান খুঁজে বের করার জন্যে অভিযানে চললাম। অনেক খোঁজাখুঁজির পর [illegible]

সঙ্গে এখানে এসেছিলাম। এই জায়গাটা আমাদের পছন্দ হল। এখানে শৈলারোহণ করার মত পাহাড় যেমন রয়েছে তেমনি তুষারক্ষেত্রও আছে। ফিরে এসে আমরা আমাদের মতামত জানালাম। এরপর প্রশাসনিক আর আর্থিক সহযোগিতার প্রশ্ন। ঠিক হল আগামী শরৎকালে স্কুলের কাজ শুরু হবে।

আমরা নতুন জীবন শুরু করেছি। পুরনো জীবনটার চেয়ে একদম আলাদা। সারাদিন শুধু লোকজনের ভিড়। অভ্যর্থনা আর সাক্ষাৎকার। সবাই আসছে আমাকে সম্মান জানাতে, ভালবাসা জানাতে। কিন্তু সব কিছুর একটা সীমা আছে। মানুষের এই ভিড় মাঝে মাঝে আমাকে পাগল করে দেয়। দার্জিলিং-এর নির্জন পথে একা একা ঘুরে বেড়ানো ছিল আমার শখ, আর এখন রাতের অন্ধকার থাকতে আমি পথে বের হই। কারণ যদি কেউ একবার আমাকে দেখতে পায় তবে কিছুক্ষণের মধ্যে জনতার মিছিল লেগে যায় আমার পেছনে। বাড়িতে সাক্ষাৎপ্রার্থী আসার বিরাম নেই, আর তার কোনও সময় নেই। যে যখন খুশি চলে আসছে। এমনও হয় যে বাড়ির দরজা বন্ধ আছে, লোকজন জানালা দিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়ল। আর সাংবাদিকের দল, তাদের কথা না বলাই ভাল। ওরা আমাকে এক মিনিটের জন্যে নিস্তার দেবে না। আমি নিজে যা বলব, তা তাদের পছন্দ নয়। তারা তাদের মনের মত করে শুনতে চায়। এবপর যা লিখবে সেটা হয়ত আমি আদৌ বলিনি। সাংবাদিকদের আচরণ দেখে আমি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি, কেন জন হান্ট নেপালে অমন কঠোর বিবৃতি দিয়েছিলেন। সাংবাদিকদের একটা সাধারণ প্রশ্ন এখন আমার মুখস্ত হয়ে গেছে। সে প্রশ্ন হল, এরপর আপনি কোনও অভিযানে অংশ নেবেন? আরে! অংশ নেব কি ? অভিযান তো চলছে? আর তা হল সাক্ষাৎকার দেওয়া এবং ফটো তোলার দলের অভিযান। হাজার হাজার মানুষের সামনে মাঝে মাঝে নিজেকে খাঁচায় বন্দী জন্তুর মত মনে হয়। তখন নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়। থায়াংবোচের লামারা ঠিকই বলেছিল, পৃথিবীর মাথায় পা রাখার শাস্তি আমাকে পেতে হচ্ছে।

ইউনাইডেট প্রেসের সঙ্গে আমার চুক্তি মত কিছু টাকা পয়সা হাতে এসেছে। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ আমাকে অর্থ সাহায্য পাঠাচ্ছে। আমি আগের দরিদ্র অবস্থা কাটিয়ে একটু স্বচ্ছলতার মুখ দেখছি। আমার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। আং লামু এখন বর্ষার দিনে মাথায় দেবার একটা ছাতা কিনেছে। ছাতা মাথায় দিয়ে রাস্তায় বের হলে এখন অনেকেই বলাবলি করে তার অহংকার হয়েছে, নিজেকে আলাদা করে রাখতে চায়। তারা আমাকে এখন ঈর্ষা করে, আর কেউ কেউ ভালওবাসে। এখন রবি মিত্র আমার সচিবের কাজ করছেন। তাঁর মত নিঃস্বার্থ এবং বন্ধুবৎসল মানুষ আমি আর একটা দেখিনি। তাঁর পরিশ্রম আর পরামর্শেই জীবন খানিকটা সহজ হচ্ছে।

পাহাড়ের ঢালে আমরা একটা বাড়ি কিনলাম। সেখান থেকে সিকিমের মালভূমি আর কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। বাড়িটার টুকিটাকি মেরামতির কাজ করতে হবে। আং লামু বহু দিন ইংরেজদের বাড়িতে আয়ার কাজ করেছে। সেখান থেকে বিলিতি কায়দায় ঘর সাজাবার কায়দা শিখে এসেছে। বাড়িটাকে তার মনের মত করে সাজাতে চায়। আমি নিষেধ করি,

বলি. সাধারণ ভাবে জীবন কাটাতেই আমার বেশি ভাল লাগে। কিন্তু ইচ্ছে করলেই নিজের মত থাকা যায় না। এই সাধারণভাবে জীবন কাটাতে চাইবার জন্যে আমাকে সমালোচনা শুনতে হয়েছে। নানা অভিযান ও ভ্রমণ থেকে আমি যে জিনিসগুলো সংগ্রহ করে এনেছিলাম স্মৃতি হিসেবে সেগুলো সাজিয়ে রেখেছি আমার বাড়িতে। তখনও আমাকে শুনতে হয়েছে আমি নাকি বাড়িটাকে একটা সংগ্রহশালা করে তুলেছি।

আমার বাড়িতে এখন স্ত্রী আর মেয়েরা ছাড়াও রয়েছে দুটো ভাগ্নী। ওরা সংসারের কাজে তাদের মামীকে সাহায্য করে। তাদের মা অর্থাৎ আমার বোন লেমু কিপা এবং বাবা লামা নাওয়াংলা আমার সঙ্গে শোলো খুম্বু থেকে দার্জিলিং এসেছে। তারা টুংসুং-এ আমাদের পুরনো বাসায় আছে। প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসে। লামা নাওয়াং লা আমার বাড়ির প্রার্থনা ঘরের দেখাশুনো করেন। পাশাং ফুটারের মত বন্ধুরা বাড়ি মেরামতীর কাজে সাহায্য করছে। এখন সব সময়েই বাড়িতে লোকজনের ভিড়। আর আছে আমার ঘাঙ্গার। ঘাঙ্গার জাতে লাসা আপসো, একে আমি তিব্বত থেকে নিয়ে এসেছি। সদাই আমার পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করে।

এতদিন আমার মেয়েরা একটা নেপালী স্কুলে পড়তে যেত। এখন তাদের লরেটো কনভেন্টে ভর্তি করে দিয়েছি। আমি চাই ওরা ভাল করে ইংরেজী শিখুক আর দেশের অন্য ছেলে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করুক। ইংরেজী ভাষাটা শেখা এখন আমার খুব জরুরী হয়ে পড়েছে। একটা লিঙ্গুয়াফোন কিনেছি, তাছাড়া অনবরত বলতে বলতে আগের চেয়ে ভালই বলছি। বিভিন্ন জায়গা থেকে চিঠি আসে তার উত্তর লেখার জন্যেই আমাকে লেখা আর পড়াটাও শিখতে হবে। কিন্তু সময় বড় কম পাই। তবে অটোগ্রাফ দিতে দিতে এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে মনে হয় হয়ত ঘুমের মধ্যেও আমি অটোগ্রাফ দিতে পারব।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নিমন্ত্রণ আসে। আসে ভারতের বাইরে বার্মা এবং সিংহল থেকেও। আমি কলকাতা, দিল্লি, বোম্বাই, পাঞ্জাব আর দক্ষিণ ভারতে গেলাম। যেখানেই যাই শুধু মানুষের ভিড়। অনেকেই আমাকে ছুঁয়ে দেখতে চায়, কেউ মনে করে আমি দ্বিতীয় বুদ্ধ, আবার অনেকে আমাকে শিবের অবতার বলতে শুরু করল। দক্ষিণ ভারতে কয়েকজন বৃদ্ধা প্রদীপ জ্বেলে আমাকে আরতি করলেন। অনেকে ভাবে আমাকে ছুঁলে তার রোগ ভাল হয়ে যাবে। পাশ্চাত্যের সঙ্গে আমাদের দেশের লোকেদের এখানেই তফাৎ। আমার দেশের মানুষ অতিমানবিক কিছু শুনতে চায়, বিশ্বাস করতে চায়।

টাকা রোজগার করার অনেক সুযোগ আসছে। অনেক কোম্পানী বিজ্ঞাপনের কাজে আমাকে ব্যবহার করতে চায়, বিনিময়ে অনেক টাকা দেবে। দুটো কাজ আমি নিলাম, আর বেশি নয়। এভারেস্ট শীর্ষের খুব কাছ থেকে আমি কয়েকটা পাথর এনেছিলাম, এছাড়া আরও কিছু স্মারক আছে আমার কাছে। একথা জানাজানি হবার পর অনেক লোক মোটা টাকার বিনিময়ে সেগুলো পেতে চাইল। পাথরের কয়েকটা টুকরো দিয়েছি পণ্ডিত নেহেরুকে। এভারেস্ট আরোহণের সময় আমার পরনে যে পোশাক ছিল তার মধ্যে লাল মাফলারটা ল্যাম্বার্টকে পাঠিয়ে দিয়েছি। সরঞ্জামগুলো যত্ন করে রেখে দিয়েছি নিজের কাছে। এর থেকে

কিছুই দেব না আমি। এভারেস্ট আমার কাছে বড় আপন, আমি সকলের কাছে তাকে সস্তা করতে পারব না।

১৯৫৪ সালের গোড়ায় নিউইয়র্কের 'এক্সপ্লোরার্স ক্লাব' আমাকে আমেরিকা যাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানাল। আমন্ত্রণটা এল আমার গ্রীস দেশের বন্ধু প্রিন্স পিটারের মাধ্যমে, সে তখন কালিম্পং-এ বাস করছিল। পিটারের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল হাইনরিক হারার এর মাধ্যমে। আমার খুবই ইচ্ছে ছিল যে এই সুযোগে আমেরিকা ঘুরে আসব। কিন্তু তখন আমি অনেকগুলো ঝামেলায় জড়িয়ে আছি। প্রথমত আমার বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেছে, সেটা এখন মাঝ পথে। খরচ যা হবে ভেবেছিলাম তখনই তার চেয়ে বেশি খরচ হয়ে গেছে। হাতে টাকা পয়সা নেই। এছাড়া মাউন্টেনিয়ারিং ইনিস্টিটিউট তৈরির কাজ শুরু হয়েছে, সেটারও দেখাশুনা করতে হচ্ছে। কারণ আমি এখন এর জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে বেতন পাচ্ছি। স্ত্রী কন্যাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাবার খরচ আমাকেই বহন করতে হবে এবং সবচেয়ে অসুবিধে যেটা তা হল আমেরিকার এক্সপ্লোরার্স ক্লাব জানিয়েছে যে রবিবাবুর যাতায়াত খরচ তারা দিতে পারবে না। কিন্তু আমার পক্ষে রবিবাবুকে সঙ্গে না নিয়ে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। সবচেয়ে বড় কথা আমার বইটা পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়েছে, সেটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোথাও যাবার প্রশ্ন উঠতে পারে না। অবশেষে দুঃখের সঙ্গে আমি পিটারকে জানালাম যে সেই মুহূর্তে আমার পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়।

আমার আমেরিকা না যাওয়ার ব্যক্তিগত অসুবিধেগুলোর মানে দাঁড়াল বিপরীত। এর পেছনে সেই রাজনীতি। প্রচার করা হল যেহেতু আমেরিকা পাকিস্তানকে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র দিচ্ছে, তাই ভারত সরকার আমাকে সেখানে যেতে নিষেধ করেছে। অথচ ভারত সরকারের কেউই আমাকে, কিছুই বলেনি, এমনকি সামান্য উপদেশ পর্যন্ত দেয়নি। এই ধরনের অপপ্রচারে আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম। এই সময় আমেরিকার রাষ্ট্রদূত মিঃ জর্জ এ্যালেন দার্জিলিং এলেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমার না যাবার কারণগুলো বোঝালাম। তিনি বিবেচক মানুষ, মন দিয়ে আমার কথা শুনে আমাকে সান্ত্বনা দিলেন। এর কিছুদিন পর তিনি দ্বিতীয়বার দার্জিলিং এসে ন্যাশানাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির তরফ থেকে আমাকে হুবার্ড পদক দিলেন। সেই সময় খুব ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর সঙ্গে আমার অনেক কথা হল। আমেরিকা যাওয়া নিয়েও কথা হয়েছিল।

এভারেস্ট আরোহণ করার পর আমার মনে একটা ইচ্ছে দানা বেঁধেছে এবং সেটা হল আমার সমগ্র পর্বতারোহণ অভিযান নিয়ে একটা বই লেখা। আমি জানি যে বহু পর্বতারোহী আছেন যাঁরা তাঁদের পর্বতারোহণের অভিজ্ঞতা নিয়ে বই লিখেছেন। এর থেকে সাধারণ মানুষ অনেক কিছু জানতে পেরেছে, পর্বতারোহণের মত অভিযানে অংশ নিতে উৎসাহ পেয়েছে। কিন্তু আমি তো লেখাপড়া জানি না। একজন উপযুক্ত লেখক দরকার যে আমার কথা শুনে বইটা লিখবে। আমি চাই কাউকে একজন ভারতীয় লেখক। কিন্তু ইউনাইটেড প্রেস যাদের সঙ্গে আমি আগেই চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলাম তারা চাইছে একজন [illegible] এই কাজ করুক কারণ তাদের যুক্তি হল তাতে বইটার বিক্রি বাড়বে। ইউনাইটেড প্রেস যদি একজন [illegible]কে

একাজ করতে দিতে না চায় তবে আমারও পাশ্চাত্যের লোককে দিয়ে একাজ করাতে যথেষ্ট আপত্তি আছে। তার মানে আমি একথা বলতে চাই নি যে বিদেশীদের সম্বন্ধে আমার কোনও রাগ আছে। কিন্তু এভারেস্টের শেষ ধাপের আরোহণ নিয়ে যেভাবে তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছে আবার তার পুনরাবৃত্তি হোক আমি তা চাই না। আমি আমার মত করে আপনজনের সাহায্যে সেটা প্রকাশ করতে চাই। অবশেষে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হল যে বইটা আদৌ লেখা হবে কিনা তাই নিয়ে সন্দেহ দেখা দিল। এরই মধ্যে একটা বিভ্রান্তিকর খবর শুনে আমি খুব হতাশ হয়ে পড়লাম। ১৯৫৩ সালে আমি যখন সুইজারল্যান্ডে গিয়েছিলাম তখন একজন ফরাসী সাংবাদিক আমার আধঘন্টা'র এক সাক্ষাৎকার নিয়েছিল। সেইটুকু অভিজ্ঞতা নিয়েই তার সঙ্গে কিছু রং চড়িয়ে সে একটা বই লিখে ফেলল। বইটা এক গাদা ভুলে ভরা, আর আমার মাধ্যমে ইংরেজদের ছোট করে দেখানো হয়েছে। কাজেই আবার একটা অশান্তির কথা ভেবে আমি ভয় পেলাম। বইটা আবার এরই মধ্যে অনেকগুলো ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। বুঝতে পারলাম এইসব অশান্তির হাত থেকে বাঁচতে হলে আমার কথা আমাকেই লিখতে হবে আর তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। শেষকালে ঠিক হল যে ইউনাইটেড প্রেসের তরফ থেকে একজন ঔপন্যাসিক এবং পর্বতারোহণ বিষয়ক লেখক জেমস র‍্যামজে উলম্যান আমার কথা শুনে বইটা লিখবেন, তিনি হবেন অনুলেখক। সেইমত তিনি ১৯৫৪ সালের শরৎকালে দার্জিলিং এসে উপস্থিত হলেন। আমরা বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন আমাদের কাজ শুরু করলাম। ঐ দিন গৌতমবুদ্ধ জন্মেছেন, সিদ্ধি লাভ করেছেন এবং নির্বাণ লাভ করেছেন। আমি উলম্যানকে বললাম, আমাদের ভাগ্য ভাল, বুদ্ধ আমাদের আশীর্বাদ করেছেন।

বছরের গোড়ার দিকে অনেকগুলো অভিযানে অংশ নেবার জন্যে আমন্ত্রণ পেলাম। তিনবার পরপর এভারেস্ট অভিযানে যাবার পর বড় কোনও অভিযানে যাবার ইচ্ছে নেই। তবে ইংরেজ এবং ভারতীয়রা যৌথভাবে তুষার মানব বা ইয়েতির সন্ধানে একটা অভিযান করার কথা ভাবছিল, আমার ইচ্ছে ঐ অভিযানে আমিও অংশ নেব। কিন্তু সে অভিযানে যাওয়াও সম্ভব হল না কারণ ঐ বছর বসন্তকালে বোম্বাইয়ে 'দি কনকোয়েস্ট অফ এভারেস্ট' ফিল্মের প্রথম প্রদর্শন হবে। সেখানে উপস্থিত থাকার জন্যে আমাকে এমনভাবে অনুরোধ করা হয়েছে যে না গিয়ে উপায় নেই। এভারেস্ট অভিযানের ধকল, দেশ ভ্রমণ, হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে মেলামেশা এই সব মিলিয়ে আমার শরীর খুবই দুর্বল ছিল, আমি সেটা বুঝতে পারিনি। বোম্বাই পৌঁছে জনতার ভিড়ে আমি দিশেহারা, তারপর অসহ্য গরম। ফলে একদিন দুপুরবেলা আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। গরমি লেগে জ্বর এসে গেল। সেখান থেকে কোনও মতে বাড়ি ফিরলাম। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আমাকে পরীক্ষা করে কয়েক সপ্তাহ বিশ্রাম নেবার কড়া নির্দেশ দিলেন। গৃহবন্দি হয়ে সুবিধেই হল। আমি বই লেখার কাজে মন দিলাম।

১৯৫৪ সালের ২৯শে মে দার্জিলিং এ 'দি কনকোয়েস্ট অফ এভারেস্ট' দেখানো হবে— ঠিক করা হল ঐ দিনটা বিরাট উৎসব হবে। এমন সময় খবর পেলাম নিউজিল্যান্ডের মাকালু-২ অভিযানে নেতৃত্ব করতে গিয়ে হিলারী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তার অবস্থা খুবই খারাপ। একথা শুনে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। এই অবস্থায় আমি উৎসব বাতিল করার

জন্যে অনুরোধ করলাম, কিন্তু সেটা সম্ভব হল না। ফিল্ম শুরুর আগে আমাকে যখন কিছু বলার জন্য অনুরোধ করল, তখন আমি নেপালী ভাষায় বললাম, "আমার কাছে খবর এসেছে অভিযানে গিয়ে হিলারী খুবই অসুস্থ। এভারেস্ট আরোহণ সম্ভব হয়েছে দলগত সংহতির ফলে। একজন সহ অভিযাত্রীর গুরুতর অসুস্থতায় আমি বিচলিত।" হিলারী অবশ্য দ্রুত আরোগ্য লাভ করেছিলেন।

১৯৫৪-র শরৎকালে হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের উদ্বোধন হবে। তার আগে ঠিক হল আমাকে এবং মেজর জয়ালকে সুজারল্যাণ্ডের ফাউণ্ডেশন ফর এলপাইন রিসার্চের অতিথি হয়ে পর্বতারোহণের কিছু আধুনিক কলাকৌশল শিখে আসতে হবে। জুন মাসে আমরা সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। চাম্পেস গ্রামের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আমাদের প্রশিক্ষণ নেবার কথা। সুইজারল্যাণ্ডে একেবারে নতুন গাইডদের সঙ্গে শিক্ষা নিতে প্রথমে একটু অস্বস্তি ছিল পরে অবশ্য সেটা ঠিক হয়ে গেল। এখানে শিক্ষা নিতে গিয়ে বারে বারেই আমার শোলো খুম্বুর কথা মনে পড়ছিল। তবে পাহাড়ের মধ্যে রেল লাইন, সেতু আর বিদ্যুৎ তৈরির কেন্দ্র আমার ভাল লাগেনি।

গ্রীষ্মকালে দেশ থেকে আরও ছজন শেরপা এল শিক্ষা নিতে। এরা হল আং থার্কে, গিয়ালসেন, দা নামগিয়াল এবং আং তেম্বা। আর ছিল আমার দুই ভাগ্নে ভাইপো গম্বু এবং তোপগে। সেখান থেকে আমরা আর্নল্ড গ্লাথার্ডের রোসেনলুই-এর স্কুলে এলাম এবং অনেক নতুন কলাকৌশল শিখলাম। অবশেষে গ্রীষ্ম কালে দেশে ফিরলাম। ১৯৫৪ সালের ৪ঠা নভেম্বর পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু আমাদের নিজেদের স্কুলের দ্বারোদঘাটন করলেন।

স্কুল চালু হল। প্রথম দিকে তেমন কোনও শিক্ষাক্রম চালু করা গেল না। এর মধ্যে শীত এল, স্কুলের ছুটি। খ্রীস্টমাসের ছুটিতে মেয়েদের নিয়ে রওনা হলাম আমার জন্মভূমি শোলো খুম্বুর উদ্দেশে। মেয়েরা তাদের জন্মের পর এই প্রথম চলেছে তাদের পিতৃভূমি দর্শনে। ওদের পিঠে বোঝা, হাঁটছে আমার সঙ্গে, তাদের জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা। মেয়েরা চুরাশি বছরের ঠাকুমাকে প্রথম দেখতে যাচ্ছে, মনে তাদের চাপা উত্তেজনা। পথে নানা মজার ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমার শেরপাদের দেশে এসে পৌঁছলাম। আমাদের দেখে সেখানে খুশির হাওয়া বয়ে গেল। নামচেবাজার আর থামেতে কদিন কাটিয়ে মেয়েদের নিয়ে গেলাম থায়াংবোচের মঠ দেখাতে। সেখান থেকে তারা নিজের চোখে ১৯৫৩ সালের মূল শিবিরের জায়গা দেখে এল। মেয়েরা এই জায়গাকে তাদের তীর্থ মনে করল। এই সেই স্থান যেখান থেকে শেরপা জাতি পৃথিবী বিখ্যাত হয়েছে, আর তার কোলে আশ্রয় পেয়ে আমি অসহ দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেয়েছি।

শোলো খুম্বুতে থাকাকালীন আমরা দু'বার ইয়েতির দেহাবশেষ দেখতে পেলাম। একবার খুমজুঙের মঠে আর একবার প্যাংবোচের মঠে। দু'জায়গাতেই দুটো করোটি রয়েছে, মাথায় কিছু চুলও লেগে আছে। খুম্বজুঙেরটায় চুলগুলো একটু বেশি কালো, প্যাংবোচেরটা মনে হয় কোনও অল্প বয়েসী ইয়েতির। দীর্ঘদিন ধরে লামারা তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করছে—কোথা থেকে এল কে জানে! তবে জীবন্ত ইয়েতির রহস্য, রহস্যই থেকে গেল।

এবারে দেশে আসার পিছনে আমার একটা অভিসন্ধি ছিল। বহু দিন ধরে মনে সাধ মাকে দার্জিলিং নিয়ে আসব। এবার মতলব করেছি জোর করে নিয়ে যাব। আমার মতলবের কথা বলাতে মা আনন্দের সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। শেরপারা পাহাড়ে চড়ার সময় কারও সাহায্য নেয় না। আমার বৃদ্ধা মা নিজের পায়ে হেঁটেই রওনা দিলেন। সবচেয়ে মজা হল জয়নগরে এসে ট্রেনে চাপার সময়। ট্রেনটা ছাড়ার কিছুক্ষণ পরে মা বললেন, তেনজিং, গাছগুলো কেমন করে পিছনে দৌড়চ্ছে বল তো? তাঁর কথা শুনে মেয়েরা হেসে বাঁচে না। এটাও কিছু নয়, তাকে সবচেয়ে অবাক করেছে ঐ রেল গাড়িটা। তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না একটা গোটা গাড়ি কি করে দৌড়ে চলেছে!

এই প্রথমবার আমাদের বাড়ির সবাই এক জায়গায় মিলিত হলাম। সকলের সঙ্গে পরম আনন্দে দিন কাটে আমাদেব। আমার জীবন কাহিনীর এখানেই শেষ। এরপর যা ঘটবে সেটা হবে আমাদের জীবনে আর এক নতুন অধ্যায়। এরপর শুরু হচ্ছে আমার কর্মজীবন, নতুন দায়িত্ব। পর্বতারোহণ স্কুলে ভারতের তরুণদের পাহাড়ে চড়ার কৌশল শেখানো—তাদের হিমালয়কে ভালবাসতে শেখানো, এই হবে আমার জীবনের ব্রত। এ ছাড়া আমি শেরপা এ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট, সেখানেও আমার বড় দায়িত্ব আছে। বিভিন্ন অভিযানে উপযুক্ত শেরপাদের পাঠানো, তাদের উপযুক্ত মজুরী ঠিক করে দেওয়া এবং তাদের একটু স্বচ্ছল ভাবে বেঁচে থাকার জন্যে সাহায্য করা, এসবই আমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। আমি নিজে দারিদ্র অবস্থা থেকে, বহু পরিশ্রম আর কষ্টের মধ্যে দিয়ে একটু স্বচ্ছলতার মুখ দেখেছি। দারিদ্র্যের যে কি জ্বালা, লেখাপড়া না জানার যে কি কষ্ট, তা আমার চেয়ে ভাল করে খুব কম লোকেই জানে। আমার নিজের জাতের এই অশিক্ষা আর দারিদ্র্য আমাকে কষ্ট দেয়, এখন থেকে আমার চেষ্টা হবে কেমন করে তাদের উন্নতি করা যায়।

পাহাড়ে চড়া শেখানোর বই পড়া বিদ্যেতে আমার আগ্রহ নেই। আমি আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তাদের শিক্ষা দেব। বহু মানুষের সঙ্গে মিশে, অভিযানে অংশ নিয়ে এবং সবার ওপরে হিমালয়ের কাছ থেকে আমি যা শিখেছি আমি তাই শেখাবার চেষ্টা করব তরুণদের। সত্যিকারের একজন পর্বতারোহীকে সবসময় উৎফুল্ল থাকতে হবে আর কমরেডশিপের মধ্যে যে শক্তি আছে তা বুঝতে হবে। সবার উপরে বন্ধুত্ব। নিস্বার্থ আর বন্ধুবৎসল হলে শুধু একজন ভাল পর্বতারোহীই নয় তার হৃদয় হবে প্রসারিত। তুমি হৃদয় দিয়ে যতটুকু দেবে ঠিক ততটুকুই ফেরত পাবে, নিজের ভেতর যে সুন্দর জিনিস আছে তা সবার মধে বিলিয়ে দাও এবং অন্যকেও তা করতে সাহায্য কর। এই হবে আমাব শিক্ষার আসল বিষয় আর আমি নিজে এসব শিখেছি দেবী চোমোলোংমার কাছ থেকে।

উৎসুক লোকেরা আমাকে প্রায়ই একটা প্রশ্ন করে যে দ্বিতীয়বার এভারেস্ট আরোহণ সম্ভব হবে কিনা? এর একটাই উত্তর—হাঁ। এবং শুধু নেপালের দিক থেকে নয় তিব্বতের মধ্যে দিয়েও তা সম্ভব হবে। এবং খুব সম্ভব পর্বতারোহীরা কোনও একদিন একপ্রান্ত থেকে শুরু করে অন্যপ্রান্ত দিয়ে এভারেস্ট আরোহণ করবে। আর একটা দুঃসাহসী প্রশ্ন প্রায়ই শুনতে হয় সেটা হল অক্সিজেন ছাড়া এভারেস্ট আরোহণ সম্ভব হবে কিনা? আমার উত্তর

হল যে সেটাও সম্ভব হবে। ১৯৫৩ সালে যেখানে নম্বর শিবির ছিল সেখান থেকে আরও উঁচুতে একটা শিবির স্থাপন করতে হবে। তবে অক্সিজেন ছাড়া আরোহণ করতে হলে পরপর পাঁচদিন আবহাওয়া ভাল হতে হবে। অক্সিজেন ছাড়া উঠতে গেলে খুব ভাল পর্বতারোহী হলেই চলবে না, তার সঙ্গে নিখুঁত পরিকল্পনা এবং লেগে থাকবার ক্ষমতা থাকা চাই আর এ সমস্তর সঙ্গে চাই প্রকৃতির একান্ত সাহায্য।

লোকে যখন জিজ্ঞেস করে যে আর কোনও অভিযানে অংশ নেবার ইচ্ছে আমার আছে কিনা, আমি বলি যে সে ইচ্ছে আমার আছে—তবে বড় কোনও অভিযানে নয়। এবং এভারেস্টে তো নয়ই। কারণ এভারেস্ট অভিযানে আমি ছিলাম শেরপা সর্দার এবং সদস্য। একই সঙ্গে দুটো দায়িত্ব নেওয়া যে কী কঠিন কাজ তা আমি বলে বোঝাতে পারব না। এ ছাড়া যে ভাগ্যের সাহায্যে আমি এমন কঠিন কর্মটি করতে পেরেছি সেই ভাগ্য আমাকে তখন সাহায্য নাও করতে পারে। এ ছাড়া ১৯৫৩ সালে ব্যাপারটা ছিল অন্যরকম। সেদিন আমার প্রতিজ্ঞা ছিল হয় আরোহণ করব না হয় মরব। একবার আরোহণ করার পর দ্বিতীয়বার এই ধরনের মনের জোর পাওয়া যায় না। তাছাড়া আমার বয়স চল্লিশ পার হতে চলেছে এখন আর কোনও বড়মাপের অভিযানে অংশ নেবার শক্তি নেই। তাই যদি কোনও ভাল আর ছোট মাপের অভিযানে ডাক পাই তবে নিশ্চয়ই যাব, পর্বত অভিযান আমার শুধু পেশা নয় এটা আমার জীবনের অঙ্গ। তবে আমি সবচেয়ে খুশি হব যদি আবার ল্যাম্বার্টের সঙ্গে কোনও অভিযানে যাবার সুযোগ পাই।

আমার আরও একটা শখ আছে আর তা হল দেশভ্রমণ। বেড়াতে আমার খুব ভাল লাগে। বিভিন্ন দেশের মানুষের সঙ্গে মিশলে কত কিছু শেখা যায়। একটা কথা প্রায়ই শুনি যে পাশ্চাত্যের লোকেদের বিষয়বুদ্ধি বেশি আর প্রাচ্যের লোকেরা অতিথি বৎসল। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা অন্য রকম। পাশ্চাত্যে আমাকে যেভাবে খাতির করা হয়েছে, তার সঙ্গে আমি যখন আমার দেশে এভারেস্ট বিজয়ী বৃটিশ অভিযাত্রীদের সঙ্গে ব্যবহারের তুলনা করি তখন খুবই লজ্জা পাই। বৃথা জাত্যাভিমান এভারেস্টের মর্যাদা যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ করেছে আর তার জন্যে আমার দেশের লোক যথেষ্ট দায়ী। পৃথিবীর সমস্ত কিছুর চেয়ে এভারেস্ট অনেক বড়। অন্যের মতকে গুরুত্ব দেওয়া আর মানুষের অনুভূতিকে মর্যাদা দেওয়া—বহু দিন ধরে অজস্র পর্বত অভিযানে গিয়ে আমি এটাই শিক্ষা পেয়েছি। পূর্ব এবং পশ্চিমের যতই প্রভেদ থাক মনুষ্যত্বের চেয়ে বড় আর কিছুই নেই।

এভারেস্ট আরোহণ করে আমি আমার দেশের মানুষের কাছ থেকে অনেক সম্মান পেয়েছি। তবে মাঝে মাঝে এত মানুষের ভিড় হয় আর এমন সমস্ত বিরক্তিকর প্রশ্ন করা হয় যে মনে হয় এই লোকালয়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, নির্জনে কোথাও পালাতে হবে। কিন্তু সে তো এক ধরনের পরাজয়। কাজেই পালিয়ে যাওয়াও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার শুধু একটাই প্রার্থনা যে আমার বাকি জীবনটা আমাকে সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে দেওয়া হোক, আর আমার প্রিয় এভারেস্ট নিয়ে এই সব ভাজে বাজে কথা বন্ধ হোক। ভবিষ্যতের মানুষ যখন

প্রশ্ন করবে যে কেমন ছিল সেই সব লোকেরা যারা প্রথম এভারেস্ট আরোহণ করেছিল? তখন উত্তরটা যেন এমন হয় যাতে আমাদের লজ্জা পেতে না হয়। আমরা যেন মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারি।

এভারেস্টের আসল মহত্ব কোথায়? এভারেস্ট শুধু মাত্র পৃথিবীর একটি বা দুটি দেশে অবস্থিত পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ নয়। পৃথিবীর পূর্ব আর পশ্চিমের মানুষ একসাথে এর শীর্ষে আরোহণ করেছে। পৃথিবীর সব দেশের সব মানুষ এই সম্মানের অধিকারী। এভারেস্ট পৃথিবীর সব মানুষের প্রিয়। আমারও একটাই বাসনা, একটাই ইচ্ছে আমিও যেন পৃথিবীর সব মানুষের আপনার জন হয়ে বাঁচতে পারি। গৌতমবুদ্ধের কাছে আমার একটা প্রার্থনা আমাকে যে পুরস্কার তিনি দিয়েছেন, আমি যেন তার যোগ্য হতে পারি।

এই বইয়ের মাধ্যমে আমি আমার অতীতকে তুলে ধরলাম। তবু আজও আমার জীবনচক্র বয়ে চলেছে। মানুষ তো শুধু তার অতীত নিয়ে বাঁচতে পারেনা, তাকে সামনে তাকাতে হয় ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। আমি আমার নতুন জীবন শুরু করলাম, ভবিষ্যতের দিকে হাত বাড়ালাম।

আমার নতুন জীবনে আর একটিবার আমি টাইগার হিলে উঠলাম। এখন আর আমার সঙ্গে কোনও টুরিস্ট নেই, আছে শুধু একমাত্র কাঞ্চন বন্ধু। ভোরের সূর্যের আলোয় দূরের শৃঙ্গগুলো দেখা যায়। আমি তাকিয়ে আছি। সঙ্গে নেই সেই ওটি কম আমেরিকান মহিলা যাদের গাইড তেনজিং বলছে, না ম্যাডাম আপনি ঠিক বলছেন না। ঐ যে বড়টা দেখছেন সেটা লোৎসে, তারপরে যেটা দেখছেন সেটা মাকালু আর ঐ ছোট্টটা ওটাই এভারেস্ট। ঐ ছোট্টটা। পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ. ।

আমার এক বন্ধু আমাকে জিজ্ঞেস করে এখন এভারেস্ট কেমন দেখলে? কি অনুভব করলে? উত্তর দিতে পারিনি। উত্তর দিতে পারি শুধু নিজের কাছে আর এভারেস্টের কাছে। সেই একই উত্তর যা আমি সেদিন দিয়েছিলাম তার মাথায় একটা লাল নীল পেন্সিল রাখার সময়।

থুজি চে চোমোলোংমা। তুমি বল ॥